যাদুঘর

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(১৪)

কেশবের আড্ডায় এ রবিবার বেশ একটু উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে দেখা গেল। সবাই মিলে ক্ষিতীশ ও অক্ষয়কে প্রচণ্ড ভৎর্সনা করছিল। যে কারণে এই উত্তেজনার উদ্ভব হয়েছিল সেটা যদিও এ-দেশে অন্তত কিছুকাল পূর্ব্বেও মোটেই একটা অপরাধ বলে গণ্য হত না, কিন্তু এখনকার লোকেরা তাকে একটা গর্হিত কাজ বলেই গণ্য করতে শিখেছে।

ব্যাপারটা হয়েছিল এই যে,—প্রিয়নাথ বলে যে ছেলেটিকে বন্ধুরা সব আদর করে 'প্রিয়ধন' বলে ডাকতো, সে একটি মেয়েকে ইংরিজি পড়াতো। মেয়েটির বাপ নেই, শুধু বিধবা মা আর একটি মাত্র বড় ভাই আছেন। ভাইটি আবার একটু ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের পক্ষপাতি। স্বর্গগত পিতার বেশ দু'পয়সার সংস্থান ছিল, তার উপর নিজেও যথেষ্ট উপার্জ্জন করেন। বাল্য-বিবাহের তিনি অত্যন্ত বিরোধী, তাই ভগ্নীটির বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও তিনি তার বিবাহ দেন নি। সযত্নে তাকে উচ্চ-শিক্ষিতা করে তুলছিলেন। মেয়েটি মিশনারী ইস্কুলে পড়তো। বাড়ীতেও তার পড়াশুনা দেখবার জন্য একজন মাষ্টারের প্রয়োজন হওয়ায় বন্ধুবর প্রিয়নাথের উপর মেয়েটিকে পড়াবার ভার পড়ে। শিক্ষকের নয়নে তখন যৌবনের মোহাঞ্জন মাখান, ছাত্রীও সে-দিন এক স্বপ্ন-রাজ্যের ললিতা তরুণী। সুতরাং এস্থলে সর্ব্বত্র যা হ'য়ে থাকে এখানেও তার ব্যত্যয় ঘটে নি। গুরু-শিষ্যার মধ্যে পঠন-পাঠনের ব্যপদেশে প্রেমের দেবতার পুষ্প-আসনখানিও ধীরে ধীরে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছল।

প্রিয়নাথ পত্নীবন্ত জেনেই মেয়েটির দাদা নিশ্চিন্ত মনে তার উপর ভগ্নীর শিক্ষার ভার দিয়েছিল, কিন্তু রূপে গুণে সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠা হয়েও প্রিয়নাথের পত্নী স্বামীকে তাঁর ছাত্রীর আকর্ষণ থেকে রক্ষা করতে পারে নি। শেষে অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়ালো যে, প্রিয়নাথের স্ত্রী বর্ত্তমান থাকা সত্বেও তার সঙ্গেই ভগ্নীর বিবাহ দিতে অগ্রজকে বাধ্য হতে হ'ল।

সম্প্রতি অক্ষয়ের বাড়ী থেকেই এই শুভকার্য্য সুসম্পন্ন হয়েছে। অক্ষয় নাকি হয়েছিল বর-কর্ত্তা এবং ক্ষিতীশ গেছল 'নিত-বর' হয়ে! শুধু দ্বিজেন ছাড়া দলের আর কেউ এ খবর জানতো না। তাই কেশব যখন তর্জ্জন গর্জ্জন করে বলছিল—ক্ষিতীশের কথা ছেড়ে দাও, ওটা একেবারে নেহাৎ রেওভাট! ওর কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই, তাই এই বিয়েতে ও বরযাত্রী হয়ে যেতে পেরেছিল কিন্তু তুমি কি বলে, বিয়েটা সমর্থন করলে অক্ষয়-দা? তোমার মাথার চুল পেকে গেছে। তোমাকে আমরা দলের মধ্যে প্রবীন বলে জানি, আর তুমিই হলে কিনা এই অন্যায় কাজটার কর্ম্মকর্ত্তা!

অক্ষয় এ কথার উত্তরে কিছু বলবার পূর্ব্বেই ক্ষিতীশ নিজের দোষ স্খালনের জন্যে তাড়াতাড়ি বললে,—আমার অপরাধ নেই ভাই, আমি এ ব্যাপার কিছুই জানতুম না। অক্ষয়-দা আমাকে বিশেষ করে অনুরোধ করেছিল যে,

সেদিন সন্ধ্যের পর যেন অতি অবশ্য-অবশ্য আমি তার বাড়ীতে যাই। কেন কি বৃত্তান্ত আমাকে কিছুই বলে নি। গিয়ে দেখি এই কাণ্ড!

কেশব বললে,—দ্বিজেনকেও তো যেতে বলেছিল, কিন্তু ও তো যায় নি।

দ্বিজেন বললে,—ওর যাওয়ায় এবং আমার না-যাওয়ায় একটু প্রভেদ আছে কেশব। আমি অক্ষয়দাকে জেরা করে ব্যাপারটা কি, পূর্ব্বাহ্নে জানতে পেরেছিলুম, তাই আর যেতে মন সরে নি। ক্ষিতীশ বেচারা না জেনে গেছল।

কেশব বল্লে,—বেশ, গেছল্ না হয় না জেনেই, কিন্তু জেনে—চলে এলো না কেন? সে বিবাহে যোগ দিলে ও কি বলে?

ক্ষিতীশ অপরাধীর মতো বললে,—সেটা আমার অন্যায় হয়েছে, আমি স্বীকার করছি, কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস করো। আমি সে বিবাহে যোগ দিয়েছিলুম under protest!

ঘরের মধ্যে একটা হাসির রোল উঠিল। যে ব্যাপারটা ক্রমশ খুব গুরুতর হয়ে উঠছিল, এই ফাঁকে সেটা একটু হালকা হয়ে গেল। অক্ষয় এই সুযোগে প্রশ্ন করলে—আচ্ছা, তোমরা যে এত ক্ষেপে উঠেছো তার কারণটা কি? আমার তো মনে হয় এই বিবাহে সহায়তা করে আমি জীবনে একটা খুব বড় সৎকাজ করিছি!

দলের মধ্যে একজন বলে উঠলো—হ্যাঁ, খুবই সৎকাজ করেছো! একজন নিরীহ নির্দ্দোষ স্ত্রীলোকের মর্ম্মে শেল-বিদ্ধ করার চেয়ে পুণ্যকাজ কি কিছু আছে?

অক্ষয় বললে—অবশ্য প্রিয়ধনের স্ত্রী এতে একটু দুঃখিতা হতে পারেন সে কথা মানি, কিন্তু তোমরা কেবল সেই দিকটাই দেখছো, এর যে আর একটা দিক আছে সে কথাটা একবার কেউ ভেবে দেখছ না। এ মেয়েটিকে প্রিয়ধন যে প্রাণের অধিক ভালবেসেছে। আর মেয়েটিও প্রিয়ধনকে তার প্রিয়তমের পদে অভিষিক্ত করে নিয়েছে, পরস্পরকে ভালবেসে বিবাহ করার সুযোগ কি এ হতভাগ্য দেশে সহজে ঘটে? বিশেষ আমাদের এই হিন্দু-সমাজে? দুটি মনের মানুষের এই যে মিলন এই তো সার্থক পরিণয়! প্রিয়ধন পূর্ব্বে যে বিবাহ করেছিল সে তো প্রকাণ্ড একটা ফাঁকি। অল্পবয়সে অভিভাবকের অনুরোধে সে একটা বিবাহ করতে বাধ্য হয়েছিল বটে, কিন্তু একদিনের জন্যও সে পত্নীকে তো প্রিয়ধন ভালবাসতে পারে নি। সুতরাং সে স্ত্রী বর্ত্তমানে প্রিয়ধন যদি অন্য একটি মনোমত পত্নী গ্রহণ ক'রে থাকে তাতে অন্যায়টা কি?

দ্বিজেন বললে,—সেটা তোমার এই প্রেমের উত্তাপে টাকগ্রস্ত মাথায় হয় ত প্রবেশ করতে পারে যদি কোনওদিন দেখো যে, তোমার স্ত্রী তোমাকে ভালবাসতে না পেরে অন্য একজনকে তাঁর মনোমত পতি ব'লে গ্রহণ করছেন!

অক্ষয় ধীর প্রশান্ত হাস্যের সঙ্গে বললে,—সে স্বাধীনতা তোমাদের বৌদিকে আমি অনেকদিন থেকেই দিয়ে রেখেছি। আমাকে তোমরা অতটা সঙ্কীর্ণ মনে কোর না দ্বিজ!

ক্ষিতীশ বললে,—তা তুমি দেবে না কেন বলো, তুমি নিজে এখনও মনের মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছ যে! এই বুড়ো বয়সেও কত যে মেয়ের প্রেমে পড়লে তার সংখ্যা হয় না।—

আর কত যে প্রেমের কবিতা লিখলে তারও সংখ্যা হয় না। সেদিন দেখি আমার স্ত্রীর নামেও একটা প্রেমের কবিতা লিখে মাসিকপত্রে ছাপিয়েছে! বলেই বিজয় কেশবকে ডেকে বললে—নাঃ! সত্যি বলছি ভাই, এ বুড়োর পাগলামী যেন দিন দিন বেড়েই চলেছে। আর একে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়।

মহা উৎসাহিত হয়ে উঠে ক্ষিতীশ বললে—কথাটা যদি পাড়লে দাদা, তাহলে বলি শোনো—সেদিন ওঁর বাড়ীতে গিয়ে তো দেখলুম উনি প্রিয়ধনের পুনর্বিবাহের বরকর্ত্তা হয়েছেন কিন্তু বৌদির মুখখানি সায়াহ্নের কমলিনীর মতো ম্লান!

জিজ্ঞাসা করলুম তিনি এত বিষণ্ণ কেন? বউদির দুইচোখ জলে ভরে উঠল। তিনি বল্লেন,—ঠাকুরপো, প্রিয় বাবুর পরিত্যক্তা স্ত্রী সুষমাকে তোমরা দেখো নি কিন্তু আমি দেখেছি। সে পাড়াগেঁয়ে মেয়ে বটে, আমাদের মতো হাল-

ফ্যাশানের নয়, কিন্তু সে নারীরত্ন, এই বাঁদর তার কদর বুঝলে না, বাইরের চাকচিক্য দেখে মুগ্ধ হয়ে আবার একটা বিয়ে করতে যাচ্ছে। কিন্তু সেই পোড়াকপালীর জন্যে আজ আমার সমস্ত মনটা যে কাতর হ'য়ে রয়েছে। তার কথা ভেবে আজ আর আমি চোখের জল কিছুতেই চেপে রাখতে পারছিনি!—আমি বললুম,—তবে কেন আপনার বাড়ী থেকে এ বিয়ে হ'তে দিচ্ছেন বৌদি? অক্ষয়দাকে বলে-কয়ে এটা বন্ধ করে দিলেন না কেন?—এ কথার উত্তরে বৌদি কি বললেন জানো? ছলছল চোখদুটি আমার দিকে তুলে ধরে বললেন,—হায় রে অদৃষ্ট! কাকে বলে কয়ে নিষেধ করবো ভাই! শীগ্‌গিরই যে তোমাদের আবার একবার বরযাত্রী হবার জন্য এ বাড়ীতে আসতে হবে!—আমি বললুম আপনার হেঁয়ালী বুঝতে পারলুম না বৌদি! একটু স্পষ্ট করে খুলে বলুন!—বৌদি বললেন,—কেন, তোমরা কি কিছু শোনো নি? আমারও যে কপাল পুড়েছে সে খবরটা বুঝি এখনও পাও নি। উনিও যে এই আসছে বোশেখ মাসে আর একটা বিয়ে করবেন স্থির করেছেন! আমি তো শুনে অবাক! বললুম—সে কি বৌদি? আপনি যা বলছেন তা কি সত্যি? অক্ষয়দার মতো প্রৌঢ় পাত্রের গলায় মালা দিতে প্রস্তুত হয়েছে সে কোন্ অভাগিনী?—বৌদি গম্ভীর ভাবে বললেন—আমাদের নীচেকার ভাড়াটেদের মেয়ে অমিয়া! তোমাদের বন্ধু তাকে রবিবাবুর কাব্য পড়ান। তার নামে প্রেমের কবিতা লেখেন! আমি আরও আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—বলেন কি বউদি? সে যে আমাদের অক্ষয়দার মেয়ের বয়সী—আর দেখতে তো একেবারে রক্ষেকালীর বাচ্চা! বউদি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—তাহলে কি হবে?—আমার কপালের দোষে কম বয়সের কালো মেয়েদেরই যে উনি বেশী পছন্দ করেন!

বউদি'র দুর্ভাগ্যের প্রতি যে সহানুভূতিটুকু ধীরে ধীরে জমে উঠছিল সকলের মনের কোণটির কাছে, এ কথায় তা যেন হঠাৎ কর্পূরের মতো উপে গিয়ে, ঘরের মধ্যে আবার একটা হাসির সাড়া পড়ে গেল। বিজয় বল্লে—যাক্—বাঁচা গেল; তাহলে বেশী পছন্দ হয় নি! মণিকার বয়সটা নেহাৎ কম নয়, এবং রংটাও কালো বলা চলে না! কথাটা শুনে অনেকটা ভরসা হ'লো! একটা স্ত্রী নিয়ে ঘর করি ভাই, তারও উপর এসে পড়েছিল এই প্রেম-অবতার কূর্ম্মকবির নজর! কাব্য-স্রোতের টানে তাকে এ কেরাণীঘাট থেকে প্রায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছ্‌ল আর কি! মণিকা ইদানিং কথায় কথায় বলতে আরম্ভ করেছিল যে,—তোমরা যাই বলো কিন্তু আমার অক্ষয় কবি আমাকে সত্যিই ভালবাসে।

অক্ষয় গম্ভীর ভাবে বললে,—শ্রীমতী মণিকা সত্য কথাই বলেছে। প্রেম যে অন্তর্যামী। তাই সে জেনেছে আর জগদীশ্বর জানেন, আমি নিজে কিছু ব'লতে চাই নি!

কেশব রেগে উঠে বললে,—তুমি থামো; প্রেমের এমন ক'রে আর অমর্য্যাদা কোরো না। যে লোক আজ একজনকে কাল আর একজনকে ভালবেসে বেড়াচ্ছে তার মুখে আর 'প্রেম' কথাটা মানায় না!

অক্ষয় এবার একটু উত্তেজিত কণ্ঠে বললে,—তুমি পাউণ্ড-শিলিং-পেন্সের কারবারী—প্রেম তত্ত্বের তুমি কি জানো?—ওরে মূর্খ, কবি বলেছেন "আর বসন্তে সেটাই সত্য!" যাকে যাকে যখনই ভাল বেসেছি, তখন সত্যই ভাল বেসেছি—তার মধ্যে ফাঁকি ছিল না।

দ্বিজেন এবার ধমক্ দিয়ে ব'ললে,—তুই চুপ্ কর ব'লছি—আর হাড় জ্বালাস্‌নি; ভালবাসাটা অত সস্তার খেলো জিনিষ নয় যে যখন তখন যাকে তাকে বিলোনো চলে। সত্যিকারের ভালবাসা মানুষ জীবনে একবারই বাসতে পারে আর সে একজনকেই, তোর মতন অমন পাঁচজনকে নয়।

—ভুল, ভুল! দ্বিজ, তোমার ও ধারণাটা মস্ত ভুল! মানুষ তার নব নব পরিচিতদের—বার বার ভালবাসতে পারে, কিন্তু তা সার্থক হয় জীবনে হয় ত' একবার!

—তার মানে?

—মানে, সে যখন তার ভালবাসার প্রতিদান পায় তখনই তা সার্থক হ'য়ে ওঠে।

—সে সম্ভাবনাও তো তার বার বারই ঘটতে পারে! যতবার যতজনকে সে ভালবাসবে ততবার তাদের প্রত্যেকের

কাছেই তো সে প্রতিদান পেতে পারে!

—এইখানে তুমি আবার ভুল ক'রলে দ্বিজ! ভালবাসার প্রতিদান যে মুহূর্ত্তে পাওয়া যায় সেই মুহূর্ত্তেই আর একজনকে ভালবাসবার প্রয়োজন নিঃশেষ হ'য়ে যায়। তাই ব'লছিলুম যতদিন না সে সৌভাগ্য কারুর ঘটে ততদিন সে ক্রমাগত একজনের-পর-আর-একজনকে ভালবেসে তার প্রেমের প্রতিদান খুঁজে বেড়ায়!

—তোমার মুণ্ডু খুঁজে বেড়ায়! যে যথার্থ ভালবাসে সে প্রতিদান যদি পায় ভালই, না পায়—তাতে কিছু এসে যায় না, সে শুধু নিজে ভালবেসেই আনন্দ পায়।

অক্ষয় এবার হেসে উঠে বললে,—ওটা তোমার মুখে মানায় না দ্বিজ, ও-কথাটা বরং আমি ব'ললে শোভা পেতো, কেন না ওটা নিছক্ কাব্যের কথা! বাস্তব জগতে ওটার অস্তিত্ব বিরল! যে ভালবাসে সে প্রতিদান চায় না এতবড় মিছে কথা আর নেই। আর ওই যে বললে,—সে কেবল নিজে ভালবেসেই আনন্দ পায়!—ওটাও একেবারে নেহাৎ গাঁজাখুরি গল্প! যদি ব'লতে যে—সে শুধু নিজে ভালবেসেই দুঃখ পায়;—তাহ'লে বরং তোমার কথা মেনে নিতে পারতুম! ভালবেসে তার প্রতিদান না পেয়ে সুখী হ'য়েছে এমন কোনও লোককে তো আমি আজ পর্য্যন্ত দেখি নি! বরং সে ক্ষেত্রে অধিকাংশ হতাশ প্রেমিক হয়,—পাগল হ'য়ে গেছে, নয় অধঃপাতে গেছে—কিম্বা আত্মহত্যা করেছে!—এমন বহু ঘটনা আমি জানি!

এই সময় নিঃশব্দে প্রিয়নাথ ঘরের মধ্যে এসে ঢুক্‌ল। তার মাথার চুলগুলো সব উস্কো-খুস্কো, মুখ চোখ একেবারে বসে গেছে, যেন তিনচারদিন সে অনাহারে অনিদ্রায় কাটিয়ে এসেছে! তার সেই বিবর্ণ বিধ্বস্ত বিশৃঙ্খল চেহারা দেখে সকলে শুধু বিস্মিত নয়, অত্যন্ত শঙ্কিত হ'য়ে উঠ্‌ল!

কেশব প্রথমে কথা কইলে, জিজ্ঞাসা করলে—কি হ'য়েছে প্রিয়ধন? তোমায় এ রকম দেখছি কেন? ব্যাপারটা কি? তোমাকে তো ঠিক নববিবাহিতের মতো দেখাচ্ছে না!

প্রিয়ধন তবু চুপ ক'রে আছে দেখে অক্ষয় জিজ্ঞাসা করলে—তোমার কি কোনও অসুখ করেছে প্রিয়ধন?

ধরা গলায় একটা অস্পষ্ট 'না' ব'লে প্রিয়ধন একপাশে ব'সে পড়ল।

সঙ্গীরা কিন্তু এত সহজে নিরস্ত হবার পাত্র নয়। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে প্রিয়ধনকে তারা যখন অতিষ্ঠ ক'রে তুললে—সে তখন একটু অস্বাভাবিক গম্ভীর কণ্ঠে বললে—সুষমা আত্মহত্যা করেছে!

কথাটা শুনে সকলে যেন একসঙ্গে শিউরে উঠল! প্রায় সমস্বরে সবাই বলে উঠলো—এ্যাঁ! বলো কি প্রিয়?

প্রিয়ধন এবার কম্পিত স্বরে বললে,—হ্যাঁ, আমি এইমাত্র দেশ থেকে ফিরে আস্‌ছি! আমার বিয়ের খবর পেয়ে কাপড়ে কেরোসিন তেল ঢেলে সুষমা পুড়ে মরেছে—আর—তাকে বাঁচাতে গিয়ে—আমার ছোট ভাইটাও বেঘোরে প্রাণ দিয়েছে!

আড্ডাঘরের সমস্ত হাসি ও ফর্ত্তির আলো যেন হঠাৎ একটা দমকা বাতাস লেগে একসঙ্গে নিভে গেল!

—ক্রমশ

প্রাচীন ভারতের নাট্যশিল্প

(ঋগ্বেদে নাটকীয় অংশ ও ভারতীয় নাট্যশিল্পে গ্রীক্ প্রভাব)

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

সংস্কৃত নাটকোৎপত্তির ইতিহাস ভরতের নাট্যশাস্ত্রে যে-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার কথা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি। কিন্তু কেবল পৌরাণিক বিবরণকে অবলম্বন করিয়াই মানুষের অনুসন্ধিৎসু মন কোনো কালেই তৃপ্ত নহে। তাই, এ পর্য্যন্ত দৃশ্যকাব্যোৎপত্তির কথা লইয়া বহু গবেষণা হইয়া গিয়াছে। বিশেষ করিয়া পাশ্চাত্য-পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে অগ্রণী।

বেদে নাটকীয় অংশ কতটুকু তাহা লইয়া পণ্ডিত Keith তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ, The Sanskrit Drama—in its Origin, development, theory and practice-এর প্রথম অধ্যায়েই বিচার আরম্ভ করিয়াছেন। যাঁহারা নাটকোৎপত্তির পৌরাণিক কাহিনীর সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহারা বেদের নাটকীয় অংশ সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ ছিলেন কি? পণ্ডিত Keith বলিতেছেন যে, নাটকোৎপত্তির পুরাতন কাহিনী নাট্যশাস্ত্র রচিত হইবার বহুপূর্ব্ব হইতে প্রচলিত ছিল না। নাট্যশাস্ত্র তৃতীয় শতাব্দীর রচিত গ্রন্থ। কাহিনী তাহার পূর্ব্বেই প্রচলিত ছিল। ভরত সেই কাহিনীকে তাঁহার প্রথম অধ্যায়েই স্থান দিয়াছেন। কিন্তু ইহা হইতে এমন কিছু বুঝায় না যে, ভরত বেদের নাটকীয় অংশ সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন। প্রচলিত কাহিনীকে নাটকোৎপত্তির ইতিবৃত্তহিসাবে গ্রন্থে স্থান দেওয়ার হয়ত তাঁহার অন্য উদ্দেশ্য ছিল। গবেষণা যতই হউক, বেদে যে নাটকের পূর্ণ অবয়ব ভালো করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই, তাহা অতিশয় সত্য কথা।

বেদের নাটকীয় অংশ বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা দেবতা-বিশেষের কতকগুলি কথোপকথন মাত্র। ঋগ্‌বেদে আমরা যম ও যমীর কথোপকথন-মূলক একটি সূক্ত দেখিতে পাই। ইহা ছাড়া পুরূরবা ও উর্ব্বশীর কথোপকথন-বিষয়ক আর একটি সূক্ত আমরা দেখিতে পাই। অগস্ত্য ও লোপামুদ্রার কথোপকথন আর একটি সূক্তে বর্ণিত হইয়াছে। অনেক স্থানে এই সব কথোপকথনের মূল উদ্দেশ্য কি বুঝিয়া উঠা বিশেষ দুরূহ। ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে পণ্ডিত Max Muller তাঁহার সম্পাদিত ঋগ্বেদের একস্থানে বলিয়াছেন যে, ভক্তবিশেষে এই কথোপকথন-মূলক সূক্তগুলি আবৃত্ত হইত। পবন-দেবতা মরুৎগণের সম্মানের জন্য এই যজ্ঞের অধিষ্ঠান হইত। কোথাও বা দুইটি দল গড়িয়া উঠিত। একটি হইত ইন্দ্রের দল, আর একটি হইত মরুৎ ও তাঁহাদের অনুচরদের দল। দুই দলে কথা-কাটাকাটি হইত, কতকটা বর্ত্তমান-প্রচলিত কবির পাঁচালি ও যাত্রাগানের মতো।

অধ্যাপক পণ্ডিত Levi (১৮৯০) পণ্ডিত Max-Muller-এর এই মতের সঙ্গে তাঁহার নিজস্ব কতকগুলি যুক্তি দেখাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, সামবেদ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, বৈদিক যুগে সংগীত প্রভৃতি ললিতকলার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। তাহা ছাড়া ঋগ্‌বেদ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সুসজ্জিতা সুন্দরী তরুণীরা নৃত্যগীত পরায়ণা ছিলেন। মনোহরণ-বিদ্যায় তাঁহারা সুনিপুণা ছিলেন। অথর্ব্ববেদেও নৃত্যগীত প্রসঙ্গ ছিল। কাজেই বৈদিকযুগে যে নাটকীয় বৃত্তির পরিস্ফুরণ হইত, ধর্ম্মকথাচ্ছলে যে নৃত্যগীতাদির সমাবেশ করা হইত—তাহা বেশ বুঝা যায়। সাধারণত পুরোহিতেরা দেবতা ও ঋষিদের সাজ-সজ্জা করিয়া স্বর্গের কোনো-না-কোনো ঘটনার পরিকল্পনা করিয়া যজ্ঞস্থলে অভিনয় করিতেন।

নাটকোৎপত্তি সম্বন্ধে অধ্যাপক পণ্ডিত Schroeder-

এর বিশদ মতবাদ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন যে, ঋগ্বেদের একস্থানে দেখা যায় যে, ইন্দ্র সোমরস পানে আনন্দচিত্তে নিজেরই স্তবগান করিতেছেন। বেদের সূক্তগুলির এইরূপ রহস্য-কথা আদিকালের ইন্দো-য়ুরোপীয়-গণের নিকট হইতে উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া। নট-রাজের নৃত্যের তালে তালে এই বিরাট বিচিত্র বিশ্বসৃষ্টি। পণ্ডিত Schroeder বলেন যে, এই বিচিত্র সৃষ্টি-নৃত্য যজ্ঞস্থলে পুরোহিতেরা বিশেষ বিশেষ অঙ্গ-ভঙ্গীসহকারে সম্পাদন করিতেন। ব্রাহ্মণযুগেও এই নৃত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রীস্ ও মেক্সিকোতে এক শ্রেণীর নৃত্যভঙ্গীর প্রচলন ছিল। সেই নৃত্যভঙ্গীর সঙ্গে সেই সেই স্থানের নাটকোৎপত্তির ইতিহাসের একটি যোগসূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কিন্তু শুধু ধর্ম্মের গূঢ় রহস্যের জন্য কোনো নাটক বিশেষ জনপ্রিয় হইতে পারে না। তাই বৈদিক যুগের সৃষ্টি-নৃত্যের গূঢ় রহস্যের সন্ধান আমরা বর্ত্তমান নাটকে আর খুঁজিয়া পাই না। কিন্তু নৃত্য চিরদিনই জনপ্রিয় রহিয়া গিয়াছে।

ডক্টর Hertel বলেন যে, নাটকোৎপত্তির প্রথম স্তরে গীতি-নাট্যেরই প্রধান স্থান। জয়দেবের গীত-গোবিন্দ যেমন, তেমনি ঋগ্‌বেদের স্তোত্র-শস্ত্রগুলি।

এইরূপ বিভিন্ন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের বিভিন্ন মত। সর্ব্বা-পেক্ষা অদ্ভুত মতবাদ তাঁহাদের, যাঁহারা বলেন পূর্ণাবয়ব ভারতীয় নাট্যশিল্প গ্রীক্ নাট্যশিল্পের নিকট বিশেষভাবে ঋণী।

ভারতীয় নাট্যশিল্পের সুন্দর ক্রমোন্নতির পথে ইহাই একটি চিরন্তনী কলঙ্ক-লেখা।

কিন্তু এই মতবাদের ভিত্তি কোথায়, তাহাই দেখিতে হইবে।

সভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন স্তর বাহিয়া যে নাট্যশিল্প ভারতের সুপ্রসিদ্ধ নাট্যগ্রন্থ ও অভিনয়ের মধ্যে আপনার পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি ফেলিয়াছে, তাহা যে অপরাপর দেশের সম-সাময়িক নাট্যশিল্প হইতে একেবারেই কিছু গ্রহণ না করিয়া আপনা-আপনি বিকশিত হইয়াছে, এবং আপনার স্বতন্ত্র স্থান গ্রহণ করিতে পারিয়াছে—এমন কথা আমরা বলিতে চাহি না। আবার ইহাও বলিতে চাহি না যে, ভারতীয় শিল্প-সাধনার কোনো বিশিষ্ট অবয়ব নাই—যাহা কিছু আছে সকলি ধার-করা এবং অন্য দেশের শিল্প-সাধনার রঙ্গে রঞ্জিত।

এ সম্বন্ধে পণ্ডিত Wilson তাঁহার 'The Theatre of the Hindus'—নামক গ্রন্থের ভূমিকার প্রথমাংশে কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা বলিয়াছেন—আমরা নীচে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

...It is impossible that they should have borrowed their dramatic compositions from the people either of ancient or modern times. The nations of Europe possessed no dramatic literature before the 14th or 15th century, at which period the Hindu drama had passed into its decline.

তাৎপর্য্য—ভারতীয়েরা পৃথিবীর প্রাচীন বা আধুনিক কোনো জাতির নিকট হইতে তাহাদের নাটকীয় রচনারীতি গ্রহণ করিয়াছে—এমন কথা সম্ভব হইতে পারে না। য়ুরোপীয় ভিন্ন ভিন্ন জাতিরা চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে নাট্যসাহিত্য বলিয়া কোনো সাহিত্যের পরিচয় পায় নাই। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে হিন্দুদিগের নাট্যসাহিত্য পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়া শেষ অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল।

ইজিপ্ট, পারস্য ও আরবের অধিবাসীদের মধ্যে সেই সেই দেশের নাট্যসাহিত্য বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল বলিয়া জানা যায় না। Wilson সাহেবের মতে গ্রীসীয় ও চৈনিক নাটকের প্রভাব প্রাচীন ভারতের নাট্যরচনারীতি ও অভিনয় রীতির মধ্যে থাকা সম্ভব কি না এমন প্রশ্ন করা যাইতে পারে। কিন্তু ভারতীয় নাটকগুলি যাঁহারা নিবিষ্ট-চিত্তে অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন যে, ভারতীয় সাধনার বিশিষ্টতা কত সুন্দর ও পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছে—এই নাটকগুলির মধ্যে! হয় ত কোথাও কোথাও গ্রীসীয় চৈনিক নাটকের সঙ্গে সামান্য সাদৃশ্য আছে, কিন্তু সে সাদৃশ্যগুলিকে অবলম্বন করিয়া প্রাচীন

ভারতের নাট্যশিল্পের বিশিষ্টতাকে অনুকরণ বা অনুসরণ-মসীলিপ্ত বলিয়া খর্ব্ব করা যাইতে পারে না।

Wilson-সাহেব বেশ স্পষ্ট করিয়াই বলিতেছেন যে, হিন্দু-নাটকগুলির-গঠন সৌকর্য্যে এমন অনুপম বিশিষ্টতা ও সৌন্দর্য্য আছে—যাহা লক্ষ্য করিয়া স্বতঃই বলিতে ইচ্ছা করে যে, ভারতীয় নাট্যসাহিত্য স্বাভাবিক এবং মৌলিক ভিত্তিভূমির উপর নির্ভর করিয়া আছে।

"... They present characteristic varieties of conduct and construction, which strongly evidence both original design and national development."

কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর Weber বলেন যে, প্রাচীন ভারতে পূর্ণাবয়ব নাট্যসাহিত্য গড়িয়া তুলিবার উপকরণের নিতান্ত অভাব। ব্যাক্‌ট্রিয়া, পঞ্জাব ও গুজরাটের নৃপতিদের সভায় গ্রীক নাট্য অভিনীত হইয়াছিল। এইরূপে গ্রীসীয়দের নাট্য-শিল্প-সাধনা ভারতবর্ষ ক্রমে ক্রমে গ্রহণ করিয়াছে। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে একখানি ভারতীয় নাটকের উল্লেখ থাকায় Weber-সাহেবের এই মত অনেকটা খণ্ডিত হইয়া যায়। পরে তিনি বলিয়াছেন যে, ভারতীয় নাট্যসাহিত্য গ্রীসীয়-দিগের নিকট হইতে অল্পই গ্রহণ করিয়াছে।

Weber-এর এই মতবাদ Pischel খণ্ডন করেন। তাহার পর আসেন Windisch ;—তিনি বলেন যে, খ্রীঃ পূঃ ৩৪০ অব্দ হইতে খ্রীঃ ২৬০ অব্দ পর্য্যন্ত গ্রীসে নব Comedy অর্থাৎ New Attic Comedy প্রচার লাভ করিয়াছিল। ভারতীয় নাট্য-সাহিত্যের উপর ইহারই প্রভাব তিনি দেখিতে পাইয়াছেন।

এইবার যবনিকার কথা আসে। অধ্যাপক Levi-র মতে যবনিকা (প্রাকৃত—জবনিকা) পারস্যের কারুকার্য্য করা পর্দাবিশেষ। গ্রীকগণ উহা ভারতবর্ষে লইয়া আসেন। সংস্কৃত নাটকে ঐ শব্দটির ব্যবহার দেখা যায় বলিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, ভারতীয় নাট্যসাহিত্যে বিদেশীয় প্রভাব আছে।

এই প্রসঙ্গে ১৩৩৪ ভাদ্র-সংখ্যার ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত অশোকনাথ ভট্টাচার্য্য একটি সুন্দর সুলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। অধ্যাপক Keith-এর গ্রন্থের Greek Influence on Sanskrit Drama-র অধ্যায়ে পূর্ব্ব পক্ষীয়দের প্রায় সকল মতবাদগুলিই তিনি খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধটি হইতে স্থান বিশেষে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"কিন্তু নব-Comedy ও সংস্কৃতরূপকের এই সাদৃশ্য বিশেষ কিছুই নাই। রোমান ও সংস্কৃত উভয়বিধ নাট্যেই অঙ্কবিভাগ এবং অঙ্ক-শেষে মঞ্চ হইতে সকলের নিষ্ক্রমণ প্রভৃতি বিষয়ে সাদৃশ্য দৈবানুগতিক। দৃশ্য-পরিকল্পনা, নাট্যোক্তিবিভাগ প্রবেশ ও প্রস্থান এবং কোন নূতন পাত্রের প্রবেশের সময় রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত পাত্রান্তরের বাক্যে তাহার সূচনা ইত্যাদি বস্তুরও সাদৃশ্য আছে। এরূপ সাদৃশ্য থাকাও স্বাভাবিক। একই যুগে একই অবস্থায় রূপক উপস্থিত হইলে দেশগত বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও এরূপ সাদৃশ্য আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়।"

যবনিকা-সম্বন্ধে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, প্রাচীন গ্রীক্ নাট্যে দৃশ্যপটের কোথাও উল্লেখ নাই। কাজেই গ্রীক্‌নাটক হইতে ভারতীয় নাটকের এই ঋণ স্বীকার করা যায় না।

অধ্যাপক Keith পরে দেখাইয়াছেন যে, প্রচলিত সংস্কৃত নাটকগুলির বস্তু এবং আখ্যান ভাগের সহিত গ্রীক্ নাট্যের বস্তু ও আখ্যানভাগের কোথাও কোথাও সাদৃশ্য আছে। কিন্তু যাঁহারা এই সকল যুক্তি দেখাইয়া ভারতের ঋণকে প্রমাণিত করিতে চান, তাঁহাদের স্বাভাবিক সত্য বুদ্ধি যে কতখানি বিচলিত হইয়া যায়, তাহাই ভাবি। মানব-সভ্যতার প্রগতি কি সম্পূর্ণ অনুকরণ করে? তাহার মধ্যে কি তাহাদের নিজস্ব কিছু দিবার নাই? মহাকবি Shakespeare-এর Merchant of Venice কি কেবল মাত্র একখানি প্রাচীন ইটালীয় উপন্যাসের অন্ধ অনুসরণ? কেহই তাহা বিশ্বাস করিবেন না। Goethe-এর Iphigenia Emipides-এর হুবহু অনুকরণ নহে। কালিদাসের শকুন্তলাও পদ্মপুরাণের অন্ধ অনুবৃত্তি নহে। প্রতিভা কখনো অন্ধ অনুকরণ বা অনুসরণ করে না। বিদেশীয় প্রভাব তাহাকে সুর দিতে পারে—রস জোগাইতে পারে।

ব্যক্তির যেমন প্রতিভা—জাতিরও তেমনি। জাতির সত্য উদ্বোধনে একটি স্বাতন্ত্র্যের ধারা একটি বিশিষ্ট তেজ সকল কালেই পরিলক্ষিত হয়। ভারতেও হয়। মানুষের মন অনুকূল পারিপার্শ্বিকে এক ভাবেই ভাবিত হইতে পারে। যদি চীনে এবং গ্রীসে স্বতন্ত্রভাবে নাট্যশিল্পের জাগরণ হইতে পারে—শিল্পসভ্যতার জননী ভারতবর্ষেও তাহা হইতে পারে এবং হইয়াছিলও। অধ্যাপক E. P. Horrwitz তাঁহার "Indian Theatre" নামক গ্রন্থে ঠিক এই কথারই ইঙ্গিত করিয়াছেন। আমরাও তাহা বিশ্বাস করি।

অশোকবাবুর প্রবন্ধের শেষ দুটি কথা উল্লেখযোগ্য—"রূপককে সাধারণতঃ আমরা 'লোকানুকৃতিঃ' বলি—কারণ লোক-চরিত্রের মতো ইহাও একটি বিরাট প্রহেলিকা মাত্র!'

বাদলের দিন

এস্‌ ওয়াজেদ আলি

দেখতে দেখতে আকাশে বাদল যেন ঘনিয়ে এলো। ঝুর ঝুর করে বৃষ্টি পড়তে সুরু হলো। বেশ একটু ঝড়ও সঙ্গে সঙ্গে বইতে লাগলো। হাতের বইটি মুড়ে আমি প্রকৃতির বিষাদ লীলা দেখতে লাগলুম। একটা অতৃপ্ত আকাঙ্খা অপূর্ব্ব উৎসবের এক করুণ স্মৃতি, প্রাণের মধ্যে মধুর অথচ বেদনা ভরা অস্পষ্ট গুঞ্জরণ তুলতে লাগলো। অনেক দিন আগে শোনা, কোন উর্দ্দু কবির একটা বিস্মৃত প্রায় গজলের ভাঙ্গা ভাঙ্গা পদগুলি বৃন্তচ্যুত গোলাপের বিক্ষিপ্ত পাপড়ির মত আমার মনের বর্ষা স্নাত প্রাঙ্গনে উড়ে উড়ে বেড়াতে লাগলো। কবি তাঁর প্রাণের আকাঙ্খাটীকে ভাষার ইন্দ্রজালে জীবন্ত করে তুলেছেন! তাঁর কথার যাদু আমার প্রাণের সুপ্ত বাসনাকেও যেন জাগিয়ে তুলছিল। কবি চেয়েছেন শ্রাবণের দিন, "সাওনকা তো মাহিনা হো।" আর চেয়েছেন ঝুর ঝুরে বৃষ্টি, "নাম্নি নাম্নি বরখতা হো।" আর চেয়েছেন পিয়ালা ভরা মদিরা, শরাবকা তো পিয়ালা হো।" আর সকলের উপর চেয়েছেন বাগানের সুষমার নিখুঁত নক্সার মত এক সাকী, "সাকী হুমনে বানাহো।" এই তুচ্ছ কটা জিনিসই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট, এর বেশী কিছুই তিনি চাননা! কি মর্ম্মস্পর্শী নম্রতা!

আমার প্রাণ কিন্তু উর্দ্দু কবির চেয়ে অনেক অল্পেই সন্তুষ্ট হয়! আমি যদি শ্রাবণের মেঘভরা আকাশ আর ঝুরঝুরে বৃষ্টি পাই, সেই সঙ্গে নদীর ধারের নদীর এক নিরালা বারান্দা আর সেখানে আরামে বসবার এক খানা চেয়ার পাই, আর পাশের টেবিলে হাফেজের একটী দিওয়ান আর একটিন সিগারেট, তাহলে অনিন্দ্য সুন্দরী সাকী আর ইয়াকুতী শরাব না হলেও আমার বেশ চলে যেতে পারে! কল্পনা সুন্দরীর যাদুভরা কটাক্ষই আমার চিত্তবিনোদনের পক্ষে যথেষ্ট হবে।

আমি অসঙ্কোচে বলতে পারি, ভোগের বিষয়ে আমি যথেষ্ট economical. বেশী জিনিস একসঙ্গে উপভোগ করতে আমার প্রবৃত্তি একেবারেই হয় না। এক সময় একটা জিনিসকে (অবশ্য তার আনুসঙ্গিক উপচারাদি নিয়ে) ভোগ করতে আমি ভালবাসি; তার বেশী হলে আমার enjoyment-টা পণ্ড হয়ে যায়। এ বিষয়ে আমার রুচি কতকটা জাপানীদের মত।

শুনেছি, তারা একটা ঘরে এক সময় একটীর বেশী ছবি রাখে না; বলে, অনেক ছবি এক সঙ্গে রাখলে কোনটাই উপভোগ করা যায় না। তাদের মনোভাব আমি বেশ বুঝতে পারি; কারণ, আমার প্রাণও তাদের কথায় সায় দেয়।

এই যে বাদলের দিনের কথা বলছিলুম, তখন মনের মধ্যে মিষ্টি এক বিষাদের ভাব আসে, যা বড়ই উপভোগ্য! উৎকট কোন আনন্দ তার সঙ্গে মিশিয়ে দিলে কিন্তু সে ভাবটা থাকে না। একেবারেই থাকে না, তা বলতে পারি না। সেটা তখন মনের তলায় থিতিয়ে পড়ে, আর সেখান থেকে উপরের আনন্দকে তিক্ত করে তুলতে থাকে! ফলে আমরা প্রাণ খুলে আনন্দও করতে পারি না, আর বাদলের বিষাদও উপভোগ করতে পারি না। মন বিরক্তির এক দারুণ অশান্তিতে ভরে যায়। তাই বলছি, প্রকৃতি যখন মনের মধ্যে আপনা থেকেই একটা বিষাদের রাগিণী তোলে, তখন জোর করে তাকে সরিয়ে, কৃত্রিম উল্লাসের এক ছন্দহীন অট্টহাসিতে হৃদয়তন্ত্রীকে ব্যথিত করার পক্ষপাতী আমি মোটেই নই। আমি সেই বিষাদের সঙ্গে সঙ্গে আমার বেদনাভরা প্রাণের করুণ ক্রন্দন মিশিয়েই প্রকৃত আনন্দ পাই।

অপরের কথা বলতে পারি না, তবে আমি সেই বাদলের দিনে, মাশুক সন্দর্শনের চেয়ে, মাশুকের কথা ভেবেই বেশী aesthetic আনন্দ পাই। বাদলের বাদ্য-শিল্পী তার সুনিপুণ তানের অপূর্ব্ব ঝঙ্কারে আমার মনকে সেই করুণ রসের জন্যই বিশেষ করে প্রস্তুত করে। বিরহের বেদনা তখন মনের মধ্যে আশা-আকাঙ্ক্ষা আবেগ-উদ্বেগভরা এক অপূর্ব্ব অনুভূতির সৃষ্টি করে যার মৃদু মধুর হিল্লোলে প্রাণ এক স্বর্গীয় পুলকে পরিপ্লুত হয়ে যায়। কোন স্থূলতর আনন্দই তখন আর ভাল লাগে না।

বিরহের ইন্দ্রজাল প্রেমাস্পদের অপূর্ণতার কথা, তার ত্রুটি বিচ্যুতির কথা, তার অনিত্যতার কথা একেভুলিয়ে দেয়। কল্পনার জীয়ন-কাঠির পরশে সে তখন অপূর্ব্ব এক দৈবরূপ লাভ করে যা বাস্তব জগতে কারও ভাগ্যে ঘটে না, মাশুকের ভাগ্যেও না! তার সেই ত্রিদিব-দুর্ল্লভ রূপ নিয়ে সে আমাকে ফেরদৌসের গোলাপ-শোভিত, বুলবুল-মুখরিত, কল্লোলিনী বিধৌত নিকুঞ্জ-বনে নিয়ে হায় সামান্য এই বিধৌত নিকুঞ্জ-বনে নিয়ে যায়। সামান্য এই পার্থিব জগৎ তখন কতদূরে পড়ে থাকে।

"যো-মজা এন্তেজ্যার মে দেখা, ওহ্ না-কভি ওসালে ইয়ার মে পায়া।" (যে আনন্দ বিরহের ব্যাকুলতায় পেয়েছি, মিলনের মধ্যে তার সন্ধান কখনও পাই নি) বিরহের সেই ব্যাকুলতার উপভোগের জন্য বর্ষার মেঘ-ম্লান দিন যেমন অনুকূল, অন্য কোন দিন তেমন নয়। কবি কালিদাস তাই এই মেঘভরা বাদলের দিনকেই বিরহী যক্ষের হৃদয়ের মধুর খেলা দেখবার জন্য পছন্দ করেছেন, অন্য কোন দিনকেই করেন নি।

আমি বলেছি, বাদলের মাধুর্য্য উপভোগ করবার জন্য আমি নদীতীরের এক বারান্দা চাই। সেই বারান্দাটি কিন্তু আমার একার জন্যই বরাদ্দ করে দিতে হবে। আর কেউ সেখানে থাকলে, মন আমার পারিপার্শ্বিকতার মধ্যেই আটক থাকবে; বাস্তবতার সেই শৃঙ্খল ছেড়ে সে কল্পনার অন্তহীন আকাশে স্বচ্ছন্দ গতিতে উড়ে বেড়াতে পারবে না।

তবে ঘরের ভিতর যদি দুচার জন অন্তরঙ্গ বন্ধু তাস কিম্বা দাবা খেলায় ব্যস্ত থাকেন, আর ঘন ঘন এসে আমায় বিরক্ত না করেন, তাহলে তাতে, আমার ভাবের খেলায় বাধা জন্মাবে না; পক্ষান্তরে, তাঁদের সেই নেপথ্যের অস্তিত্ব, কোন্ সুদূর-বাসী বন্ধুর স্নিগ্ধ স্নেহ-স্পর্শের মত, আমার প্রাণকে পরিত্যক্তের তীক্ষ্ণ ব্যাকুলতা থেকে রক্ষা করবে।

অবশ্য সারাদিন যে এই রকম, ভাবে বিভোর হয়ে, থাকতে পারবো, সে কথা আমি বলছি না। দেহের মত কল্পনারও শ্রান্তি আছে। তার পাখা দুটীও ঘুরে ঘুরে শেষে অবশ হয়ে পড়ে। দেহ নামক জীবটীও বহুক্ষণ ধরে অলস হয়ে বসে থাকতে পারে না। সেও হাত-পা ছোড়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সেই অবস্থা যখন হয়, তখন ভাবের আবেশময় জগৎ ছেড়ে, দৈনন্দিন জীবনের কর্ম্ম-কোলাহলে ফিরে আসা আমার দরকার হয়ে পড়ে।

দীপক

শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

১৫

বিপদ যখন আসে তখন ঝড়ের মতই চারিদিক ছাইয়া আসে।

দীপক মনে মনে ভাবিয়াছিল, এতদিন পরে এবার বুঝি একটু শান্তি হইল। পরিবারের ভিতরে যে অশান্তিটা বাড়িয়া উঠিতেছিল, নিজের মনটা পরিষ্কার হইয়া যাইতেই তাহা দীপকের অনেকটা সহিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু আর এক বিপদ জুটাইল শোভনা আর বিমলা।

কথা নাই বার্ত্তা নাই তাহারা দুইজনে মিলিয়া বাড়ীতেই এক বিদ্যালয় খুলিয়া বসিল। পাড়ার ছোট ছেলেমেয়ে সেখানে পড়িবে খেলিবে—সারাদিনটা, এই বিদ্যালয়েই কাটাইবে। স্কুল বসিল বাইরের একখানা চালা-ঘরে। কয়েকখানা মাদুর কিনিতে যে মূলধনের প্রয়োজন হইয়াছিল বিমলা ও শোভনাই তার ভার লইয়াছিল।

বেলা বারটা বাজিতে না-বাজিতে ছেলেমেয়েতে দীপকদের বাড়ীর উঠানটি ভরিয়া উঠিত। পাড়ার অন্য অনেক বয়স্কা মেয়েও কাজকর্ম্ম সারিয়া তাঁহাদের শেলাইপত্র বা অন্য কাজ হাতে করিয়া আসিয়া জুটিতেন। তাঁহারা উঠানে বসিয়া গল্প করিতেন আর সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের কাজও করিয়া যাইতেন। ছেলেমেয়েরা তাঁহাদেরই চোখের সামনে লিখিত, গল্প করিত; এদিকে ঘরের ভিতরে এক এক দল করিয়া পড়া চলিত।

এই সব কারণে বাড়ীর উপরে যে কিছু অত্যাচার হইত না তাহা নহে। সুষমা তাহা পছন্দ করিল না। কয়েকদিন সহ্য করিয়া একদিন স্কুলের ব্যাপার লইয়া সে ঝগড়াই করিয়া বসিল। কথাটা অজয়ের কানেও গেল।

অজয় বলিল বউদি, আর শোভনারা যা করছেন, তা' ভাল কাজ বলেই আমার বিশ্বাস। এতে আমি কিছু বাধা দিতে চাই না। বরং তুমি যদি পার; সংসারের দিকটার ভার একটু বেশী করে নাও। তা'হলে ওদের স্কুলের কাজ করতে একটু সুবিধা হবে।

সুষমা ঝাঁঝ্ দেখাইয়া বলিল, তোমার যদি তাই মত হয় ত একটা কথা বলে রাখ্‌ছি, আমার ছেলেমেয়েরা কিন্তু ঐ স্কুলে যেতে পারবে না।

অজয় শান্তভাবে উত্তর করিল, তুমি বুঝ্‌ছ না সুষমা। আমাদের বাড়ীতে স্কুল হয়েছে; ঐ স্কুলে আগে আমাদের ছেলেমেয়েরাই যাবে! শুধু যাবে না—সেখানেই লেখাপড়া শিখ্‌বে। আমাদের ছেলেমেয়েদের অন্য স্কুলে দিয়ে অন্যের ছেলেমেয়েদের নিয়ে এই স্কুল করা 'পরহিতসাধন' হতে পারে কিন্তু তাতে মস্ত বড় একটা খুঁত্ থেকে যায়।

সুষমা রাগিয়াই উঠিল। বলিল, তুমি কি বল্‌তে চাও আমার মেয়ে কল্যাণী ঐ ছাই স্কুলে পড়বে আর যত ছোট-লোকের ছেলেমেয়ের সঙ্গে মানুষ হবে!

অজয় একটু মৃদু হাসিয়া বলিল, মানুষ যদি হতে' পারে তবে ত কথাই নাই। আর মানুষ যদি নাই হয় তবু ত এটুকু সান্ত্বনা আমাদের থাক্‌বে যে, যাদের ছোটলোক বলছ তাদের ছেলেমেয়ে আর আমাদের ছেলেমেয়েতে সত্যিকারের তফাৎ খুব বেশী থাকে না।

আর যায় কোথা? সুষমা একেবারে চটিয়া আগুন! প্রায় বাড়ী কাঁপাইয়া তুলিয়া বলিয়া উঠিল, আমার মেয়ে

মানুষ হয় বা না হয় সে আমি বুঝ্‌ব, তার জন্য তাদের ছোটলোক হতে দেব না।

কথা শেষ হইতে না হইতে গট্‌গট্‌ করিয়া সুষমা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

একটু পরে দীপক কি একটা কথা বলিতে আসিয়া দেখিল, অজয় বিশেষ কিছু একটা কথা লইয়া চিন্তান্বিত রহিয়াছে। সে ফিরিয়া চলিয়া যাইতেছিল। অজয় ডাকিল, দীপক, শুনে যাও।

দীপক ফিরিয়া গেল।

অজয় বলিল, বোস।

দীপক আশঙ্কা করিতেছিল, দাদা বোধ হয় স্কুল সম্বন্ধে কোনও কথা বলিবেন।

অজয় বলিল, আমি ত আর সংসারের খরচ কুলিয়ে উঠ্‌তে পারছি না।

দীপক বলিল, তা' ত বুঝ্‌তে পারছি, কিন্তু তার উপায় কি? আর এক'মাস যা' দেখ্‌ছি, তাতে ত আমারও আয় ক্রমে কমেই আস্‌ছে। বাজারে মাল আছে কিন্তু কিনিয়ে নেই।

বলিয়া সে একটু থামিয়া থাকিল; পরে আবার নূতন করিয়া বলিল, আর একটা কথা আমি ভাবছি। যে কাজ আমি করছি, এ কাজ করে' আমার মনে শান্তি পাচ্ছি না। টাকা যখন খুব এসেছে তখনও কোনও আনন্দ পাই নি। তাই এক একবার ইচ্ছে হচ্ছে এ কাজও ছেড়ে দিই।

অজয় কোনও উত্তর করিল না।

কাজেই দীপক নিজ হইতেই বলিল, যখন তুমি বলছ আমাদের দুজনের বর্ত্তমান আয়েও সংসার খরচ কুলিয়ে উঠ্‌ছে না, তখন আমার কাছ থেকে এ রকম কথা শুনে তোমার বোধ হয় খুব কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু আমি পারছি না যা' তা' না বলেও উপায় নেই।

অজয় এবার জিজ্ঞাসা করিল, এ কাজ ছেড়ে কি করবে তবে?

দীপক একটু সাহস পাইল। বলিল, তোমরা মনে কর, তোমাদের একটা ভাই মরে গেছে। সংসারের টাকার খাতার হিসাব থেকে আমি মুক্তি চাই।

অজয় ধীরে প্রশ্ন করিল, কোথায় যাবে?

দীপক বলিল, যাব না কোথাও। তোমাদের ছেড়ে কোথাও যে যাব না তা স্থির করে ফেলেছি। তোমার অপরিসীম সহিষ্ণুতা, তোমার মনের উদারতা, তোমার স্বভাবের সরলতার স্পর্শ থেকে আমি বঞ্চিত হতে চাই না। আমি তোমাদের ভৃত্য, আমি তোমার চিরদিনের অনুগত অনুচর। কিন্তু আমি মুক্তি চাই।

অজয় স্তব্ধ হইয়া দীপকের কথাগুলি শুনিতেছিল।

দীপক একটু থামিয়া আবার বলিতে লাগিল, আমি আমার নিজের মনের কাছ থেকে এই মুক্তিপত্র পাচ্ছি না বলেই তোমার কাছে চাইছি। তাহলেও একটু যেন জোর পাব।

অজয় বলিল, চেয়ে কেউ মুক্তি পায় নি। মুক্তি নিজের করতলগত। মানুষের বুদ্ধি মুক্তি দিতে পারে না; মুক্তি যদি কেউ দিতে পারে ত সে মানুষের চিরন্তন্‌ মন। লোকে তার নাম রেখেছে বিবেক। মুক্তি ফল নয়, রস। ওর নাম সুধা। কিন্তু তার মধ্যে একটা মাদকতাও আছে। সেটা আসে মানুষের ব্যবহারের দোষে।

দীপক বলিল, মন থেকে যতটুকু সায় পেয়েছি তাতে কুলোচ্ছে না বলেই তোমার কাছ থেকেও চাই।

অজয় বলিল, দীপক, আমি জানি, তোমার মধ্যে যে আগুন রয়েছে, তুমি একটু অসাবধান হলে সে আগুনই এতদিনে তোমাকে পুড়িয়ে জ্বালিয়ে ছারখার করে দিয়ে যেত। কিন্তু তুমি সে আগুন কাজে লাগিয়েছ, তাই সে তোমাকে দাহ করে নি, তোমাকে শক্তি দিয়েছে। তাকে নিয়ে কি ভাবে চল্‌বে তা কি তোমার চাইতে আমি বেশী বুঝি, না জানি?

এ উত্তরের উপর দীপকের আর কিছু বলিবার ছিল না। সে অশান্ত মন লইয়াই ফিরিয়া আসিল।

নীচে নামিতেই দীপক শুনিল, কল্যাণীকে লক্ষ্য করিয়া সুষমা বলিতেছে, তুমি আর বাইরের ঘরে পড়তে যাবে না। দুপুর বেলা আমার কাছে পড়বে। পিসিমা কিছু

বলেন বলো, মা বলেছেন ছোটলোকদের সঙ্গে আমাকে মিশতে দেবেন না।

দীপক সিঁড়িতেই দাঁড়াইয়া রহিল। পাছে ঐ অবস্থায় নামিয়া আসিলে সুষমার সঙ্গে আবার কথা কাটাকাটি হয় এই ভয় তাহার ছিল। রাগে দুঃখে তাহার সর্ব্ব শরীর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। শরীরে যেন শক্তি নাই! সে যে কথাগুলি শুনিয়াছে এই জন্য তাহার নিজেরই যেন লজ্জা আসিল। চুপি চুপি নিজের ঘরের দিকেই অগ্রসর হইল।

ঘরে যাইয়া দেখে এক বৃহৎ কাণ্ড। পুষ্প আসিয়াছে, পাড়ার আরও দু একজন মেয়েও আসিয়াছে। তাহাদের লইয়া বিমলা আমপাতা ও ফুল দিয়া লতা গাঁথিতে বসিয়া গিয়াছে। কয়েকটি ছোট মেয়ে কাটিম্ সূতা দিয়া ফুলের মালা গাঁথিয়া চলিয়াছে।

পুষ্প আর শোভনা বসিয়া একখানা লম্বা কাগজে কি লিখিয়া যাইতেছে।

দীপক ঢুকিয়া যেন একটু অপ্রস্তত হইল। অনেকের সঙ্গেই তাহার পরিচয় নাই। শোভনা তাহাকে দেখিয়া বলিল, আজ আর তোমার কাজে যাওয়া হবে না। গেলেও তিনটের মধ্যে ফিরতে হবে।

দীপক হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কারণ?

শোভনা বলিল, আজ আমাদের বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও নামকরণ-উৎসব।

দীপক ঠাট্টা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, খাওয়া দাওয়ার কিছু ব্যবস্থা আছে?

শোভনা উত্তর দিল, নিশ্চয়। খাওয়া ছাড়া কোনও উৎসবে আমাদের আস্থা নেই। দেহ ও মনের জন্য দুই রসেরই ব্যবস্থা না থাকলে উৎসব উৎসবই নয়।—কিন্তু তুমি থাকছ ত?

দীপক বলিল, থাকব নিশ্চয়। তোমাদের কথায় না হোক্, খাওয়ার কথায় থাকতেই হবে। কিন্তু তোমাদের কাজ কর্ম্মগুলি, গোয়েন্দা পুলিশের চাইতে গোপনে হয় দেখতে পাচ্ছি।

পুষ্প হঠাৎ কলম রাখিয়া বলিয়া উঠিল, অনুগ্রহ করে আপনি কথাটা প্রত্যাহার করুন।

পুষ্পর মুখের বিরক্ত ভাব দেখিয়া দীপক একটু বিস্মিত হইয়াছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ কথাটা বল, অসঙ্গত হয়ে থাকলে আমি নিশ্চয়ই তা ফিরিয়ে নেব।

পুষ্প সত্য সত্যই গম্ভীর ভাবে বলিল, ঐ যাদের সঙ্গে আমাদের কাজের পদ্ধতির তুলনা করলেন।

দীপক বলিল, কাদের? গোয়েন্দা পুলিশের?

পুষ্প বলিল, হ্যাঁ। ও নাম আমি মুখেও আনতে চাই না। অত বড় কলঙ্ক বোধ হয় আমাদের দেশে আর কিছু নেই। এত হীন কাজ আমাদের দেশের লোকই করছে ভাবলে মনে হয় আমি সারাজীবন ধরে তাদের প্রত্যেকের পায়ে ধরে বুঝিয়ে বলি, এ কাজ ছেড়ে দিতে। কিন্তু জানি, যারা এ কাজে প্রবৃত্ত হতে পারে তাদের মধ্যে এতটুকু মনুষ্যত্বও থাকতে পারে না যে, আমার মত একজন নারীর মিনতিকে তারা কোনও স্থান দেয়, তাই তাদের কাছে যাই না। তাদের নামের সঙ্গে আর আমাদের বিদ্যালয়ের কাজকে জড়িয়ে এর অপমান করবেন না।

দীপক এতক্ষণে কথাটা বুঝিল। তবু তর্কের খাতিরে বলিল, কিন্তু তাদের এত দোষী করছ কেন? তাদেরও ত পরিবার প্রতিপালন করতে হবে। তারা চাকরী করছে, এবং যে কাজের যে রীতি তাই তারা পালন করে মাত্র! এতে তাদের এত বড় কি অপরাধ হোল?

পুষ্প বলিল, এ চাকরী না করলে যদি তাদের পরিবার কেন, আমার দেশশুদ্ধ সমস্তলোক অনাহারে মরে যায়, আমি বলব, সে আমার দেশের বহু পুণ্যফল। যারা রাজত্ব করতে এসেছে তারা তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য যত প্রকারের পীড়ন আবশ্যক তা আমাদের করুক, কিন্তু বিষাক্ত মাংসখণ্ডের লোভে আমারই দেশের লোক তার নিজের পরিচয় এমন হীনভাবে দেবে এ আমি সইতে পারি না।

শোভনা কাজের কথাটা সারিয়া লইবার জন্য বলিল, দীপক, তোমার কাছে দু' একটা পরামর্শ নেবার আছে।

কল্যাণও হয় ত জানে না এই স্কুলের কথা। সে না হয় পরে জানবে। আমরা ভাবছিলাম, আমরা ক'জন আগে বিপদে আপদে নিজের রক্ষা ও পরের সহায়তা করবার জন্য কিছু শিখে নেব। তারপর আমরাই ছেলেমেয়েদের শেখাব। কিন্তু আপাতত আমাদের শেখায় কে?

দীপক বলিল, তবেই সর্ব্বনাশ করেছ। একে এই স্কুলেই রক্ষে নেই, তার ওপর যদি তোমরা সব লাঠিখেলা, ব্যায়ামচর্চ্চা আরম্ভ কর, তাহলে পাড়ার লোক ত ঠাট্টা করবেই, এই বাড়ীতেও তোমাদের এ স্কুল রাখা দায় হয়ে উঠ্‌বে।

শোভনা উত্তর করিল, সে পরের কথা পরে। আগে আমাদের একজন লোক ঠিক করে' দাও, যে আমাদের শেখাতে পারে!

পুষ্প বলিল, তুমি ত বলছিলে উনিই আমাদের শেখাতে পারেন।

শোভনা বলিল, না ওর কাছে শিখব না। দীপক শেখালে অবশ্য খুব ভালই হোত। ওর হাত চমৎকার। কিন্তু একটু অজানা লোক হলে আমরাও একটু ভয়সমীহ করে' চল্‌ব, তাতে শেখাও ভাল হবে, গাফিলিও করা যাবে না।

বিমলা মুখ তুলিয়া বলিল, দরকার হলে দীপক কি আমাদের শাসন করতে পারবে না?

বিমলা দীপককে নাম ধরিয়াই ডাকিত। বিমলা তাহাকে জন্মিতে দেখিয়াছে, কাজেই দেবর সম্পর্কে ঠাকুরপো ছাড়া আর হইয়া উঠে নাই।

দীপক বলিল, পারব না কেন বড়বৌদি! তবে আমার শাসন তোমরা যদি না মানো তাহলে আমার উপায় কি?

শোভনা বলিল, না দীপক, তোমার শাসনে আমাদের টিট্‌ করতে পারবে না। তোমার শাসন এত গভীর আর এত মধুর যে, তাতে প্রাণে লাগে, লজ্জা হয় বটে; কিন্তু তাড়াতাড়ি কোনও কাজ করাতে গেলে যে চাবুকের দরকার তোমার হাত তাতে তৈরী নয়। তার চাইতে তুমি আমাদের একজন লোক ঠিক করে দাও যাঁর সঙ্গে অপরিচয়টাই একটা মস্ত বড় সম্ভ্রম ও ভয়ের কারণ থাকবে।

দীপক বলিল, আচ্ছা ভেবে দেখ্‌ব।

এতগুলি লোকের কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইয়া ধীরু ভিতরে না আসিয়া দরজার বাহির হইতেই ডাকিল, দীপক!

দীপক তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, তোমারই কথা হচ্ছিল ধীরুদা। মেঘ না চাইতেই জল। চলে এস একেবারে সটান্ ভেতরে।

এতগুলি অপরিচিত মুখ দেখিয়া ধীরু একটু সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল। শোভনা বাড়ীর মেয়ে, তাহার বিশেষ লজ্জা করিবার কিছু নাই। যদিও ধীরুর সঙ্গে এমন কাজে অকাজে চোখোচোখি হইত, তবু এতদিনের মধ্যেও ধীরেনের সঙ্গে শোভনা বা বিমলার আলাপ হয় নাই।

শোভনাই আলাপ করিয়া লইল;—আমার নাম শোভনা, আমি দীপকের দিদি, ইনি আমাদের বড়বৌদি বিমলা, আর ইনি আমাদের বন্ধু ও আত্মীয়ের চাইতেও বেশী, নাম—

নাম আর বলিতে হইল না। পুষ্প ও ধীরু পরস্পরকে অভিবাদন করিল।

ধীরেন বাধা দিয়া বলিল, এঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে।

ধীরেন এইবার দীপককে লক্ষ্য করিয়া বলিল, একটা বিশেষ জরুরী কাজে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। একটি ভদ্রলোক অত্যন্ত পীড়িত হয়ে শহরের ভাঙ্গা পোলটার পাশে অসহায় অবস্থায় পড়ে আছেন। আমি সকালবেলা একটু শহরের দিকে গিয়েছিলাম, ফেরবার সময় আমার চোখ পড়ল। জিজ্ঞাসা করে বাড়ী-ঘরদোরের বিশেষ কিছু পরিচয় পেলাম না। সঙ্গে একটা ব্যাগ। ব্যাগটাকে এমন করে' আগলে রয়েছেন যে, দেখে মনে হোল ওর ভিতরে যেন ওঁর সর্ব্বস্ব লুকোন রয়েছে।

দীপক বলিল, চল তাঁকে এখানে নিয়ে আসি।

ধীরু বলিল, আমি ত সাহস করে তা' বল্‌তে পারি নি। তাই এলাম তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে।

দীপক সব কথা যেন ভুলিয়া গেল। ধীরুকে লইয়া তখনি বাহির হইয়া পড়িল। যাইবার সময় শুধু বলিয়া গেল, দিদি, আমার ঘরটা পরিষ্কার করে রাখ। জিনিষ-পত্র কিছু সরিয়ে ফেল। আর চাদর-টাদরগুলো একটু বদলে দিও।

আধঘণ্টার মধ্যেই সেই পীড়িত ভদ্রলোককে লইয়া দীপকরা ফিরিয়া আসিল। দীপক ও ধীরেন তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া নামাইয়া দীপকের বিছানায় শোওয়াইয়া দিল।

দিন চার পাঁচ ধীরেন ও দীপক অক্লান্ত সেবা করিয়াও তাঁহাকে একটুও ভাল করিয়া তুলিতে পারিল না। ডাক্তারের ঔষধ কাজ করে না, পথ্যে কোনও উপকার হয় না! দেখিয়া শুনিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল। কিন্তু তবু আশা ছাড়া যায় না। পালা করিয়া দীপক আর ধীরু পাহারা দেয়। আর-সব বন্দোবস্ত ভিতর হইতে শোভনা ও বিমলাই করিয়া পাঠায়।

একদিন সন্ধ্যাবেলা, ধীরু ঔষধ আনিতে বাহিরে গিয়াছে, দীপক রোগীর কাছে চুপটি করিয়া বসিয়া আছে। সবে ঘোর হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু পশ্চিমের আকাশ পড়ন্ত রৌদ্রের আভায় তখনও লাল। তাহারই রশ্মি-লেখা ক্ষুদ্র জানালাটি দিয়া শয্যাপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়াছে।

জানালার দিকে পিছন করিয়া বসিয়া দীপক কত কি ভাবিতেছিল। হঠাৎ একবার রোগীর দিকে চোখ ফিরাইতেই দেখিল, রোগী একদৃষ্টে তাহারই মুখের দিকে চাহিয়া আছেন।

দীপক জিজ্ঞাসা করিল, কিছু চান?

রোগী শুধু মাথা নাড়িল।

দীপক বলিল, একটু ফলের রস দেব?

রোগী ধীরে ধীরে বলিলেন, আগে তোমাদের দেখা পেলে হয় ত বাঁচতাম। কিন্তু এখন আর তা' হয় না।

একটু বিশ্রাম করিয়া আবার বলিলেন, এই বালিশের তলা থেকে একটা ছোটশিশি বের করে আমাকে একটু ওষুধ দিতে পার? তাহলে তোমার সঙ্গে দুটো কথা কইতে পারতাম। অনেক দিনের অভ্যাস কি না!

দীপক বালিশের তলা হইতে শিশিটি বাহির করিয়া দেখিল, মর্ফিয়া!

ভদ্রলোক মিনতিভরে বলিলেন, বেশি আর এখন সহ্য করতে পারব না, একটুখানি দাও। দেখি, একটু জোর যদি পাই, তোমাকে কটা কথা বলে যেতে চাই।

দীপক আর কি করে? দু'একবার নিষেধ করিতেও যখন ভদ্রলোক নিতান্ত কাতর ভাবে একটুখানি ওষুধ তাঁর মুখে ঢালিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন, দীপক আর তাহা না দিয়া পারিল না।

মর্ফিয়া কাজ করিতে একটু সময় নিল; রোগী যেন একটু চাঙ্গা হইয়া উঠিলেন। এতদিন পরে আজ এই প্রথম নিজে চেষ্টা করিয়া বালিশের উপর ভর দিয়া একটু কাত হইয়া শুইলেন।

রোগীর ঠোঁট দুইটি কথা বলিবার চেষ্টায় থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল, তাহা দেখিয়া দীপকের বড় কষ্ট বোধ হইল। দীপক তাঁহাকে কথা বলিতে নিষেধ করিল।

তবু তিনি অনেক কষ্টে বলিলেন, আজ বলতে দাও। আমার অনেক দিনের আশা, মৃত্যুর পূর্ব্বে আমার এই আশাটা অন্তত পূর্ণ হতে দাও।

দীপক আর বাধা দিল না। ভদ্রলোক একটু পরে বলিলেন, এই ব্যাগটাতে একখানা চিঠি আছে, যদি পার চিঠিখানা যাঁর নামে আছে তাঁর খোঁজ করে তাঁর হাতে পৌঁছে দিও। আর তা' ছাড়া টাকা পয়সা অনেক আছে, তা' যদি তিনি কোনও রকমে ব্যবহার করতে চান্ আমি খুশীই হব। তিনি না নেন্, তুমি ভাই, কোনও কাজে লাগিও।

একটু থামিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, আর তোমার মুখ দেখে একখানি মুখ আমার চোখের সামনে ভাস্‌ছে। কিন্তু এমনও কি হতে পারে?

দীপক তাঁহার শ্রান্ত মুখে চোখে একটু ঠাণ্ডা জল হাত দিয়া বুলাইয়া দিল।

তিনি হঠাৎ একবারে আর্ত্তের মত বিকৃতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন, ভাই, তোমার কি কোনও বোন্ আছে, আর তার নাম—শোভনা?

জিজ্ঞাসা করিয়াই বিস্ফারিত আঁখিদুটি দীপকের মুখের উপর আকুল প্রতীক্ষায় স্থাপিত করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

প্রশ্ন শুনিয়াই দীপকের সমস্ত দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। বিস্ময়ে, রাগে, সহানুভূতি ও অনুকম্পায় তাহার মনের মধ্যে যেন ঝড় বহিয়া গেল। এক মুহূর্ত্তে যেন তাহার কণ্ঠ শুকাইয়া গেল, জিহ্বা যেন ভাষা ব্যক্ত করিবার শক্তি হারাইয়া বসিল। শুধু বিপুল বেদনায় তাহার সমস্ত শরীর যেন দারুণ অবসাদে একেবারে ঢলিয়া পড়িতে চায়।

এতক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও যখন দীপকের মুখ হইতে কোনও উত্তর শুনিতে পাইলেন না, তখন নিরাশায়, অনুশোচনায় ভদ্রলোক একেবারে অসহায় শিশুর মত কাঁদিয়া উঠিলেন।

দীপক তাঁহাকে শান্ত করিতে চাহিল। এ যে আপন, এতদিনের অনাত্মীয় আজ এই দীনবেশে আত্মীয়ের পরিচয় লইয়া দৈবের বলে তাহাদেরই আশ্রয়ে আসিয়া পড়িয়াছে। আজ আর তাহার উপর প্রতিহিংসা লওয়া চলে না তাঁহার এই মর্ম্মন্তুদ্ যাতনা দেখিয়া দীপকের চিত্ত সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিল।

সে ধীরে ধীরে তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, আছেন, আমার এক বোন আছেন, তাঁর নাম শোভনা। তাঁর স্বামী তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর থেকে তিনি এই বাড়ীতেই আছেন।

বৃদ্ধের যেন সমস্ত সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। পাগলের মত উঠিয়া বসিয়া করুণ বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, আছেন? জীবিত? এই বাড়ীতে? নাম শোভনা? আর তাঁর ছেলে—ছেলে কল্যাণ? সেও আছে?

দীপক ধীরে ধীরে বলিল, আছে।

ধপ্ করিয়া বৃদ্ধের মাথাটা একেবারে বালিশে লুটাইয়া পড়িল। অসহ্য যাতনায় যেন তিনি ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। দীপকের দিকে অতি কষ্টে হাত দুইখানি বাড়াইয়া দিয়া কি যেন ভিক্ষা চাহিতেছিলেন। দুর্ব্বল হস্ত কাঁপিতেছে, প্রত্যেক অঙ্গুলিটি যেন এক পরম ও চরম ভিক্ষা পাইবার জন্য আকুলি বিকুলি করিতেছে। বৃদ্ধের দৃষ্টিতে সে কি করুণা মাখা, অশ্রুজলে উজ্জ্বল।

ক্ষীণকণ্ঠে শুধু বলিতেছেন, দাও ত, ঐ শিশিটা আমাকে। দাও দাও! ঐ সব ঔষুধটা আমার মুখে ঢেলে দাও ত ভাই!

কণ্ঠতালু শুখাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে, তবু কি সে সরল মিনতি; তাঁহার সে যাতনা, সে অবস্থা দেখিলে বোধ হয় তাঁহার নিজের সন্তানও তাঁহার মুখে ঐ ওষুধটুকু ঢালিয়া দিয়া তাঁহাকে শান্তি দিত!

তবু দীপক তাহা পারিল না। তাহার মনে হইল, যদি তাহার দিদি কোনও মতে জানিতে পারেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই রুগ্ন শান্তিহারা স্বামীর সেবা করিতে ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিবেন। শত হইলেও স্বামী! যে স্বামীকে একদিন ভালবাসা দিয়াছেন, তাঁহার দেখা পাইয়া অবহেলা করা অন্তত দিদির পক্ষে সম্ভব নয়। সে দিনের সে অপমান ত শুধু দিদির হয় নি, তাঁহার স্বামীরই কি কম হইয়াছিল!

কিন্তু ভাবিয়া পাইল না, কি করিয়া সে নিজে এ সংবাদ দিদির কাছে পৌছাইবে।

বৃদ্ধের আকুতির আর শেষ নাই। শেষে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া অতি অস্পষ্ট ক্ষীণস্বরে ঐ একই কথা যেন মন্ত্রের মত জপ করিতে লাগিলেন।

ধীরেন ফিরিয়া আসিয়া রোগীর এই অবস্থা দেখিয়া ত ভয় পাইয়া গেল। দীপককে একপাশে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিয়া বৃদ্ধের মাথাটা ঠিক্ করিয়া বালিশে রাখিয়া দিল। কাছেই পুরিয়া করা মকরধ্বজ ছিল। আধমাত্রা আন্দাজ তাড়াতাড়ি কোনমতে গুলিয়া রোগীর মুখে আঙ্গুল দিয়া খাওয়াইয়া দিল।

রাগ করিয়া দীপককে বলিল, একটা বাতিও জ্বালাতে পার নি এতক্ষণ ধরে?

বলিয়াই ধীরু নিজেই ছুটিয়া বাড়ীর ভিতরে গিয়া

শোভনাকে ডাকিয়া বলিল, দিদি, শিগ্‌গীর একটা আলো ঐ ঘরে দিয়ে যান্।

এতদিন ধরিয়া বাড়ীতে একটি রোগী রহিয়াছে; সকলেরই মনে একটা মায়া বসিয়া গিয়াছিল। ধীরেনের গলার আওয়াজে যে শঙ্কা ও হতাশার সুর বাজিয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে বিমলা ও শোভনা দুজনের মনই কেমন ছ্যাক্ করিয়া উঠিল।

শোভনা জানে, ভদ্রলোক বৃদ্ধ, রোগে শীর্ণ কাতর। তাঁহার কাছে যাইতে আর লজ্জা কি? বিশেষ এ সময়ে। তাই তাড়াতাড়ি একটা আলো জ্বালিয়া ছুটিয়া দীপকের ঘরে প্রবেশ করিল।

রোগী ওষুধ খাইয়া একটু শান্ত হইয়াছিল। তাহার ক্লান্ত চোখ দুটি তুলিয়া সন্ধ্যার ম্লান আকাশের দিকে চাহিয়া ছিল। ঘরে আলো আসিতেই ফিরিয়া চাহিল।

শোভনার মাথার ঘোমটাটা একপাশে সরিয়া আছে। চুল খোলা। কপালে সিন্দুরের টিপ্, আলোর আভা পড়িয়া জল্ জল্ করিতেছে। রান্না করিতে উনানের ধারে বসিয়া মুখখানা লাল হইয়া উঠিয়াছিল।

রোগী শোভনার মুখের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে শুধু চাহিয়া রহিল। সে দৃষ্টিতে এবার আর বিস্ময় নয়, ক্লান্তি নয়; একটা পরম শান্তি যেন তাঁহাকে জীবনের কোন্ পরম নিভৃতে টানিয়া লইয়া গিয়াছে।

শেষ নিশ্বাসটা কখন্ পড়িয়াছিল কেহ জানিতেও পারে নাই। বাতিটাও একবার কাঁপে নাই।

শোভনা কিন্তু এত কাছে আসিয়াও স্বামীকে চিনিতে পারে নাই। এতই বিকৃতি, এতই বুঝি পরিবর্ত্তন হইয়াছিল চেহারার।

চোখের পাতা আর পড়ে না দেখিয়া দীপক রোগীর মুখের কাছে মুখ লইয়া গেল। শ্বাস ত নাই! হাত দিয়া, কান দিয়া উন্মত্তের মত সে রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস পরীক্ষা করিতে লাগিল। শেষে নিশ্চিন্ত জানিয়া হঠাৎ ব্যাকুল-কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, দিদি, এই তোমার স্বামী!

শোভনা চকিতে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া একেবারে স্বামীর পায়ের উপর পড়িয়া তাহার সিন্দুর-রক্ত কপালখানি ঘষিতে লাগিল।

(১৬)

প্রসাদ একদিন কাঁদিয়া পড়িয়া দীপককে বলিল, দাদাবাবু, মেয়েটাকে রাখার ত একটা ভাল ব্যবস্থা করতে পারলাম না। যদি পাই এখন না হয় বিয়ে দিই। কিন্তু যতদিন তা না হয়—আমরা ভাল জাত দাদাবাবু,—আপনাদের কাছে রাখলে আমি রক্ষে পেতাম, মেয়েটাও বাঁচত!

দীপক মনে মনে ভাবিল, হায় অদৃষ্ট, আমাকেই কে রাখে তার ঠিক নেই। বলিল, প্রসাদ, তোমরা জাতে কি তাই নিয়ে কোনও কথা হচ্ছে না। কিন্তু মালাকে কোথায় কি হিসাবে রাখা যায় সেই কথাটাই আসল কথা।

প্রসাদ যেন একটু আশ্বস্ত হইল। বলিল, কেন, আপনাদের বাড়ীতে দাদাবাবু?

দীপক একটু হাসিল। বলিল, প্রসাদ, তোমার ভালবাসার কাছে আমি দাদাবাবু, মস্ত বড় একটা লোক। কিন্তু আমাদের বাড়ীতে আমার নিজের অধিকার কতটুকু?

প্রসাদ বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, সে কি কথা দাদাবাবু? আপনি যদি মালাকে রাখতে চান্ মেজদাদা-বাবু কি একটি কথা বল্‌বেন আপনি মনে করেন? আমি ত জানি, তিনি আপনাকে যেমন জানেন, এমন করে আপনার বন্ধুবান্ধবরাও জানেন না।

দীপক আবার মৃদু হাসিয়া বলিল, প্রসাদ, তোমার কথা সব মানলাম। বাড়ীতে কেবল আমি আর আমার দাদাই

ত' থাকি না, অন্য লোকও থাকেন। তাঁদের সুবিধা অসুবিধার কথা ত আমাদেরই ভাবতে হবে।

প্রসাদ বলিল, মালা থাকলে ত তাঁদের আরও কাজের সুবিধা হবে দাদাবাবু।

দীপক অত্যন্ত ব্যথিত-কণ্ঠে বলিল, প্রসাদ, তুমি ভুল করছ। পৃথিবীতে তোমার মত মন সকলের নয়। ধরে নাও অন্য সকলের কথাই ছেড়ে দিলাম, কিন্তু আমাদের ব্যবস্থায় মালার যদি কোনও ক্ষতি হয় তাহলে কি মনে হবে বল ত?

প্রসাদ কথাটা একেবারে পড়িতেই দিল না। জোর করিয়া বলিল, আপনাদের আশ্রয়ে থেকে যদি মালার কিছু ক্ষতি হয় তাহলে তাকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচান আমার মত বাবার কর্ম্ম নয়।

দীপক ধীরে ধীরে বলিল, প্রসাদ, জান ত আমি অবিবাহিত—এবং—মালা অবিবাহিতা?

প্রসাদ জিভ্ কাটিয়া বলিল, এমন কথা আপনার মুখ থেকে বল্‌বেন না দাদাবাবু!

দীপক উত্তর করিল, কিন্তু অন্যের মুখ থেকে যদি সেই কথাই বের হয় তা চাপা দেবে কি দিয়ে?

প্রসাদ বার দুই চিন্তিত মনে ঘাড় নাড়িল। কিছুই যেন কিনারা করিয়া উঠিতে পারিল না। এমনি ভাবে বলিল, তা হলে ত আর কোনও পথ নেই! একদিন বাড়ী এসে দেখব, যা' অদেষ্টে ছিল তাই হয়েছে।

এ কাতরোক্তি দীপকের স্বচ্ছ হৃদয়ের উপর একটা ছায়া ফেলিয়া দিল। দীপক কি ভাবিয়া হঠাৎ বলিল, প্রসাদ, সব বদ্‌নামের জন্য তুমি প্রস্তত?

প্রসাদ হাসিয়া বলিল, বদ্‌নাম এমনেও হয়েছে অমনেও হবে। তবু একটা আশা তাকে আপনারা শুধু বদ্‌নামটা কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে মাঠের মাঝখানে ছেড়ে দেবেন না।

দীপক বলিল, প্রসাদ, আজ আর নয়, তুমি আর তিন দিন পরে আমার কাছে এসো। আমি যা পার্ব্ব তা বল্‌বো। তবে তার আগে তোমার কাছে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। তোমার বাড়ী আমাকে ছেড়ে দেবে, জমী ঘর যা' আছে?

প্রসাদের চোখ দুইটা হঠাৎ জলে ভরিয়া উঠিল। সে ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভাড়া নিয়ে?

দীপক প্রথমটা কিছু উত্তর দিতে পারিল না। পরে বলিল, ধর ভাড়া যদি এখন না-ই দিতে পারি?

প্রসাদ হঠাৎ হাতজোড় করিয়া আনন্দে ডগমগ হইয়া বলিল, তা হলে পারব দাদাবাবু, খুব পারব। তবে তার সঙ্গে প্রসাদকেও নিতে হবে—বিনা ভাড়ায়।

দীপক তাহার নিজের অন্তরের দিকে চাহিয়া নীরবে বলিল, শক্তি ও স্বার্থের যেন সংঘাত না হয় ঠাকুর।

বলিল, প্রসাদ, আমার ত্রিশ বত্রিশ বছরের জীবন! কিছুই শেষ হয় নি। মনের আর শরীরের যতগুলি রিপু তা সব আছে আমার মধ্যে। সে সব একেবারে আগুনের মত জ্বলছে। একটু সুবিধার হাওয়া পেলেই হয়। কিন্তু ঐ হাওয়াটুকু থেকে তুমি আমাকে বাঁচাবে।

প্রসাদ তাহার বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া বলিল, দাদাবাবু, কোনওটাকেই ঘেন্না করবেন না। তেল, পলতে, পিদীম—সবই চাই,—তবেই না আলো হয়। তুমি নিজে যদি আলগা মানুষ হও, সে পিদীমে ঘর জ্বালাবে এ আর একটা বড় কথা কি?

দীপক আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিল, প্রসাদ, তুমি কে?

প্রসাদ নির্ব্বিকার ভাবে উত্তর করিল, আমি একটা চোর দাদাবাবু।

দীপক জোর করিয়া বলিল, বিশ্বাস করি না প্রসাদ!

প্রসাদ অকুণ্ঠিতভাবে হাসিয়া বলিল, চোরাই মালের সব খুইয়েছি দাদাবাবু, কিছু ধরে রাখতে পারলাম না। ঐ একটা তার কাঁটা আজও পড়ে আছে। ওটাকে তাই আপনার হাতে সঁপে দিয়ে একবার এই বুড়ো হাড়ে লাঠি ধরে' গিয়ে সেই গাঁয়ে দাঁড়াতে চাই। দেখি একবার তারা কি চোখে প্রসাদকে দেখে।

প্রসাদের জীর্ণশীর্ণ মুখের উপর কোটরগত চক্ষুদুটি অন্ধকার আকাশের তারার মতই উজ্জল দেখাইতেছিল।

এমন সময় মালা আসিয়া দীপককে দেখিয়া খুশী হইয়া বলিল, রমণিরা আমাকে ইস্কুলে ভর্ত্তি করে

নিয়েছেন। আমি আজ ছোট ছোট ক'জন ছেলেমেয়েকে পড়ালাম ও আবার দিদিমণিদের কাছে গিয়ে পড়লামও।

দীপক হাসিয়া বলিল, তুই আবার পড়ালি কি রে?

মালা বাপের গায়ের কাছে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কেন, আমি ত মায়ের কাছে অনেকখানি শিখেছিলাম!

দীপক প্রসাদের মুখের দিকে তাকাইল। প্রসাদ মাথা নীচু করিয়া বলিল, সে কিছু কিছু লেখাপড়া জানত।

মালা গর্ব্বভরে বলিল, বাবাও জানে কাকাবাবু। এখন ত বাবাই আমাকে পড়াত।

প্রসাদ বাধা দিয়া বলিল, সে কিছু নয় দাদাবাবু! কবে কি শিখেছিলাম, মাটি কুপিয়ে কুপিয়ে সে কি আর মনে আছে কিছু!

দীপক একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, প্রসাদ, আজকের মত যাই ভাই। আমার বড় ক্লান্তি বোধ হচ্ছে।—যদি পার ওদের গিয়ে বলো, আজ আমি যাব না। ওরা যেন নিজেরাই সব করে নেয়।

প্রসাদ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, বাবুরা কসরৎ করে' আর লাঠি খেলে কি লাভ হবে দাদাবাবু? ওঁরা ত আর কারুর গায়ে লাঠি তুল্‌তে পারবেন না।

দীপক হাসিয়া বলিল, কারুর গায়ে লাঠি তোলার আগে যে সাহসটুকুর দরকার হয় ঐ সাহসটুকু এতে বাড়ে। লাঠিটা পড়ে শুধু গায়ের জোরে না, মনের জোরে। ওটা আমাদের মোটেই নেই।

প্রসাদ একবার আনন্দভরে নিজের হাতদুইটা কচলাইয়া লইয়া বলিল, আমিও দু'চার হাত দেখিয়ে দিতে পারি দাদাবাবু।

নিজের হাতের চামড়া আঙুল দিয়া টানিয়া ধরিয়া বলিল, আজও এমন কিছু ঢিলে হয় নি, কি বলেন? আপনাদের সঙ্গে থাকতে থাকতে আবার হয় ত যৌবন ফিরে পাব।

দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া আনন্দে বলিয়া উঠিল, এতদিন তেমন মানুষের দেখা পেলাম না দাদাবাবু, তাই মরে গেছি দাদাবাবু। তা নইলে আধপেটা খেলেই বা এতবড় একটা দেহের কি হয়। যদি মনে রস থাকে, অ্যা?

দীপক সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আদ্ধেক বল্—মনে।

প্রসাদ চোখ বড় করিয়া বলিল, না দাদাবাবু, শুধু মনের বলে হয় না। একটু আধটু শরীরেও থাকা চাই। কেমন, না? পাটখড়ি দিয়ে আগুন ধরান যায়, কিন্তু নেবান যায় না।

দীপক তাহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসিয়া শুনিল, বাড়ীতে বিষম গোল বাধিয়াছে।

দীপক বিমলাকে বলিল, সহ্যের একটা সীমা আছে।

বিমলা ধীরে ধীরে বলিল, না দীপক, তা নেই। অন্তত মানুষের সহ্যের সীমা নেই। ঠিক তোমরা যেমন ভাবছ, সেও তেমনি ভাবছে। সেও হয় ত মনে মনে ভাবছে, তোমাদের এ সব অত্যাচার বা উৎপীড়ন এবং তা সে অপরিসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে সহ্য করছে। আর সঙ্গে সঙ্গে তখুনি ঐ একই কথা ভাবছে—সহ্যের একটা সীমা আছে। অথচ ইচ্ছায় হোক্ অনিচ্ছায় হোক্ সবই সে সহ্য করছে।

দীপক বলিল, তবু তাঁর এ ধরণের কথাগুলি কি ভাল?

বিমলা ধীরে ধীরে বলিল, কথাগুলি হয় ত ভাল না, কিন্তু তবু যদি সে সত্যই ভাবে আমরা সব তার সংসারটির ওপর ভার হয়ে আছি, সেটা ত মিথ্যে নয়। আমি, আমার ছেলেমেয়ে, ঠাকুরঝি বা তুমি এই সংসারের এমন কিছু সাহায্য করতে পারছি না। ওরা একলা থাকলে হয় ত ওদের আয়ে ওরা এর চাইতে স্বচ্ছল ও স্বচ্ছন্দ অবস্থায় থাকতে পারত।

দীপক জিজ্ঞাসা করিল, আমি না হয় সরে যেতে পারি, কিন্তু তোমরা এখানে থাকা ছাড়া যাবে কোথায়?

বিমলা বলিল, একটা কথা ভেবে দেখো দীপক। আমাদের বড় পরিবারের কোনও চিহ্নই এ বেচারা দেখতে পায় নি। বাবার অবর্ত্তমানে তোমার বড়দা যখন সংসারের

কর্ত্তা হলেন, তখন তিনিই ছিলেন সব। অন্যায় ন্যায় সব রকম খবরই তিনি করেছেন, কিন্তু তাতে কেউ একটি কথা বলে নি। একসঙ্গে থাকতে গেলে পরিবারের মাথার ওপর যিনি থাকেন তাঁকে এমনি করে মেনে না চল্‌লে এক সঙ্গে থাকা অসম্ভব। আর তা ছাড়া, ও যা হয় ত মনে করে এসেছিল, এ সংসারে এসে তা কিছুই পায় নি। প্রত্যেক মেয়েই আজকাল একান্ত নিজের বলে একটা সংসার পাততে চায়। সে সুযোগও ঘটে নি। আমরা যখন তোমাদের পরিবারে এসেছিলাম, তখন ঐ বড় সংসারটাই আমার বলে জানতাম। কাজেই আলাদা করে নিজের একটি সংসার ও তার সুখ-সুবিধার কথা ভাবতেই পারি নি। বউ যদি তা ভেবে থাকে তা হলে তাকে খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না। সে চারিদিকে দেখেছেও যা ভাবছেও তাই।

দীপক একটু ভাবিয়া বলিল, আচ্ছা, আমরা যদি ওঁকে আমাদের সঙ্গে কাজেকর্ম্মে ভাবনায় এককরে মেলাতে চেষ্টা করি তাহলে কিছু ফল হয় না?

বিমলা বলিল, সবটুকু নির্ভর করে কার কি রকম মনের গতি তার ওপর। ওকে মেলাতে চাইলেই যা ও মিলবে কেন? তোমাদের যা ভাল মনে হচ্ছে ওরও যে তাই পছন্দ হবে এমন কথা তুমি কেন ভাবছ?

দীপক যেন বড় মুস্কিলে পড়িল। নিতান্ত অসহায়ের মত বলিল, তবে কি কোনও উপায় নেই? আমার সকল আশাই বৃথা হোল?

বিমলা বুঝাইয়া বলিল, দীপক, দুঃখ করো না। শিশুকাল থেকে আমরা আমাদের প্রকৃতির মধ্যে যতটুকু যা নিয়ে আসি তা' থেকে পার পাওয়া খুব দুঃসাধ্য। মানুষের যদি নিজের কোনও চেষ্টা থাকে তাহলে অনেক সময় কিছু পরিবর্ত্তন হয় বটে, তা নইলে আমরা প্রত্যেকেই নিজেদের স্বভাবের কাছে একেবারে বিকিয়ে আছি।

দীপক ভাবিয়া বলিল, তাহলে তোমাদের কাজকর্ম্ম নিয়ে কি করা যায়?

বিমলা স্থিরভাবে বলিল, এখান থেকে সরিয়ে নাও। যে গান ভালবাসে না, তার কাছে গানের সুরটা পর্য্যন্ত বিশ্রী একটা শব্দ বলে' মনে হয়। আর আমাদের কাজে ত গোলমালই বেশী তাতে তার খারাপ লাগবে না?

তিনদিন পার হইতে হইল না। দীপক নিজেই প্রসাদকে ডাকিয়া বলিল, বাঁশ দড়ি খড়, কত লাগে বল—একখানা বড় দেখে চালাঘর তুলতে চাই।

প্রসাদ সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় দাদাবাবু?

দীপক উত্তর করিল, তোমার জমীর ওপর।

প্রসাদ কথাটা যেন বিশ্বাস করিতে পারিল না। তবু খুব সহানুভূতির সুরে বলিল, তার আর কি। গোটা কয়েক টাকা আমার হাতে ফেলে দেন। তাই দিয়ে ত আরম্ভ করি, তারপর যেমন যেমন দরকার হয় পরে বোঝা যাবে।

পরামর্শ, মাপ-জোক সব হইয়া গেল। পরের দিনই পাড়ার লোক দেখিয়া অবাক হইল, প্রসাদের জমীতে বাঁশ, খুটি, মাটি, দড়ি, খড় গাড়ী গাড়ী আসিয়া পড়িতেছে।

দীপক সেই যে প্রথম গোটা চল্লিশেক টাকা প্রসাদকে দিয়াছিল, তারপর সেও চায় নাই, দীপকও দেয় নাই। অথচ দিন কয়েকের মধ্যেই বড় চালাটার অনেকখানি উঠিয়া পড়িল। আর তার একটু দূরেই একখানি মাট-কোঠাও দেখা দিল।

রাত্রেও কাজ চলে। দীপক দিনের কাজ শেষ করিয়া রাত্রে আসিয়া প্রসাদের সঙ্গে গল্প করে, হিসাবটা পত্তরটা লিখিয়া রাখে।

একদিন দীপক বলিল, প্রসাদ, এত জিনিষ যে ধারে আনছ, শেষে এক সঙ্গে শোধ করব কেমন করে?

প্রসাদ বলিল, ধার কি দাদাবাবু? মা যে সব খরচ দিচ্ছেন। যাঁর কাজ তিনি করছেন।

দীপক অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, মা কে আবার প্রসাদ?

প্রসাদ তেমনি সহজ সরল হাস্যে উত্তর করিল, কেন, আমাদের সুষমা বৌদি—নূতন বউ!

দীপক কথাটা শুনিয়া শুধু বলিল, প্রসাদ, এ সত্য কথা?

প্রসাদ বলিল, সত্য কথা দাদাবাবু। মিথ্যে আমি বলি, কিন্তু আপনার কাছে কখনও বলি না।

দীপক জিজ্ঞাসা করিল, আর কেউ জানে এ কথা?

প্রসাদ বলিল, না, আর কেউ জানে না। সবাই ভাবছে তুমি সব টাকা পয়সা দিচ্ছ। আর মা বারণও করে দিয়েছিলেন কারুকে বলতে কিন্তু তোমাকে না বলে পারলাম না।

দীপক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, ধীরুদা?

প্রসাদ মাথা নাড়িয়া বলিল, কেউ না। উনি আসেন, সারাদিন কাজকর্ম্ম দেখেন, কোথায় কেমনটি হবে বলে দেন। তারপর সন্ধ্যে হতেই কোথায় চলে যান।

দেখিতে দেখিতে প্রসাদের বাড়ীতে যেন একখানি ছোটখাটো গ্রাম বসিয়া গেল। ধোঁয়া নাই, কল নাই, কারখানা নাই, তবু সারা গ্রামটি ও আশে পাশের মজুর ঘরামী কাজ করিয়া যেন কুল পাইতেছে না।

—ক্রমশ

নীলার বারাস্থা

সংগ্রাহক—মহম্মদ মনসুর উদ্দীন

[এই বারাস্থা (বারমাসী) গানটী পাবনা জিলার চর খলিলপুরের জসীম খাঁ সাহেবের নিকট হইতে সংগৃহীত। বারাস্থা গানগুলি কৃষকগণের অতিপ্রিয় গান, ধান পাট নিড়াতে ও কাটিতে তারা এ গান গাহিয়া পল্লীমাঠ মুখরিত করিয়া তুলে।

সম্প্রতি রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন মহোদয়ের সম্পাদকতায় যে "পূর্ব্ববঙ্গগীতিকা" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে নীলার বারাস্থার এক অংশ পাওয়া যাইবে। এই বারমাসী গানটী কবি জসীম উদ্দীন সাহেব সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাতে এই গানের একভাবমূলক কতকগুলি ছত্র আছে। যথা—

তার দিব তরু দিব রে পায়েতে পাশলী।
গলেতে তুলিয়া দিব নীল্যা স্থবর্ণ হাসলী।
কানে দিব কর্ণফুল হা রে নাকে সোনার বেশর।
(ওরে) আরও কর্ম্ম কুইচ্যারে দিব যেমন ভ্রমরা পাগল॥

[পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা, পৃঃ ১৩৫]

এবং "অষ্ট অলঙ্কারের" উল্লেখও আছে। এই গানটী যেন পল্লীপুষ্পের ন্যায় কোমল, পেলব এবং মধুর ভাবময়। এই ধরণের যে কত গান রহিয়াছে কে বলিবে?—সংগ্রাহক]

নীলা ও সুন্দর রে ও আমার নীলা হুতুন করোল রে।
তুমি ধোপ-কাপড়ে লাগাইছো কালির মৈলাম রে।।
এ না কালির মৈলাম রে ও মোর সাধু সাবানে উঠাবো রে।
আমার মনের কালি না উঠে জনমে রে॥
ঝাড়ের বাঁশ কাটিয়া রে ও মোর নীলা সাজালাম বাঙ্গালা রে।
আমার দাড়ী-মাল্লা বস্তা ন্যায় দরমা রে॥
সীতাপাটি বেচ্যা রে ও মোর সাধু দাড়ী-মাল্লারে দেবো রে।
তুমি আরো ছয়মাস রহিবা ও আমার ঘরে॥
ঝাড়ের বাঁশ কাটিয়া রে ও মোর নীলা সাজালাম বাঙ্গালা রে
আমার দাড়ী-মাল্লা বস্তা ন্যায় দরমা রে॥
হাতের বাজু বেচ্যা রে ও মোর সাধু দাড়ী-মাল্লারে দেবো রে
তুমি আরো ছয়মাস রহিবা ও আমার ঘরে॥
পাতাজলে নাম্যা রে ও মোর নীলা পাতা মাঞ্জন করে রে।
আমার মনের কালি না গেল জনমে রে॥
হাঁটুজলে নামিয়া রে ও মোর নীলা হাঁটু মাঞ্জন করে রে।
আমার নীলার পরাণ না নেয় ঘর-বাড়ী রে॥
বুকজলে নামিয়া রে ও মোর নীলা বুক মাঞ্জন করে রে।
আমার নীলার পরাণ না নেয় ঘর-বাড়ী রে॥

থুথুজলে নামিয়া রে আমার নীলা থুথু মাঞ্জন করে রে।
আমার নীলার পরাণ না নেয় ঘর-বাড়ী রে॥
ও সাধু বলে রে—একেতে আশ্বিন মাসে রিশিভাগ রাতে।
রিশির শয়নে দেখি নীলা তুই বড় যুবতী রে॥
ও সাধু বলে রে—একেতে অঘ্রাণমাসে মদনেরই বাড়ি।
তোমার সর্ব্বাঙ্গে তুল্যা দেবো অষ্টালঙ্কার॥
সাধু বলে রে—একেতে পৌষ মাসে রে দু-গুণ পড়ে জার।
একেলা ঘুমাও নারী জোড়-মন্দিরার ঘর॥
ও নীলা বলে রে—এমন নারী নহে আমরা ঘুমাইয়া ভুলি।
পর রে পুরুষ নিয়া খেলা নাহি করি॥
ও সাধু বলে রে খিল খাড়্যা বাঁকমল দেবো পায়েতে বাসলী।
মাঞ্জাতে জিঞ্জিরা দেবো গলেতে হাঁসুলী॥
পরিধান বসন দেবো কামরাঙ্গা সাড়ী।
দুইকানে ঝুল-বিস্তার দেবো সোনার মদনকড়ি॥
ও নীলা বলে রে—শাশুরীর দুর্লভ আমার সোয়ামীর পরাণ।
পর রে পুরুষ দেখি আমরা বাপ-ভাই-এর সমান॥
ও নীলা বলে রে—একেতে মাঘমাসে গাছে গুয়া পাকা।
মোর সাধু আসবে দ্যাশে করবো আমি খেলা॥

মীনকেতন

ন্যূট হামসুন

অনুবাদক—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

চব্বিশ

তুষারাহত প্রথম রাত্রি।

ন'টায় সূর্য্য ডোবে। মরা অন্ধকার মাটির বুক জুড়ে বসে,—একটি তারাও দেখা যায় না, দু'ঘণ্টা বাদে চাঁদের আভাস জাগে—একটুখানি। বনে বেড়াই, সঙ্গে বন্দুক আর কুকুর,—আগো জ্বালাই। কুয়াসা নেই।

"শীতের প্রথম রাত!"—সমস্ত অরণ্য আমার অন্তরে শিহরিত হচ্ছে।

"মানুষ, পশু ও পাখী, তোমাদের ধন্যবাদ, বনে এই নির্জ্জন রাত্রিটির জন্য ধন্যবাদ তোমাদের। এই অন্ধকার ও এই বনমর্ম্মরের জন্য ধন্যবাদ,—নিঃশব্দতার এই কোমল

সঙ্গীত,—সবুজ পাতা, মুমূর্ষু পাতা,—ধন্যবাদ! এই যে প্রাণধারণের ছন্দ,—মাটির ওপরে কুকুর নিঃশ্বাস ফেলুছে,—সব কিছুর জন্য ধন্যবাদ! ধন্যবাদ ধরণীর হৃদয়ের এই অবারিত স্তব্ধতার জন্য, তারার—ঐ আধখানা চাঁদের,—ধন্যবাদ সব কিছুর জন্য।"

দাঁড়িয়ে শুনি। কেউ নেই। ফের বসে' পড়ি।

"ধন্যবাদ—এই একাকী রাত্রি, পাহাড়, সমুদ্র ও অন্ধকারের দুর্নিবার স্রোত,—আমার আপন বুকের মধ্যে। এই জীবন পেয়েছি বলে ধন্যবাদ.—এই যে নিঃশ্বাস নিচ্ছি, অন্তত আজ রাতটি যে বাঁচলাম,—ধন্যবাদ, ধন্যবাদ! পুব ও পশ্চিম,—শোন তোমরা! যে নিঃশব্দতা আমার কানে কথা কইছে,—এ স্তব্ধতা যেন প্রকৃতির রক্ত!—যেন এ-পার থেকে বহুদূরে কে তরী টেনে চলেছে,—শেষহীন উত্তরের দিকে,—ধন্যবাদ, সে তরীতে আমিই যাত্রী, আমিই!"

স্তব্ধতা। গাছের শাখা ভেঙে পড়ে।—তাই ভাবি। চাঁদ অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে,—শেষ রাতে বাড়ী ফিরি।

শীতের দ্বিতীয় রাত্রি,—সেই অপূর্ব্ব স্তব্ধতা, সুকোমল শান্তি। গাছে ঠেস্ দিয়ে বসে ভাবি,—তাকিয়ে থাকি।

ঈশপ্ মাথা তুলে কি শোনে,—কা'র পদশব্দ যেন; গাছের আড়ালে এভা এসে দাঁড়ায়।

"আজ বিকেলটা খুব খারাপ যাচ্ছে,—মনে একটুও সুখ নেই।" বলি।

সহানুভূতিতে ও কিছু বলে না।

"তিনটে জিনিষ আমি খুব ভালবাসি।" বলি,—"যে প্রেম হারিয়েছি, সেই প্রেমের স্বপ্ন ভালবাসি, ভালবাসি তোমাকে, আর এই জায়গাটুকুকে।"

"এর মধ্যে সব চেয়ে কা'কে ভালবাস?"

"সেই স্বপ্ন।"

আবার স্তব্ধতা। ঈশপ্ এভাকে চেনে, এক পাশে ঘাড় কাৎ ক'রে ওর দিকে তাকায়।

বলি, "রোজ একটি মেয়েকে পথে দেখি, তার প্রেমিকের সঙ্গে বাহুবদ্ধ হয়ে বেড়ায়। আমার দিকে তাকিয়ে মেয়েটি হেসে উঠ্‌ল,—আমি পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম।"

"কেন হাস্‌ল?"

"জানি না। আমাকে দেখেই হয় ত'। কেন জিগ্‌গেস করছ?"

"তুমি চেন তাকে?"

"হ্যাঁ, আমি নমস্কার করলাম।"

আর, ও তোমাকে চেনে না?"

"না, এমন ভাব দেখাল যেন চেনে না।... ওখানে বসে' বসে' তুমি আমার মনের সব কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বা'র করবে নাকি? তার নাম তোমাকে কিছুতেই বল্‌ব না।"

চুপচাপ।

ফের বলি, "কি দেখে হাস্‌ছিল? ও একটা ফ্লার্ট,—। আমি ওর কি অনিষ্ট করেছি?"

"তোমাকে দেখে ও হেসেছিল,—ও খুব নিষ্ঠুর।" এভা বলে।

"না, নিষ্ঠুর নয়। কেন তুমি তাকে নিন্দা করছ? কোনোদিন ও কঠিন হয় নি, ও যে আমার দিকে চেয়ে হেসেছে,—সে ওর দয়া, ওর অধিকার আছে। চুপ কর, যাও এখান থেকে, আমাকে একা থাকতে দাও। শুন্‌ছ?"

এভা ভয় পেয়ে চলে' যায়। ওর কাছে বসে' পড়ে বলি,—"বাড়ী যাও এভা,—তোমাকেই, তোমাকেই আমি ভালবাসি। লোকে কোনদিন স্বপ্ন ভালবাসে? তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিলাম এতক্ষণ। কিন্তু এখন বাড়ী যাও লক্ষ্মীটি, কাল আমিই তোমার কাছে যাব,—মনে রেখো, আমি তোমারই। ভুলো না,—বিদায়!"

এভা বাড়ী চলে' যায়।

শীতের তৃতীয় রাত্রি,—নিদারুণ। আলো জ্বালি।

"এভা, কেউ চুল ধরে' যদি হেঁচ্‌ড়ে টেনে নেয়, বেশ লাগে এক-এক সময়। কি সহজেই মানুষের মন দুমড়ে দেওয়া যায়! পাহাড়, মাঠ,—সমস্ত কিছুর ওপর দিয়ে মানুষকে চুলে ধরে' টেনে নিয়ে যাচ্ছে,—যদি কেউ

শুধোয়,—কি হচ্ছে? সে আনন্দে বলে' ওঠে—'আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে চুলে ধরে'।' যদি কেউ ফের বলে—'তোমাকে রক্ষা করব?' সে জবাব দেয়—'না।' যদি তা'রা বলে,—'কি করে' এ যন্ত্রণা সইছ?' সে বলে,—'আমি সইতে পারি, যে হাত আমাকে চুলে ধরে' টান্‌ছে সেই হাতকেই আমি ভালবাসি।' এভা, জান—আশা করে' চেয়ে থাকায় কী সুখ?"

'জানি বোধ হয়।"

"চমৎকার এই আশা,—ভারি অদ্ভুত! ধর, এক দিন ভোর বেলা পথে বেরুলে, আশা,—তার সঙ্গে তোমার দেখা হবে। তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়?—হয় না। কেন হয় না? কেন না সে হয় ত সেই ভোর বেলা কোনো কাজে ব্যস্ত আছে। ... একদিন পাহাড়ে আমার এক বুড়ো অন্ধের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল,—আটান্ন বছর ধরে' ও চোখে কিছু দেখে নি, তখন তার বয়স সত্তর। ওর মাথায় কি করে' যেন ঢুকেছে যে, আস্তে আস্তে ও একটু একটু করে' চোখের দৃষ্টি ফিরে পাচ্ছে। যদি এম্‌নি উন্নতি হ'তে থাকে তবে ও কয়েক বছরের মধ্যেই সূর্য্যকে আবিষ্কার করে' ফেল্‌তে পারবে। ওর চুল এখনো কালো, কিন্তু চোখ একেবারে শাদা। ওর ছোট্ট ঘরটিতে গিয়ে বসে' তামাক খেতাম, অন্ধ হবার আগে যত জিনিস ও দেখেছিল সব কিছুর গল্প করত। ওর আশা এখনো অটুট আছে, যেমন অটুট ওর স্বাস্থ্য। আমাকে দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বল্‌ত,—'এই দক্ষিণ, আর এই উত্তর। এই পথ ধরে' চল বরাবর, খানিকটা এগিয়ে ঐ দিকে বেঁকে যেও।' বল্‌তাম,—'ঠিক।' বুড়ো খুসী হয়ে হেসে বল্‌ত—'তাই? চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে কিছু ঠাহর হ'ত না,—একটু একটু করে' চোখে আলো আস্‌ছে।' এই বলে' নীচু হয়ে তেম্‌নি ওর ছোট্ট ঘরটিতে গিয়ে ঢুকত,—ছোট্ট ঘরটি ওর। আগুনের পাশে গিয়ে আস্তে বস্‌ত,—মনে সেই আশা, কয়েক বছর বাদেই ও একেবারে ভালো হয়ে যাবে, আকাশ ওর দিকে চেনা বন্ধুর মতো চেয়ে অভিবাদন জানাবে। ... এভা, আশা জিনিসটা সত্যিই কি মজার! ধর, এইখানে আমি বসে আছি, আর ভাবছি যাকে সত্যিই আজ রাস্তায় দেখি নি, তাকে যেন ভুলে যাই।"

"কি যে মাথামুণ্ড বলছ!"

"কাল আমি একেবারে বদ্‌লে যাব দেখ্‌বে। আজ আমাকে একা থাকতে দাও। কাল হতে তুমি আমাকে চিনবেই না,—কাল হাস্‌ব, তোমাকে চুমু খাব। শুধু আজকের এই রাতটা,—তারপর আমি একেবারে তোমার। আর কয়েকঘণ্টা মোটে বাকী। শুভরাত্রি এভা!"

"শুভরাত্রি।"

অতলস্পর্শী সমুদ্রের মত এই রাত্রি। চোখ বুজি।

একঘণ্টা বাদে আমার সমস্ত শিরা-উপশিরা যেন ছন্দে দুলে উঠে,—আমি যেন এই বিস্তৃত স্তব্ধতার সঙ্গে এক সুরে অনুরণিত হচ্ছি। ভাঙ্গা চাঁদের পানে তাকাই,—ওর প্রতি পরম অনুরাগ অনুভব করি, আমি যেন প্রথম প্রেমের ব্রীড়ায় সঙ্কুচিত হচ্ছি,—এমনি মনে হয়। "ঐ আবার চাঁদ।" ধীরে বলি,—"আমার সুধাংশু।" ওর দিকে চেয়ে চেয়ে হৃদয় আবেগে স্পন্দিত হয়। হঠাৎ পথচারী বাতাস আসে,—বলে উঠি,—কে? কেউ না। বাতাস আমাকে ডাকে, আমার প্রাণ শব্দ করে উঠে,—মনে হয় যেন সমস্ত অতীত পরিচয়ের সমস্ত বন্ধন কাটিয়ে কোন্ অদৃশ্য মহানিঃশব্দতার মধ্যে এসে পড়েছি,—আমার চোখ ভিজে উঠে,—কাঁপি,—ঈশ্বর আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছেন। আবার বিদেশী বাতাস বিদায় নেয়,—মনে হয় কে যেন বনের মধ্য দিয়ে নিঃশব্দে চলে যাচ্ছে ...

দারুণ শ্রান্তি বোধ হয়, ঘুমিয়ে পড়ি।

কী অতন্দ্র বেদনায় জলছিলাম!

যাক, কেটে গেছে।

পঁচিশ

শরৎ এসেছে। কি চঞ্চলপদেই গ্রীষ্ম বিদায় নিল! বেশ ঠাণ্ডা পড়ে এসেছে, বনে গান গাই, গুলি ছুঁড়ি, মাছ

ধরি। এক এক দিন ভয়ানক কুয়াসা ভাসে,—নিবিড় অন্ধকার। একদিন ত বনের মধ্যে পথ হারিয়ে ডাক্তারের বাড়ী এসে উঠলাম। ঢের লোক ছিল,—মেয়েদের আগে দেখেছি,—ছোকরারা নাচছে,—পাগলা ঘোড়ার মতো।

একটা গাড়ী এসে দোরের কাছে থাম্‌ল। গাড়ীতে এড্‌ভার্ডা। আমাকে দেখে একেবারে চম্‌কে উঠেছে,—আমাকে দেখে যেন বিরক্ত হয়েছে, আমার কথা বলবার সময় চোখ নামিয়ে নিল;—পরে অবশ্যি কথা কইলে, এমন কি সেধে দু' একটা প্রশ্নও করলে। ভারি ম্লান মুখখানা,—ওর মুখে কুয়াসা লেগে আছে। গাড়ী থেকে নাম্‌ল না।"

"আমি একটা খবর দিতে এসেছি।" ও বল্লে,—"গির্জ্জেয় গেছলাম, কাউকে পেলাম না সেখানে, তোমাদের এতক্ষণ ধরে খুঁজছি। কাল আমাদের ওখানে ছোট খাটো একটা পার্টি হবে,—আসছে সপ্তাহে ব্যারণ চলে যাচ্ছে,—আমার ওপর নিমন্ত্রণ করার ভার। নাচও হবে;—কাল, বিকেল।'

সবাই ওকে ধন্যবাদ জানালে।

আমাকে বল্লে ও,—"তুমি কিন্তু আবার গা ঢাকা দিয়ো না। শেষ মুহূর্ত্তে এক চিঠি পাঠিয়ো না যেন,—যেতে পারব না, ক্ষমা কর। ও সব চলবে না।'—এ কথাও আর কাউকে বললে না। খানিকবাদে গাড়ী হাঁকিয়ে চলে গেল।

এই অপ্রত্যাশিত দেখায় মন গোপনে কী প্রকাণ্ড আহ্লাদে ভরে গেছে। ডাক্তার ও ওর অতিথিদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ী চললাম। কী অপার করুণা ওর,—অনির্ব্বচনীয়। কি করে এর প্রতিদান দেব? আমার দুই হাত অসহায় লাগছে,—মধুর অবসাদে ভরে উঠেছে। ভাবি, এইখানে দাঁড়িয়ে আমি, আনন্দে আমার সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হয়ে এসেছে,—এই নিরুপায় আনন্দের প্রাবল্যে চোখে আমার অশ্রু দুল্‌ল। কি করব বলতে পার?

বাড়ী ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। একটা জেলের সঙ্গে দেখা,—শুধোলাম,—ডাকের জাহাজ কাল আস্‌বে?"

ডাকের জাহাজ আস্‌ছে হপ্তার আগে আসছে না।

আমার সব চেয়ে যেটা ভালো জামা সেটা বেছে নিয়ে পরিষ্কার করতে বসলাম,—একেবারে চকচকে করে তুলেছি। মাঝে মাঝে ছেঁদা হয়ে গেছে, সেলাই করতে বসলাম।

তারপর বিছানায় শুলাম একটু,—একটুখানি শুধু। হঠাৎ কি মনে হতেই একেবারে লাফিয়ে উঠে মেঝের ওপর এসে দাঁড়ালাম। ছল,—সমস্ত ছল! সেখানে যদি আমি গিয়ে না পড়তাম, তা হলে কখনো ও আমাকে নিমন্ত্রণ করত না। আর, ও ত' আমাকে স্পষ্ট করে' বলেইছে, যেন শেষমুহূর্ত্তে ওকে একটা চিঠি পাঠাই,—কোনো ছুতো করে যাওয়া বন্ধ রাখি ...

সারা রাত ঘুম হল না, ভোর বেলা বনে চলে এলাম,—শীতার্ত্ত, নিদ্রাহীন। আবার পার্টি! তাতে কি? আমি যাবও না, চিঠিও পাঠাব না। ম্যাক বেশ সমঝদার লোক,—ব্যারণের জন্যই এই পার্টি। কিন্তু আমি যাচ্ছি না, ঠিক জেনো।

চরাচরব্যাপী কুজ্ঝটিকা। মাঝে মাঝে বাতাস এসে ঘুমন্ত কুয়াসা দুলিয়ে দিয়ে যায়।

সন্ধ্যা, অন্ধকার হয়ে আস্‌ছে,—কুয়াসায় সব ডুবে গেছে,—কে পথ দেখাবে, রোদের একটি টুকরোও নেই কোথাও! তাড়াতাড়ি নেই, আস্তে আস্তে বাড়ী চলেছি। ভুল পথ ধরলাম বুঝি বনে,—অচেনা জায়গায় এসে পড়েছি। গাছের গায়ে ঠেস্‌ দিয়ে বন্দুকটাকে দাঁড় করিয়ে রেখে কম্পাস্‌টা দেখি। পথ ঠিক ঠাহর করে' পা চালাই।

কি একটা কাণ্ড হয়ে গেল—

কুয়াসার মধ্যে কি বাজনা শুন্‌তে পাচ্ছি,—আমি কোন্‌খানে? সিরিলাণ্ড-এ এসে পড়েছি। যে পথ এতক্ষণ এড়িয়ে চলছিলাম, আমার কম্পাস কি আমাকে সেই পথই দেখিয়ে দিল? কে চেনা গলায় আমাকে ডাকে,—ডাক্তার। বাড়ীর ভেতরে যেতে হয়।

হায়, আমার কম্পাসটা নষ্ট হয়ে গেছে!

—ক্রমশ

টমাস্ হার্ডি

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

ভিক্টোরিয়া-যুগের সর্ব্বশেষ সাহিত্যিক ইংলণ্ডের গৌরব টমাস্ হার্ডি পরিপূর্ণ ৮৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে জগতের কবি-লোকের সুর-সভায় একটী আসন শূন্য হইয়া রহিল; একটী কোমল করুণ সুর থামিয়া গেল।

হার্ডির সাহিত্যিক জীবনের প্রারম্ভে ইংলণ্ডের সাহিত্যের যে নব-অভ্যুদয় হইয়াছিল—তাঁহার মৃত্যু-লগ্নের সময় সে অভ্যুদয় পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া আর এক নূতন যুগের বার্ত্তা আনিয়া দিয়াছে। হার্ডি এই দুই অভ্যুদয়ের মধ্যে আসিয়াছিলেন—তাই মনে হয়, বর্ত্তমান সাহিত্য-জগতে হার্ডি সত্য সত্যই বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

তাঁহার সমস্ত লেখার পশ্চাতে জীবন ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষ একটা দর্শনবাদ আছে। হার্ডির সমস্ত সাহিত্যকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে—একটা স্থির ও ক্রূর দুঃখবাদ। বিখ্যাত জর্ম্মাণ দার্শনিক সোপেনহায়র-এর দুঃখবাদী-দর্শন হার্ডির প্রতিভাকে প্রভাবান্বিত করে। সোপেনহায়র বিশ্বাস করিতেন যে, মানুষের জীবনের পিছনে পরিচালক রূপে রহিয়াছে এক অমিত ইচ্ছাশক্তি। এই ইচ্ছাশক্তি ব্যক্তির সুখ ও দুঃখের সম্পর্কের অতীত এবং ইহা ক্রমান্বয় মানুষকে তাহার দুঃখময় অস্তিত্বের অবশ্যম্ভাবী শেষ-গৌরব মৃত্যুর দিকে তাহার ইচ্ছাকে অতিক্রম করিয়া অন্ধ পশুর মত লইয়া চলিয়াছে। এই অন্ধ-ইচ্ছাশক্তির নিষ্করুণ ইঙ্গিতে মানব অন্ধকার হইতে অন্ধকারে চলিয়া ফিরিতেছে। হার্ডির 'টেস্' এই নিষ্করুণ ইচ্ছাশক্তির দাস এবং নেপোলিয়ানের জীবন লইয়া হার্ডির প্রাচীন গ্রীক্ ধরণের সুবৃহৎ নাট্যকাব্য "The Dynast"-এর মূলেও রহিয়াছে এই দর্শনবাদ। সোপেনহায়রে দর্শনে আমরা পাই দুঃখের পুরুষ-মূর্ত্তি—জার্ম্মাণ প্রতিভার শক্তিতে প্রদীপ্ত; হার্ডির মধ্যে পাই আমরা দুঃখের নারী-মূর্ত্তি। হার্ডির করুণ চরিত্রগুলির মধ্যে একটা অপূর্ব্ব সুষমা আছে—তাই তাহাদের বেদনা আমাদের মনে এত আঘাত দেয়। কিন্তু হার্ডি এই দুঃখের রূপকে পরিপূর্ণ করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে, মনে হয়, অনেক সময় ঘটনার অবশ্যম্ভাবী ফলাফলের উপর নির্ভর করেন নাই। অনেক সময় মনে হয়, যেন জোর করিয়া চরিত্র ও ঘটনাগুলিকে করুণ করিবার চেষ্টা তাঁহার মধ্যে আছে। এবং সেইখানেই হার্ডির সহিত বর্ত্তমান যুগের য়ুরোপীয় সাহিত্যিকদের প্রভেদ।

[জন্ম—২রা জুন, ১৮৪০ ডোরসেটসায়ার। মৃত্যু ১১ই জানুয়ারী ১৯৩৮

প্রথম জীবনে তিনি স্থপতি-বিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন—পরে ত্রিশ বৎসরের সময় তাঁহার প্রথম নভেল প্রকাশ করেন। তাঁহার পুস্তকগুলির মধ্যে "Under the Greenwood Tree," "A Pair of Blue Eyes", Far from the madding Crowd", "The Return of the Native," "Tess of the D'urbervilles", "Jude the Obscure", "The Dynasts", "Wessex Tales" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।]

পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয়লিপ

অংশু—শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী, উয়িক্লি নোট্স্ অফিস হইতে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দাম বারো আনা।

এখানি গীতিকবিতার বই। কবিতাগুলি পূর্ব্বে ভারতী ও প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

বাংলা কাব্য-সাহিত্যে শ্রদ্ধাস্পদা লেখিকা সুপরিচিতা। তাই তাঁর বইখানি আগ্রহের সহিত পড়িলাম। কোনো কবিতাই অনর্থক টানিয়া বড় করিয়া লেখা নয়। কাজেই বইখানি পড়িতে ধৈর্য্যের অভাব হয় না। তবে মাঝে মাঝে ছাপার ভুল ও ছন্দপতনের দুই একটি নমুনা থাকায়

সহজ-পাঠের সামান্য বাধা হয় মাত্র।

বেশীর ভাগ কবিতাই প্রাণবান্। শান্ত শ্যামসুন্দরের ভাবময় রূপ প্রায় কবিতাতেই ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখা যায়। এই সৌকুমার্য্যের দিক দিয়া কবিতাগুলি সার্থক। কিন্তু কয়েকটি কবিতা আমাদের অত্যন্ত অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হইল। বাহিরের আবরণ রক্ষা করিতে গিয়া কয়েকটি কবিতার অন্তর্নিহিত রূপটি ভালো করিয়া বিকশিত হইয়া উঠে নাই। সেজন্য রসবোধের হানি হয় বলিয়া মনে হয়।

অভাব, বর্ষাসন্ধ্যা, মহাশ্বেতা, উৎকণ্ঠিতা, পলাতক প্রভৃতি কবিতাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হয়।

পুত্রের প্রতি উপদেশ—শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য; ৫, রামকান্ত মিস্ত্রী লেন হইতে শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত। দাম আট আনা।

লেখক তাঁহার পুত্রকে যে সকল বিষয়ে উপদেশ ও আচরণ দ্বারা শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেই সকল বিষয়ই লিপিবদ্ধ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে।

চ

পূজারিণী—শ্রীনির্ম্মলাদেবী রত্ন-প্রভা লিখিত; মূল্য একটাকা। এই সচিত্র উপন্যাসটির ছাপা ও বাঁধাই উক্ত সিরিজের উপযুক্ত। গল্পটিকে ফেনিয়ে বিশেষ বড় করা হয় নাই, এ বড় কম কৃতিত্বের কথা নয়। যাঁরা এ ধরণের বই পড়তে ভালবাসেন, তাঁদের কাছে এ বইয়ের আদর হবে একথা বললে বেশী বলা হবে না। এটি লেখিকার প্রথম বই। আশা করা যায় ভবিষ্যতে তিনি অধিকতর উপাদেয় পুস্তক পাঠক-সমাজে উপহার দিবেন।

সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষা—শ্রীহরিপদ গুহ প্রণীত; মূল্য দুই আনা। 'বিজলী'তে প্রকাশিত দুইটি আলোচনা এই পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রবন্ধ দুটি শ্রীযতীন্দ্র মোহন সিংহের আমিনাবিবির আত্মকথা নামক কোনো সাময়িক লেখাকে উপলক্ষ্য করে রচিত। সুতরাং এ লেখার সাময়িক মূল্য আছে। যাঁরা সাহিত্যে তথাকথিত 'নীতিবাদ' নিয়ে ক্ষেপে উঠেছেন তাঁদের অগ্রণী শ্রীযতীন্দ্র মোহন সিংহের নীতিজ্ঞানের পরিচয়টি লেখক চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন।

ভবিষ্যৎ—শিলচর হইতে প্রকাশিত শ্রীনগেন্দ্র চন্দ্র শ্যাম সম্পাদিত পাক্ষিক পত্রিকা, মূল্য প্রতি সংখ্যা দুই আনা। বার্ষিক ৩৵০। পত্রিকাখানির দ্বিতীয় বর্ষ চলিতেছে।

ভু

ডাকঘর

কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের পত্রিকায় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ রায়, বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্যভূষণ মহাশয় নবীনগর, ত্রিপুরা হইতে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন যে, উৎকৃষ্ট ছোট গল্পের জন্য তিনি পঁচিশ টাকা পুরস্কার দিবেন। পুরস্কার ঘোষণা করিয়া ভাল গল্প পাইবার যে কিরূপ সম্ভাবনা থাকিতে পারে তাহাও আমরা 'ডাকঘরে' আলোচনা করিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত সারদাবাবু একজন যথার্থ সাহিত্যানুরাগী এবং বিশেষ করিয়া কল্লোলের একজন পরমহিতাকাঙ্ক্ষী। গল্প রচনার উন্নতি হইবে মনে করিয়াই তিনি এই পুরস্কার ঘোষণা করেন।

আমরা এতাবৎ যতগুলি গল্প পাই, নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর মতে তাহার একটিও তেমন উৎকৃষ্ট নয়। তবে নির্ব্বাচকবর্গ দুইটি গল্প মনোনীত করিয়াছেন এবং তাঁহারা মনে করেন এই দুইটি গল্পই পুরস্কার পাওয়া উচিত। সেই জন্য এই সংখ্যায় প্রকাশিত 'মায়ে-পোয়ে' ও 'স্বীকার' এই দুইটি গল্প পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে। এবং মোট পুরস্কার ভাগ করিয়া ইঁহাদের দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য পুরস্কারের দিক দিয়া বিবেচনা করিলে লেখকগণের মর্য্যাদা রক্ষার পক্ষে ইহা যৎসামান্য। এই দুইটির রচয়িতা যথাক্রমে শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্তা অনিন্দিতা দেবী। ইঁহাদের আমরা

শ্রদ্ধা ও প্রীতি সম্ভাষণ জানাইতেছি।

সেদিন আমাদের কথা হইতেছিল বর্ত্তমান যুগের তরুণ লেখক ও লেখিকাদের একটি সংঘ স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। এ বিষয়ে আমরা পূর্ব্বেও কল্লোলে দুই একবার আলোচনা করিয়াছি। এই সংঘের কর্ত্তব্য হইবে সমস্ত লেখকের রচনার আলোচনা করা এবং রচনার যাহাতে সকল দিক দিয়া উন্নতি হয় এই সংঘ তাহার দিকেই বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। বিভিন্ন পত্রিকায় অনেক লেখা ছাপা হইতেছে বলিয়াই যে তাহা ভাল লেখা এমন কথা আমাদের মনে হয় না। বোধ হয় কাহারও মনে হওয়া উচিতও নয়। বিশেষ বিশেষ লেখকের একটা কোনও বিশেষত্ব থাকাই বাঞ্ছনীয়।

ইদানীং অনেক লেখক কোনও কোনও অল্পাধিক নামকরা লেখকের রচনা-পদ্ধতির অনুকরণ করিয়া থাকেন। অনুকরণ সর্ব্বদাই ক্ষতিজনক। প্রত্যেক লেখকের রচনা-পদ্ধতিতে যে বিশিষ্টতা থাকে তাহা অন্যের পক্ষে সহজে অনুকরণ করা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় বলিয়া অনুকরণগুলি ভালও হয় না; বরং লেখকের যে নিজের একটা বিশেষ পদ্ধতি থাকে তাহাও নষ্ট হইয়া যায়।

আমাদের অনেক লেখকই হয় ত নিজেরা জানেন না, তিনি কেন লিখিতেছেন, তাঁহার বলিবার কথা কি, এবং কি লিখিতেছেন। এই কারণে অধিকাংশ লেখার মধ্যেই কোনও বিশিষ্টতা থাকে না। পাঠকদের কাছে তাই প্রায় লেখাগুলিই একঘেয়ে মনে হয়। এ বিষয়ে লেখকবর্গ একটু অবহিত হইলে লেখার অনেক উন্নতি হইবার সম্ভাবনা থাকে।

অনেক লেখক অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে লেখেন এবং লেখা মাত্রই তাহা কাগজের আপিসে ছাপিতে পাঠাইয়া দেন। আমরা জানি, অনেকের পক্ষে লেখার একটা প্রবল ইচ্ছাই এরূপ করিবার মূল কারণ। কিন্তু এরূপ তাড়াতাড়ি লেখাতে যে লেখার কত ক্ষতি হয় তাহা হয় ত তাঁহারা সহজে বুঝিতে পারেন না। ঐ লেখাগুলিই যখন বারম্বার কাগজের আপিস হইতে অমনোনীত হইয়া লেখকের কাছে ফেরত যায় তখন লেখক স্বভাবতই একটু নিরুৎসাহ ও দুঃখীত হন। অনেকে এও মনে করেন যে, কোনও কাগজের বিশেষ মত বা রচনার ধারার সহিত তাঁহার লেখার হয় ত মিল হয় না বলিয়া তাঁহার লেখা সেই কাগজ হইতে ফেরত আসে! কিন্তু তাহা অনেকক্ষেত্রেই ভুল ধারণা। লেখা ভাল হইলে বোধ হয় সব কাগজই সেই লেখা ছাপিতে প্রস্তুত। খ্যাত বা অখ্যাত লেখক বলিয়া লেখার বিচার করা হয়, এই-রূপ ধারণা থাকাও ভুল। অন্তত আমরা প্রত্যেক লেখককে যথোচিত সম্মান দিয়া থাকি। যাঁহারা প্রথম হইতে কল্লোল পাঠ করিতেছেন তাঁহারা ইহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। তবু আমাদের দুর্ভাগ্যের সীমা নাই। লেখা ফেরত গেলে বা লেখা ছাপা না হইলে যে কেমন করিয়া লোক শত্রু হইয়া দাঁড়াইতে পারে তাহা পূর্ব্বে আমাদের ধারণার অতীত ছিল। বর্ত্তমান সময়েই কয়েকজন লোক যে প্রকাশ্যভাবে নানবিধ উপায়ে আমাদের ক্ষতি করিতে চেষ্টা করিতেছেন তাহার মধ্যেও লেখা না-ছাপান একটি প্রধান কারণ বলিয়া জানিতে পারিয়াছি। ঐরূপ কয়েক ব্যক্তির অমনোনীত রচনা এখনও আমাদের কাছে পড়িয়া আছে। লোকের বিভিন্ন প্রকৃতি, যাহারা এরূপ সামান্য কারণে নিজেদের নীচকার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে পারে তাহারা সংখ্যায় অল্প হইলেও লেখক-সাধারণের পক্ষে এবং আমাদের সকলের পক্ষেই অগৌরবের কথা। তবে সুখের বিষয়, আমাদের লেখকবর্গ সাধারণ শিষ্টাচার ও ভদ্রতাকে আজও উপেক্ষা করিতে শিখেন নাই।

বৎসর শেষ হইতে চলিল, সেই জন্যই লেখা সম্বন্ধে এই কথাগুলি বলিতেছি। আমরা আশা করি, নূতন বৎসর হইতে আরও ভাল ভাল লেখা আমরা পাইব এবং আজ যাঁহারা নূতন লেখক বলিয়া অবজ্ঞাত তাঁহারা অনেকেই সুলেখক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিবেন। একদিন কল্লোলে যাঁহারা প্রথম লিখিতে আরম্ভ করেন তাঁহাদের অনেকেই আজ নিজ যত্ন ও অধ্যবসায় গুণে

বাঙলার পাঠকবর্গের প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইহা কল্লোলের পক্ষে অসীম আনন্দের কথা।

নিন্দা মানুষ যতই করুক; নিজেকে সংশোধন ও পরিমার্জ্জিত করিবার যে স্বাভাবিক মনোবৃত্তি মানুষের থাকে সে সম্বন্ধে সচেতন থাকিলেই নিন্দুক বা নিন্দাকে গ্রাহ্য করিবার কোনও আবশ্যক থাকে না। সাধারণত দেখা যায়, যে যত বেশী অক্ষম সে তত বেশী অপরের নিন্দা করে। এবং যে কেহ একটা কাজ করিতে আরম্ভ করিলে নিন্দুক তাহারই নিন্দা করিতে আরম্ভ করে। সকলের কাজের মধ্যেই ত্রুটি থাকা সম্ভব এবং সে ত্রুটি কালক্রমে আপনা হইতেই সংশোধিত হইয়া গিয়া থাকে। ত্রুটি দেখাইয়া দিবার জন্য কখনও কখনও বন্ধুর দরকার হইলেও নিন্দুকের কখনই প্রয়োজন হয় না। এ পর্য্যন্ত কাহারও কোনও ত্রুটি নিন্দার দ্বারা একটুও সংশোধিত হইয়াছে—এরূপ শুনা যায় নাই। এই জন্য লেখকবর্গের পক্ষে কাহারও কোনও নিন্দায় উত্তেজিত হইয়া উঠিবার কারণ নাই; নিজ বুদ্ধি ও বিবেচনাদ্বারা লেখার উন্নতি কিসে হইতে পারে তাহার চেষ্টা করাই আবশ্যক। ইহাতে নিন্দুকের কোনও উপকার না হোক, দেশীয় ভাষা, সাহিত্য, সমাজ, রাষ্ট্র—সকলেরই উন্নতি ও উপকার হইবে।

বাঙলার নারী-সমাজকে শিক্ষায় ও সাহসে শক্তিমতী করিবার জন্য চেষ্টা চলিয়াছে। এই সূত্রে নানা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া নারীর জ্ঞান লাভের আয়োজনও হইয়াছে।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নাম আমরা করিতে চাই। শ্রীযুক্তা স্বর্ণময়ী দেবীর প্রতিষ্ঠিত বিধবা শিল্পাশ্রম, সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতি, দীপালি সংঘ, চিত্তরঞ্জন সেবাসদন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি অতি অল্পকাল মধ্যেই নারীমঙ্গল কার্য্যে তাঁহাদের কল্যাণ হস্তের পরিচয় দিয়াছেন। ইহা ভিন্ন আরও এমন অনেক অখ্যাত প্রতিষ্ঠান আছে যাহা বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও নারীর বিবিধ সেবাকার্য্যে রত রহিয়াছে। তাহাদের নাম হয় ত অনেকে জানেন না।

এই প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষ হইতে দুই একখানি সাময়িক পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতি হইতে 'বঙ্গলক্ষ্মী' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই অগ্রহায়ণ হইতে ইহার তৃতীয় বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। এই পত্রিকাখানি বিশেষ করিয়া নারীর অভাব ও উন্নতির বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়া থাকেন। ইহাই প্রয়োজন। বিশেষ বিশেষ কাগজের বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য ও আদর্শ লইয়া প্রচার হওয়া আবশ্যক। বর্ত্তমান বর্ষের দুই সংখ্যা আমরা পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি। বিষয়-নির্ব্বাচন ও প্রসঙ্গগুলি পূর্ব্বপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা উপাদেয় ও কার্য্যকরী হইয়াছে। যাঁহাদের উপর ইহার পরিচালনার ভার অর্পিত রহিয়াছে তাঁহাদের আমরা অন্তরের সম্বর্দ্ধনা জানাইতেছি। আশা করি নারীর কল্যাণে এই পত্রিকাখানি ইহার যথার্থ স্থান অধিকার করিয়া সার্থক হইবে।

কেবলমাত্র নারীদের জন্য আরও কয়েকখানি পত্রিকা আছে। তাহার সকলগুলি এখন আমাদের হাতের কাছে নাই। সেই জন্য ঐ পত্রিকাগুলি সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে কিছু বলিতে পারিলাম না। মফঃস্বলে যে সকল নারী-সমিতি আছে, তাহাদের অনেক সমিতি হইতেও মহিলাদের শিক্ষার জন্য কয়েকখানি হস্তলিখিত পত্রিকাও প্রকাশিত হইয়া থাকে।

অন্য প্রদেশ অপেক্ষা বাঙলাদেশের নারীসমাজ যে বহু বিষয়ে পশ্চাতে পড়িয়া আছেন বোধ হয় ইহা স্বীকার করিতে আজ কাহারও বাধা হইবে না। নিজেদের লজ্জা ঢাকা দিয়া চলিয়া এতকাল বাঙালীজাতি নারী ও পুরুষ-নির্ব্বিশেষে অজ্ঞতা ও অসম্পূর্ণতাকেই প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছে। এমনও দেখা গিয়াছে, নারী উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া জনোচিত নম্রতা ও মাধুর্য্যকে রক্ষা করিতে পারেন নাই! নারীর শিক্ষার বিরুদ্ধে আমাদের দেশের অনেকের অমতের ইহাও একটা কারণ। নারী বা পুরুষ কাহাকেও লোকে প্রগল্‌ভ বা অশিষ্ট দেখিতে ইচ্ছা করে না।

আমাদের সংস্কার ও আদর্শ অনুসারে বিশেষ করিয়া নারীর মধ্যে এই দোষগুলি দেখিতে পাইলে নারীর শিক্ষা সম্বন্ধে হতাশা আসিতে পারে। যাঁহারা শিক্ষা লাভ করিয়া উচ্চ আদর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন এবং নিজের জ্ঞানবত্তা সত্ত্বেও সাধারণ ভব্যতা ও শিষ্টাচার ভুলিয়া যান তাঁহারা জ্ঞানী হইলেও অপরাধী তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এরূপ মহিলার সংখ্যা হয়ত আমাদের দেশে খুব কম। তাহারই জন্য নারীকে শিক্ষালাভ হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখাও অপরাধ।

দুঃখের বিষয় সমগ্র বাঙলা দেশে মেয়েদের জন্য মোটে তিন চারিটি কলেজ আছে। উচ্চ বিদ্যালয় আছে আঠারটি। এমন অনেক জেলা আছে যেখানে মেয়েদের শিক্ষার জন্য কোনও উচ্চ বিদ্যালয় নাই। এই ত গেল উচ্চ শিক্ষার বন্দোবস্তের কথা। মধ্য-বিদ্যালয়ও সংখ্যায় এত অল্প যে, তাহাতে বঙ্গদেশের মেয়েদের এক ক্ষুদ্রাংশেরও শিক্ষালাভের পক্ষে নিতান্ত অসুবিধা।

ভদ্র এবং নিম্ন জাতির মধ্যে সকলেই এখন অল্পাধিক স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী। তাঁহাদের মেয়েদের সামান্য লেখাপড়া শিখাইবারও বন্দোবস্ত ভাল নাই। কলিকাতা শহরে যে কয়টি বিখ্যাত স্কুল আছে, তাহাতে মেয়েদের ভর্ত্তি করা এক দুর্দৈব। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ অভিভাবকের পক্ষে এই সব বিদ্যালয়গুলির ব্যবস্থা ও বিধিনিয়ম বুঝিয়া উঠা বা মানিয়া চলা কঠিন। কাজেই নেহাৎ কপালজোর না থাকিলে এ সকল বিদ্যালয়ে মেয়ে ভর্ত্তি করান প্রায় অসম্ভব ব্যাপারের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। খরচের কথা ছাড়িয়াই দেওয়া গেল।

কিন্তু মধ্যবিত্ত গৃহস্থের কন্যারা অন্তত সাধারণ বিদ্যালাভ করিতে পারে এরূপ বিদ্যালয়ও শহরে বা মফঃস্বলে অতি অল্প। খাদ্য, বিদ্যা, বস্ত্র, বাস সকল দিক্ দিয়াই মধ্যবিত্তের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। কিন্তু দেশের পনের আনা লোক এই মধ্যবিত্ত-বংশ। ছোটলোক বা দরিদ্র বলিয়া যাহাদের বলা হয় তাহারাও অবস্থায় ও ব্যবস্থায় এই মধ্যবিত্তদেরই ভাগ্য-ভাগী। কাজেই এই পনের আনা লোকের কন্যারা যদি শিক্ষালাভ করিবার উপযুক্ত আকর্ষণ, উৎসাহ বা বিদ্যালয় না পান তাহা হইলে আমাদের নারীজাতির শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে। জ্ঞানের অভাবে মানুষের যতপ্রকারের দুর্দ্দশা হইতে পারে তাহা আমাদের নারী বা পুরুষ সকলেরই আছে। জাতির পক্ষে নারী দীপ-বাহিকা। পুরুষ তাহার কর্ম্মে, ধর্ম্মে নারীর সাহায্যে অগ্রসর হয়। এই প্রীতি ও উচ্চ আদর্শের সম্বন্ধ একমাত্র ভারতবর্ষেরই নিজস্ব। আদর্শ হিসাবে এইরূপ মনোভাব থাকিলেও বিবিধ প্রকার অত্যাচার, উৎপীড়ন ও অভাবে এই আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হয় নাই। তবুও আজ বহুদিন পরে ঐ পবিত্র প্রদীপ-শিখাটির অভাব মনে পড়িয়া গিয়াছে। জাতি উঠিতে চায়, চলিতে চায় কিন্তু অন্ধকারে তাহার পথ দুর্গম হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ অবস্থায় নর-নারীর শিক্ষার দিকে দেশের লোকের নজর পড়িয়াছে। ইহা সুখের কথা। কিন্তু দুঃখের কথা এই জন্য যে, যে পনের আনা লোকের ভক্তিশ্রদ্ধার টানে জগন্নাথের প্রকাণ্ড রথ দুর্গম পথেও চলিয়া যায়, সেই পনের আনা লোক প্রসাদী ফলপুষ্প পায় কম। সমগ্র দেশকে যে পনের আনা লোক পৃথিবীর সমস্ত উদ্বেলতার মাঝ দিয়া আপন আদর্শ ও গৌরবের প্রতিষ্ঠায় পথ করিয়া লইয়া যায় সে পনের আনা লোকের নারী জ্ঞান-বঞ্চিতা, এবং বিশেষভাবে সেই কারণেই স্বাস্থ্য হীনা ও আনন্দবিহীনা। অন্যদিকে অর্দ্ধেকের বেশী পুরুষ অর্দ্ধ-শিক্ষিত।

জাতির এই মধ্যবিত্ত-বংশতিলকগণই জাতির জয়যাত্রার রথ চিরকাল টানিয়া আসিতেছে। এই সর্ব্বহারার দল অজ্ঞানতার অন্ধকারে পড়িয়া থাকিলে, দেশে যত আন্দোলনই হোক্ না কেন তাহা সফলতা লাভ করিতে পারে না। জ্ঞান লাভ দ্বারা যে সাধারণ বুদ্ধি ও বুঝিবার ক্ষমতাটুকু বাড়ে তা না পাইলে আপন দেশের প্রতি প্রীতি ও নিজের ব্যক্তিগত বা জাতিগত দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করিবারও ক্ষমতা থাকে না। এরূপ ক্ষেত্রে এই পনের আনা লোককে কেবলমাত্র আন্দোলন দ্বারা ক্ষণকালের জন্য উত্তেজিত বা প্রবুদ্ধ করিয়া যে কোনই লাভ হয় নাই তাহা

দেখা গিয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে এই পনের আনা লোকের সন্তানদের, বিশেষ করিয়া মেয়েদের, জ্ঞান লাভের উপযুক্ত ব্যবস্থা হওয়া সেইজন্য নিতান্ত আবশ্যক ও বাঞ্ছনীয়।

———

মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির যে কি দুরবস্থা তাহা যাঁহারা মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক নহেন তাঁহারা বুঝিবেন না। এমন অবস্থা আসিয়াছে, একমাত্র পুরুষের সামান্য উপার্জ্জনে আর একটি পরিবারের অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য বা বস্ত্রও যোগাড় হইয়া ওঠে না। এই অবস্থায় আবশ্যকবোধে হয় ত নারীকেও উপার্জ্জন করিয়া পরিবারকে সাহায্য করিতে হইতেছে। এরূপ পরিবারও আছে, শিক্ষিতা নারীর উপার্জ্জন দ্বারা সমগ্র পরিবার প্রতিপালিত হইতেছে। কিন্তু যে পরিবারে ঐরূপ সৌভাগ্য হয় নাই তাহাদের অবস্থা আরও শোচনীয়।

কেবলমাত্র উপার্জ্জনের জন্যই যে নারীর বিদ্যাশিক্ষা আবশ্যক তাহা না হইলেও জ্ঞানলাভ দ্বারা যে সকল মানসিক উন্নতিলাভ হয় তাহাতে পারিবারিক বা দেশগত অনেক দুরবস্থা বিদূরিত হইতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কারণে সমগ্র দেশব্যাপী নর-নারী নির্ব্বিশেষে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। দেশের বহু তরুণ ও মহিলারা এই মহৎকার্য্যে নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। কিন্তু এত বড় দেশের পক্ষে তাঁহাদের চেষ্টা অতিশয় অল্প বলিয়া বোধ হইতেছে। পরহিতে আত্মবলী দিয়া তরুণ ও তরুণীরা দেশকে চিরকালই ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। এখন দুই কার্য্যেরই প্রয়োজন। একদিকে ধ্বংস হইতে রক্ষা, অন্যদিকে স্বাস্থ্যে, জ্ঞানে দেশকে উন্নতির পথে লইয়া যাওয়া। এই জন্য সমস্ত তরুণের এ বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তার আবশ্যক। অবশ্য কেবল মাত্র দেশের বড়লোকদের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিলে কাজ করা একটু কঠিন। বাস্তবিক কিন্তু এই জন্য কাহারও মুখের দিকে চাহিবার প্রয়োজন হয় না। এ জন্য শুধু চাই অন্তরের প্রেরণা। কাজ করিতে অগ্রসর হইলে, শক্তি সহায় অর্থ সবই আপনি আসিয়া পড়ে। ইহা কল্পনার কথা নয়। বহুবিষয়ে প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে। কাজ করিতে করিতে নিরাশা বাধা বা অভাব যে আসে না তাহা নহে—কিন্তু যে কাজ করিতে চায় তাহার জন্য এগুলি অন্তরায় নয়। এগুলি শক্তির প্রতিপোষক মাত্র। শুধু গ্রামে বা শহরে নয়; প্রত্যেক পাড়ায় পাড়ায় এক বা একাধিক অন্তত ছোট ছোট প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করা একান্ত আবশ্যক। তরুণ নিজের কর্ম্মপথ নিজে বাছিয়া নিন্—নির্লিপ্ত নীরব কর্ম্মপথে তাঁহার নিজের অন্তরের অগ্নিশিখাই সকল আবর্জ্জনা ও বাধাকে অতিক্রম করিয়া লইয়া যাইবে।

পৃথিবীতে দুইরকম লোক আছে। এক রকম লোক কাজ করে, আর এক রকম লোক সে কাজের নিন্দা করে। যাহারা কাজ করে, তাহারা নিন্দাকে সহ্য করে।

———

দেশের হিন্দু বেশী শিক্ষিত কি মুসলমান কম শিক্ষিত এ কথা হিসাব করিয়া কোনও লাভ নাই। সমগ্র দেশকে চোখের সম্মুখে রাখিয়া চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যায়, হিন্দুও যে পরিমাণে শিক্ষিত মুসলমানও প্রায় সেইরূপ। অভাব দুইয়েরই সমান;—শিক্ষারও অর্থেরও স্বাস্থ্যেরও। সমগ্র দেশ অজ্ঞানতার পঙ্গু। সেইজন্য নিরাশার ক্রন্দনে গুমরিয়া মরিয়া লাভ নাই।

যথার্থ জ্ঞানলাভ হইলে মানুষকে আর ধর্ম্মের বাণী বা কর্ম্মের বাণী কিছুই শিখাইতে হইবে না। শিক্ষার সঙ্গে রুচির যে উৎকর্ষতা লাভ হয় তাহাই মানুষকে কর্ম্মে প্রেরণা দেয়, ধর্ম্ম আচরণে প্রবৃত্ত রাখে।

———

Published by Sj. Dineshranjan Das from 10-2, Patuatola Lane, and Printed by K. Lahiri, at the Britannia Printing Works, 1, Bibi Rozio Lane, Calcutta.

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

Mohan Press, Calcutta.

পঞ্চম বর্ষ
ফাল্গুন, ১৩৩৪

মানুষ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

বিশ্বের সন্তান আমি ! থাকি এই জগতের গেহে—
ধূপ্‌ছায়া খেলে যায় দেহে।
আমার শ্রবণে গুঞ্জে পূর্ণিমা ও অমার বাঁশরী,
অন্ধকারে কেঁদে, ফের সূর্য্যকরে সে কথা পাসরি !
জীবনকে ভালোবাসি ; ঠোঁটে তুলে রসাল পেয়ালা—
প্রাণশিশু করে কি দেয়ালা !

*

দুর্দ্দান্ত দস্যুর মত অস্ত্র হানি' প্রকৃতির বুকে,—
মর্ম্মভরা লুণ্ঠনের সুখে।
ইচ্ছা করে, যাই বেগে অম্বরের গ্রহে-উপগ্রহে
মূর্ত্ত যেন ধূমকেতু—কী উদগ্র প্রচণ্ড বিদ্রোহে !
উল্কা-মুখে দিয়ে চুমা ভস্ম করি অনন্ত নীলিমা—
খুঁজে দেখি কল্পনার সীমা !

কখনো শৈশবে ফিরে দেখে হাসি চাঁদের প্রদীপ,
কপালেতে পরি আলো-টিপ্ ।
খেলা করি আলাভোলা লালে-লাল ফুলবনে গিয়ে,
সাগরের তীরে বসি গড়ি ঘর বালু-রেণু দিয়ে,
মধুজার স্তন থেকে পিয়ে নিই স্নেহমধুধারা,
মা মা ব'লে হেসে হই সারা ।

*

কখনো সন্ন্যাসী হয়ে পশি গিয়ে নিবিড় কাননে,
বৈরাগ্যের কি অণুপ্রাণনে !
ব'সে থাকি স্থাণুবৎ বিস্মরিয়া সর্ব্ব-মানবতা,
প্রস্তর-বাঁধানো প্রাণে শুনিনাকো কর্ত্তব্য-বারতা ;
তিমির-মশাল জ্বেলে পড়ি সুধু শূন্যতা-পুস্তক—
জটা-কটা বিশুষ্ক মস্তক ।

*

বিভোল প্রেমীর মত রমণীর মুখপানে চাহি—
প্রেম-গীতা গাহি আর গাহি ।
তপ্ত-তাজা পদ্ম-ফোটা বুকখানি জড়াই দু-হাতে,
উপোসী নয়ন নামে রূপসীর হৃদয়-গুহাতে,
প্রাণপণে পান করি ওষ্ঠ-পাত্রে চুম্বন-মদিরা—
সখী-আঁখি আবেগে অধীরা !

*

কখনো হৃদয়ে জাগে ধরার আদিম উন্মাদনা—
পশুত্বের অতীত সাধনা !
দানব-জীবের সাথে ধেয়ে চলি উলঙ্গ, বিকট ;
সমাজ-শৃঙ্খলা ছিঁড়ি ;—নমিনাকো কাহারো নিকট ;
কঙ্কাল-করোটি ছুঁড়ে হত্যা-হর্ষে চঞ্চলি' ধমনী—
কামতালে কম্পিত রমণী !

নিরীহ গৃহীর মত পাতি আমি সোনার সংসার,
নেত্রে জাগে জগৎ রং-সার!
কোলে-পিঠে-বুকে মোর দোলে-খেলে ছেলে-মেয়ে-জায়া,
কখনো প্রভাতী লীলা, কখনো বা রজনীর ছায়া,
কখনো হাসির বন্যা, কখনো বা অশ্রুর বাদল—
বেজে চলে জীবন-মাদল।

*

কখনো কবির মত জেগে জেগে দেখি কি স্বপন,
চিত্তে করি নন্দন-বপন!
যৌবন-সৌরভে মেতে গাই সুধু অনন্তের গীত,
অশোক-পলাশ বনে দেখি সুধু বসন্তের প্রীত্,
আনন্দের শত ছন্দে তুলি খালি সৌন্দর্য্য-ঝঙ্কার—
কুসুমের ধনুকে টঙ্কার!

*

কখনো বেদান্ত পড়ি' ভেসে যাই দর্শনের স্রোতে,
চ'ড়ে বসি শাস্ত্র-জ্ঞান-পোতে।
বিশ্ব-বিকাশিনী-শক্তি মায়া মাঝে ব্রহ্মের শরণ,
পঞ্চকোষে আত্মা এসে জীবরূপে জনন-মরণ!
উপাধিবিভেদে আমি হই প্রাণী, ব্রহ্ম, ভগবান,—
মিথ্যা স্বপ্নে সৃষ্টি-অবসান!

*

ওগো, আমি এই-মত!—এক আমি মূর্ত্তি ধরি শত—
এ প্রপঞ্চে খেলা করি কত!
উঠিছে পড়িছে হো হো! কী বিপুল জীবন-সাগর,
চিত্ত-বেলাশয্যা 'পরে নৃত্য করে অনন্ত-জাগর!
অন্তরেতে সন্তরিছে একসাথে দেবতা-দানব—
বিষামৃতে বিচিত্র মানব!

হৃদয়ের এ রহস্য কে বুঝিবে,—কোন্ অন্তর্যামী,
আত্মার আঁধার-গর্ভে নামি ?
কেবলি পশুত্ব নহে, নহে নর মাত্র দেবশিশু,
বক্ষে তার বুদ্ধ-সাথে আছে মার, আছে নীরো, যীশু !
মনুষ্যত্ব মহাকাব্য যত পড়ি, হই আত্মহারা—
ওষ্ঠে হাসি, চক্ষে ঝরে ধারা !

রসকলি

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

পাল-পুকুর ঘাটের উপরেই বিশাল বট, আর তাহারই একটা শিকড় বিশাল অজগরের মত কুণ্ডলী পাকাইয়া গর্ত্তের ভিতর মুখ সেঁধাইয়া যেন পিঠে রোদ পোহাইতেছে। পুলিন দাস তাহার উপর হাঁটুভাঙা দ'য়ের মত উবু হইয়া বসিয়া জলে খোলামকুচি ছুঁড়িয়া 'ব্যাংছুড়ছুড়ি' খেলিতেছে। কাঁধে গামছা, কানে একটা পোড়া বিড়ি।

মিতে বলাই দাস আসিয়া ডাকিল,—এই যে পেলা, উঠে আয়, ওরে ও খেপাচণ্ডী, উঠে আয়। খুড়ো যে ...

পুলিন হাতের খোলামকুচিটা জলের পরিবর্ত্তে মাটীতে আছড়াইয়া কহিল,—টেঁসেছে বেটা বুড়ো ?

বলাই সোৎসাহে কহিল,—প্যার, আর দেরী নাই; উঠে আয়।

উভয়েই গ্রামের পথ ধরিল, বলাই আগে, পুলিন পিছনে।

পুলিন সহসা কহিল,—বৌটা খুব কাঁদছে, নয় রে বলা ?

বলা কহিল,—খু-উ-ব, আছাড় বিছেড় করছে।

মাথাটা তাহার প্রায় ঘাড়ের নিকটে হেলিয়া পড়িল, ঠোঁট দুইটা চিবুক পর্য্যন্ত বেঁকিয়া গেল।

আবার উভয়েই নীরব, রাস্তা ধরিয়া চলিয়াছে। একটা গাই রাস্তার ধারে পতিত জমিতে লম্বা দড়িতে বাঁধা, ঘাস খাইতেছিল। জানি না পুলিন কোন্ কৌতুকে চট্ করিয়া বাঁ হাতের দুইটা আঙ্গুলে গাইটার পিঠটা টিপিয়া ঘড়্ ড়-ঘোঁৎ শব্দে নাসিকা-গর্জ্জন করিতেই সে মাথা নাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল।

পুলিন সলক্ষে হ'ত ছুই সরিয়া আসিয়া কহিল,—মাইরী, কি ত্যাজ রে! আমার বৌটাও ঠিক এমনি, মাথা নেড়েই আছে।

পুলিনচন্দ্রের এক দেহশ্রী ভিন্ন আর কিছুই প্রশংসা করিবার মত ছিল না।

দেহখানি সুন্দর,—দীর্ঘ আকার, সবল দেহ, গৌরবর্ণ, কোঁকড়া চুল, আর সর্ব্বাঙ্গ বেড়িয়া এক মধুর লাবণ্য। এ ছাড়া আর কোন গুণই ছিল না। বুদ্ধির খ্যাতি ত কান কালেই ছিল না,—বাল্যকালেই পাঠশালায় গুরুমহাশয়, 'একপয়সায় তিনটে আম, তা তিনটে আমের কত দাম' ঝাড়া তিনটি ঘণ্টাতেও বুঝাইতে না পারিয়া নিজেই তাহার বই-দপ্তর গুছাইয়া বগলে পুরিয়া দিয়া কহিয়াছিলেন,—বাবা, শুভঙ্কর যে এ জন্মে বৈরাগী-কুলে জন্ম নিয়ে হিসেবে পর্য্যন্ত বৈরাগ্য করেছেন তা জানতাম না। তোমায় পড়ান আমার কর্ম্ম নয়।

ইহার উপর সে ছিল যেন মূর্ত্তিমান বে-তাল।

মজলিসে হয় ত লঙ্কাকাণ্ডের মত ভীষণ গম্ভীর আলোচনা চলিতেছে,—বুড়া জাম্বুবান হয় ত মন্ত্রণা দিতেছে, মজলিস শুদ্ধ লোক স্তম্ভিত, নিস্তব্ধ, সহসা সেখানে পুলিনচন্দ্র যেন কৌতুকের কাতুকুতুতে—গুল্ গুল্ করিয়া হাসিয়া উঠে,—হেঁ, হেঁ হেঁ, হেঁ এ মাইরী আমার খুড়োকে লিখেছে, তেমুণ্ডে বুড়ো, ইয়া চুল, ইয়া দাড়ী, ঠিক, ঠিক, জাম্বুবান, জাম্বুবান—হেঁ, হেঁ, হেঁ, হেঁ।

আবার হয় ত হনু-ভানুর মিতালীর রঙ্গে মজলিস ত মজলিস, দেবগণ পর্য্যন্ত হাসিয়া আকুল, সেখানে পুলিন বিস্ময়ে হতবাক্, চক্ষু ছুইটা ছানাবড়ার মত বিস্ফারিত, পাশের লোককে কহে,—কি মাইরী যে হাসিস তার ঠিক নাই। তারপর সোৎসাহে বাহবা দেয়—বলিহারী বাপ হনু, বাবুদের প্যায়দার চেয়েও তুমি জিন্দে পালোয়ান।

গ্রন্থকারও বাদ যান ন', পুলিন কহে,—বইটার কিন্তু ভারী চহট মাইরী, এ একবারে অবাক-জলপান লাগিয়ে দিয়েছে।

আবার রাবণ-বধে সীতা-উদ্ধারে আনন্দিত শ্রোতৃমণ্ডলী আবেগে জয়ধ্বনি করিয়া উঠে। বিচিত্র পুলিন, বিচিত্র তার রসবোধ, সে তখন কাঁদিয়া আকুল, কহে,—আহা হা, এতগুলো বেধবা হলো, আহা, হা!

আবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যগ্র অনুসন্ধানে কহে,—আচ্ছা, লঙ্কায় তাহ'লে মাছের সের কত করে হ'ল? একপয়সা, না ছুপয়সা? তা লেখে নইে?

লোকে তাই বুদ্ধিহীনের উপর রং চড়াইয়া কহে,—খ্যাপা।

পুলিন রাগে না, হাস্যমুখে উত্তর দেয়,—এঁ্যা।

রাগে একজন, আর লজ্জায় দুঃখে মরিয়া যায় একজন। ছুজনের প্রথমটি পুলিনের স্ত্রী, বয়স আঠার-উনিশ, গোলগাল আঁট সাঁট দেহ, নাম গোপিনী।

কিন্তু পুলিন কহে,—সাপিনী! পুলিনের নির্ব্বুদ্ধিতার লজ্জায়, খোঁচায় গোপিনী রাগে সাপিনীর মতই গর্জ্জায়, কথাগুলিও বাহির হয় সাপিনীর জিহ্বার মতই, লকলকে তীক্ষ্ণ,—ভয়াবহ। নির্ব্বোধ, সর্ব্বজনের হাস্যাস্পদ স্বামীর ঘরে শত দুঃখ, শত লজ্জার মধ্যেও সান্ত্বনার একটি আশ্রয় গোপিনীর মিলিয়াছিল, সে ওই দ্বিতীয় ব্যক্তিটি, যে পুলিনের জন্য লজ্জায় দুঃখে মরমে মরিয়া থাকিত; সে পুলিনের বৃদ্ধ খুড়ো রামদাস মোহান্ত, যাহার সহিত পুলিন জাম্বুবানের সাদৃশ্য দেখিতে পাইত।

রামদাসের অবস্থা বেশ ভালই,—মোটা জোতজমা, উঠানে বড় বড় মরাই, ঘরে দুগ্ধবতী গাভী গ্রামে ছু দশ টাকার তেজারতি ...। তবে তাহার চেহারাটা আজ শুধু চুল দাড়ীর জন্যই নয়, চিরকালই কেমন বেয়াড়া বিশ্রী, তাই যৌবনে যখন সে শ্রীমতীকে লইয়া পরম আগ্রহে সংসার পাতিয়াছিল তখন শ্রীমতী রামদাসের ওই বদ চেহারার জন্যই নাকি তাহার পাতান সংসারে লাথি মারিয়া কোথায় একদিন উধাও হইয়া গিয়াছিল।

গৃহী-বৈরাগীর বংশধর রামদাস শ্রীমতীর সন্ধানে হরেক রকম তালি দেওয়া আলখাল্লা পরিয়া ঝোলা কাঁধে ভবঘুরে ভিখারী বৈরাগী সাজিল, শোকে সংসারকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল, কিন্তু সংসার তাহাকে ছাড়িল না।

শ্রীমতীর সন্ধান মিলিল না, কিন্তু তাহার ভিক্ষার ঝুলির মধ্যে কোন্‌দিন 'শ্রী' আসিয়া প্রবেশ করিয়া তাহাকে সংসারের দিকে ফিরাইল, তখন ভিক্ষার সঞ্চয়ই তাহার তিনশো টাকা পুঁজি, আর বাড়ীর জোতজমার ধান ঠিকাদার-ভাগদারের কাছে বেশ মোটা হইয়াই জমিয়াছিল। শ্রীমতীর অভাবে রামদাস 'শ্রী'কে লইয়া বেশ আঁটালো করিয়া সংসার বাঁধিল।

পাঁচজনে কহিল,—মোহান্ত, এইবার ভাল করে সংসার পাত, একটি ভাল দেখে বোষ্টমী—

রামদাস কহিল,—রাধে রাধে, ওকথা ছাড়ান দাও দাদা। রাধারাণী আমার মনেই ভাল, ধ্যানেই সোজা, বাইরে বেজায় ব্যাঁকা। বাঁকারায়ের লাঞ্ছনাটাই দেখ না। জয় রাধে, শ্রীমতী, শ্রীমতী!

কে একজন স্ত্রী-জাতির কি একটা নিন্দা করিল, মোহান্ত মাথা নাড়িয়া, জিভ কাটিয়া সবিনয়ে প্রতিবাদ করিল,—রাধে রাধে, ওকথা বল না, বলতে নাই। শ্রীমতীর জাত ওরা সবাই ভাল।

একজন ঠোঁটকাটা কঠোর রসিকতা করিয়া ফেলিল,—তা তোমার শ্রীমতী...

মোহান্ত হাসিয়া কহিল,—বল্লাম যে দাদা, শ্রীমতীর জাত ওরা, সুন্দর নিয়েই যে কারবার ওদের। অসুন্দরকে কে কবে পছন্দ করে দাদা!

এই সময় রামদাসের বড় ভাই শ্যামদাস বছর আষ্টেকের ফুটফুটে মাতৃহীন পুলিনকে রাখিয়া মারা পড়িল। রামদাস পুলিনকে বুকে করিয়া 'না বিইয়াই শ্যামের মা' হইয়া উঠিল।

সুন্দর পুলিন বড় হইল, বৈষ্ণবের ছেলে, কীর্ত্তনের আখড়ার খোল করতাল ছাড়িয়া লাঠির আখড়ায় লাঠি ধরিতে শিখিল। বলা সঙ্গী হইল, গাঁজা ধরিল। রামদাস শাসন করিতে পারিল না, শুধু দুঃখই করিল, তবু মনে মনে নিজেই সান্ত্বনা খুঁজিয়া লইল,—বেশ একটি গোছালো বৌ আসিলেই পুলিন মানুষ হইবে, বোকা বুদ্ধিমান হইবে, ঘর বুঝিবে, না বুঝে ঘর ঘাড়ে চাপিয়া পরিচয় করিয়া লইবে।

রামদাস পুলিনের জন্যে পাত্রী খুঁজিতে লাগিল।

সৌরভী বৈষ্ণবী আসিয়া কহিল,—মোহান্ত, তা আমার মঞ্জরীর সঙ্গে পুলিনের বিয়ে দাও না কেন! ছেলেবেলার সাথী দুটি, ভাবও খুব ...

রামদাস কহিল,—রাধে, রাধে, তা যে হয় না সৌরভী, আমরা হ'লাম জাত-বোষ্টোম, আর তোমরা ভেক্‌ধারী।

সৌরভী ছিল ধোপার মেয়ে, ভেক্‌ লইয়া বৈষ্ণব হইয়াছে। তাহার মেয়ের সঙ্গে ভাইপোর বিবাহ দিতে রামদাসের রুচি হইল না। না হইলে, সৌরভীর মেয়ে মঞ্জরী বেশ সুশ্রী,—বেশ নজরে ধরা মেয়ে, তবে একটু রসোচ্ছলা,—যাকে বলে 'ডগমগ' ভাব। চলনে দেহে হিল্লোল খেলিয়া যায়, বলনে হাসি উপচিয়া পড়ে, হাসিতে নিটোল গালে টোলটি পড়ে, গ্রীবাটি ঈষৎ বাঁকাইয়া দাঁড়ায়, নাকে রসকলিটি কাটে, চূড়া বাঁধিয়া চুলটি বাঁধে, কথার ধরণটাও কেমন বাঁকা। লোকে কত কি বলে, কিন্তু তাহাতে তাহার কিছু আসে যায় না। নদীর বুকে লোহার চিরেও দাগ আঁকে না, স্রোতও বন্ধ হয় না।

মঞ্জরী পুলিনের চেয়ে বছর চারেকের ছোট,—বাল্য সাথী, দু জনের ভাবও খুব। পুলিন সময়ে অসময়ে মঞ্জরীদের বাড়ী যায়, মঞ্জরী আগ-বাড়াইয়া লয়, মুখে দীপ্তি ফুটে, রসোচ্ছলা আরও উচ্ছল হইয়া উঠে।

পুলিন কহে,—কি হে রসকলি, করছ কি?

দুজনে রসকলি পাতাইয়াছে।

মঞ্জরী মুচকি হাসিয়া সুরে কহে,—

তোমায় আঁকছি হে অঙ্গে যতন করে।"

পুলিন বুঝি মরিয়া যায়।

অভাব অভিযোগে কতদিন মঞ্জরীর মা সৌরভী আসিয়া কহে,—দেখ্‌লো মঞ্জরী, দুটো টাকা কারু কাছে পাওয়া যায় কি না? নইলে তোর খাড়ুটা বাঁধা দিতে হবে।

মঞ্জরী কহে,—খাড়ু আমি বাঁধা দোব না, রসকলি। তুমি টাকা এনে দাও।

পুলিন শশব্যস্তে কহে,—সে কি রসকলির মা, খাড়ু বাঁধা দেবে কি? আমি টাকা এনে দি।

সৌরভী আপত্তি করিলে মঞ্জরী কহে,—কেন, রসকলি কি আমার পর?

খুড়োর তহবিল সন্ধান করিয়া না পাইলে চাউল বিক্রয় করিয়া টাকা আনিয়া দেয়।

আবার মঞ্জরী কখনও কখনও পুলিনের হাত চাপিয়া ধরিয়া কহে,—না, তুমি দিতে পাবে না, ও মায়ের চালাকী।

মায়ে-ঝিয়ে ঝগড়া হয়, পুলিন ব্যস্ত হইয়া উঠে, কিন্তু মঞ্জরী কহে,—খবরদার, আড়ি করব!

দশবছর বয়সেই মঞ্জরীর একবার বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু মঞ্জরীর তাহাকে পছন্দ হয় না, তাই তাহাকে নাকচ করিয়া দিয়াছে। সে বেচারী বহুবার মঞ্জরীর জন্য হাঁটাহাঁটি করিয়া শেষ অন্য বিবাহ করিয়া সংসার পাতাইয়াছে। মঞ্জরীকে ছাড়পত্র করিয়াছে।

নানা কারণে রামদাস সৌরভীকে প্রত্যাখ্যান করিল।

রামদাস সৌরভীকে ফিরাইয়া দিল; সৌরভীও ঘরে গিয়া পুলিনকে ফিরাইয়া দিল, কহিল,—বাবা, মেয়ের আমার সোমোত্ত বয়েস, তুমি আর এসো না। একেই তো পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে। মনে ভেবেছিলাম, তোমরা দুটি ছেলে বয়সের সাথী, দু হাত এক ক'রে দিয়ে দেখে চোক জুড়োব, তা তোমার কাকা তা দেবে না। আমাকে ত আমার মেয়ের বিয়ে দিতে হবে।

কথাটা পুলিনের বড় বাজিল, সে দুদিন খাইল না, শুইল না, মাঠে মাটে ঘুরিয়া বেড়াইল।

রামদাস শেষ রাজী হইল,---বেশ মঞ্জরীর সঙ্গেই পুলিনের বিয়ে হোক।

সময়টা হোলীর, রামদাস শ্রীধাম বৃন্দাবন যাইবে, তাই স্থির হইল যে রামদাস ফিরিলে বিবাহ হইবে।

* * *

শ্রীধামে সহসা একদিন রামদাসের সঙ্গে হারানো শ্রীমতীর দেখা হইয়া গেল! শ্রীমতী তখন গাছতলায় কাল-কলেরায় ছটফট করিতেছে, পাশে বারো তেরো বছরের মেয়ে গোপিনী মায়ের সেবা করিতেছে।

স্ত্রীলোকটীর কাতরানীতে আর বালিকার কাতর সাহায্য প্রার্থনায় রামদাস সাহায্যে অগ্রসর হইয়া রোগিণীর পাশে বসিল, ক্ষণেক তাহার মুখপানে চাহিয়া সাগ্রহে ডাকিল—

শ্রীমতী!

রোগযন্ত্রণায় কাতর শ্রীমতী রামদাসের মুখ পানে চাহিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, রামদাস উত্তরীয়-প্রান্ত দিয়া চোখ মুছাইয়া দিল। শ্রীমতী তাহার পা দুইটা চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—আমার যাবার সময়, পায়ের ধুলো দাও। আর এই মেয়েটিকে নাও। বড় ভালো মেয়ে, মায়ের মত নয়। পার তো পুলিনের সঙ্গে বিয়ে দিয়ো। ভয় নেই, অজাতের মেয়ে নয়। সেই যে বাউল প্রেমদাসকে মনে পড়ে, সেও জাত-বোষ্টোম, তারই মেয়ে।

রামদাস কাতর কণ্ঠে কহিল,—শ্রীমতি, রাধারাণী, আমি যে তোমার তরে আজও শূন্য ঘর বেঁধে বসে আছি।

শ্রীমতী কহিল,—সবই জানি মোহান্ত, তাই ত দেশে পর্য্যন্ত থাকতে পারি নি, লজ্জায় দেশ ছেড়ে ছুটে জেলা পার হয়ে বাসা বেঁধে জীবন ভোর কেঁদে সারা হয়েছি। তারপর গোপিনীকে কহিল,—মা, এই তোর বাপ, এঁর সঙ্গে যা, আমার চেয়েও আদরে রাখবে। আর একটা কথা গোপিনী, কখনও যেন স্বামী ছাড়িস নি, হই বোষ্টোম, থাকুক নিয়ম, তবু ওতে সুখ নেই।

* * *

শ্রীমতীকে বৃন্দাবনে বিসর্জ্জন দিয়া গোপিনীকে লইয়া রামদাস বাড়ী ফিরিল।

সৌরভীকে ডাকিয়া—পঞ্চাশ, একশো শেষ দুশোটি টাকা হাতে হাতে দিয়া কহিল,—সৌরভী, আমায় বাকি্য থেকে খালাস দাও।

একমুঠা টাকা খুঁটে বাঁধিয়া সৌরভী হাসি মুখেই বাড়ী ফিরিল।

সৌরভী মঞ্জরীর জন্য পাত্র ঠিক করিল, কিন্তু মঞ্জরী কহিল,—না।

মা মানে না, পাত্র ঠিক করিল, কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বেই হঠাৎ সৌরভী একদিন বুকে কি হইল বলিয়া শুইল, আর

উঠিল না। মায়ের মৃত্যুতে মঞ্জরী দুদিন কাঁদিল তারপর আবার উঠিল, ক্রমে হাসিল, রসকলি কাটিল, কিন্তু বিবাহ করিল না।

এদিকে পুলিনের সঙ্গে গোপিনীর বিবাহ হইয়া গেল। পুলিন যেন মঞ্জরীর নেশা ভুলিল, দিন রাত্রি ঘরেই থাকে, বাড়ীর বাহির হয় না, রামদাস সুখে হাসিল। মঞ্জরী দুই চারি দিন পুলিনের অপেক্ষা করিয়া শেষে একদিন চূড়া করিয়া চুল বাঁধিয়া নাকে রসকলি কাটিয়া, পান চিবাইতে চিবাইতে রামদাসের বাড়ীতে আসিয়া উঠিল। রামদাস বাড়ীতে ছিল না, উঠানে দাঁড়াইয়া মঞ্জরী মুচকি হাসিয়া ঘরের রুদ্ধ দ্বারকে উদ্দেশ করিয়াই হাঁকিল,—কই হে রসকলি, বৌ দেখাও হে।

পুলিন ঘরের ভিতর গোপিনীর সহিত কথা কহিতেছিল, মঞ্জরীর আওয়াজ পাইয়া কে যেন কেন ছুটিয়া পলাইয়া গেল। গোপিনী নতমুখে ঘরের মধ্যেই দাঁড়াইয়া রহিল, মঞ্জরী ঘরে ঢুকিয়া গোপিনীর ঘোমটা তুলিয়া দেখিয়া ঠোঁটের আগায় 'পিচ' কাটিয়া কহিল,—তুমি বৌ?

গোপিনী মুখ তুলিয়া চাহিল।

মঞ্জরী আবার কহিল,—তা হ্যাঁ বৌ, রসকলির তোমাকে পছন্দ হয়েছে?

গোপিনী এবার কথা কহিল, যেন চিমটি কাটিয়া কহিল,—না।

মঞ্জরী কহিল,—বাঃ—এই যে পাখী পড়ে বেশ! তা হ্যাঁ বৌ, কেন পছন্দ হয় নি—কিছু জেনেছ?

গোপিনী সেই চিমটি কাটার মতই কহিল,—রসকলি কাটতে জানি না কি না তাই।

মঞ্জরী সব বুঝিল, এবার সে হাসিয়া বিস্ময়ের ভঙ্গীতে গালে হাত দিয়া কহিল,—ওমা তাই না কি? তা আমার কাছে রসকলি কাটা শিখ্‌বে বৌ?

গোপিনী কহিল,—শেখাবে?—দেখো, ঠিক তোমার মতনটি হওয়া চাই।

মঞ্জরী কহিল,—তাই শেখাব, কিন্তু ধৈরয ধরে থাকা চাই। পারবে তো?

গোপিনী কহিল,—পারবো, কিন্তু তোমার সময় হবে তো? বলি আসবে কখন? রসময়রা ছাড়বে তো?

মঞ্জরী এবার ঠেকার দিয়া কহিল,—আমার রসময়রা নয় অসময়ে আসিয়া সময় দেবে। তোমার রসময় যে এক দণ্ড ছাড়ে না দেখি!

গোপিনী কহিল,—ও দুদিন, এখন নোতুন নোতুন নালতের শাক হে। তারপর বুড়ো গরু ঠিক দামে গিয়ে পড়বে, ভয় নাই।

মঞ্জরী একটু হুঙ্কার দিয়া কহিল,—তা ভাই, বুড়ো গরু বেঁধে রাখলেই হয়, যার দড়ি নাই, তার আবার গরু পোষার সখ কেন?

গোপিনীও এবার একটু ঝঙ্কার দিয়া কহিল,—ঘোড়া হলে কি চাবুকের অভাব হয় হে,—তা হয় না। যখন গরু পুষেছি তখন দড়ি কি না জুটবে?—বলি পরণের কাপড়ে আঁচল তো আছে,—তাতেই বাঁধব।

মঞ্জরী হাসিয়া কহিল,—যদি ছিঁড়ে পালিয়ে যায়?

গোপিনী সদম্ভে কহিল,—ইস্, সাধ্যি কি!

মঞ্জরী কহিল,—দেখো—

গোপিনী সেই দম্ভভরেই কহিল,—তখন না হয় ছেঁড়া আঁচল গলায় দিয়ে ঝুলব হে। তা বলে জ্যান্তে তো আর ভাগাড়ে দিতে পারি না!

ইহার পর মঞ্জরী আর কথা কহিল না, আচমকাই যেন বাড়ী ফিরিল, তখন মুখখানায় হাসি ছিল না, যেন থম্‌থমে, জলভরা মেঘ।

পরদিন হইতে রসকলির বাড়ীতে পুলিনের আদর যেন বাড়িয়া গেল। লোক পাঠাইয়া পুলিনকে আনাইল, তাহার লজ্জা ভাঙিয়া দিল। এখন আর পুলিনের গাঁজার আড্ডায় মঞ্জরী ঝঙ্কার দেয় না, সঙ্গী বন্ধুকে দেখিয়া বিরক্ত হয় না, এখন কথায় কথায় মঞ্জরী যেন ঢলিয়া পড়ে, পান দেয়; পুলিন আবার বাড়ী ছাড়িল—পূর্ব্বের চেয়ে যেন বেশী শক্ত করিয়া মঞ্জরীর বাড়ীতে আড্ডা গাড়িল।

মঞ্জরী মাঝে মাঝে আবার এও বলে,—রসকলি, এ তো ভালো কাজ হচ্ছে না।

পুলিন হোঁৎকার মত কহে,—কি ?

মঞ্জরী মুচকি হাসিয়া কহে,—এই আমার বাড়ীতে এমন ক'রে চব্বিশ ঘণ্টা পড়ে থাকা ...

পুলিন তেমনি ভাবেই কহে,—কেন ?

মঞ্জরী সুর করিয়া গান ধরে—

"পাঁচসিকের বোষ্টমি তোমার
ওহে গোসা করেছে, গোসা করেছে।"

পুলিন কহে,—ধ্যেৎ।

গোপিনী সত্য সত্যই রাগ করিল, কিন্তু ভাঙায় কে ? যাহার উপর মান, সে-ই যে মানের মুখে ছাই দিয়া দিল। সে খাবার সময় আসে ছুটো খায়, দেশের দশের হাস্যাস্পদ হইয়া ফেরে, মঞ্জরীর বাড়ী আড্ডা জমায়, ঘরের পয়সা পর্য্যন্ত মঞ্জরীর ঘরে তুলিয়া দিয়া আসে, মঞ্জরীর না কি সোনার নথ হইতেছে, গোপিনী জ্বলিয়া মরে। পুলিন যা ছুচারিটা কথা গোপিনীর সহিত কয় তা পর্য্যন্ত মঞ্জরী বিশোভিত, সে দিন রাত্রে কথায় কথায় নির্ব্বোধ কহিল,—রসকলি তোমার কি নাম দিয়েছে জান গা ?—গোপিনী নয় সাপিনী। তা সত্যি, সবেতেই তোমার ফোঁস।

গোপিনী একটা জ্বলন্ত অগ্নিবর্ষী কটাক্ষ হানিয়া ছুটিয়া পলাইল। রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত বাহিরে কাঁদিতে কাঁদিতে মনে পড়িল সে বলিয়াছিল,—যদি আঁচল ছেঁড়ে তবে ছেঁড়া আঁচল গলায় দিয়া ঝুলিবে। উদ্ভ্রান্ত ব্যথাহত নারী সত্যই আঁচল ছিঁড়িয়া দড়ি পাকাইতে বসিল। ঘরে পুলিন তখন অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে, বুঝি বা রসকলিকে স্বপ্ন দেখিতেছিল।

পাশের ঘরের দরজা খুলিয়া বৃদ্ধ মোহান্ত বাহির হইল, শ্বেতবস্ত্রা গোপিনীকে দেখিয়া চমকিয়া কহিল,—কে ? কে ? এ কি, মা ? বাইরে কেন মা আমার ?

গোপিনী ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল, বৃদ্ধের স্নেহের পরশে হাতের পাকানো আঁচল এলাইয়া পড়িল।

মোহান্ত গোপিনীকে বুকে লইয়া কাঁদিয়া কহিল,—মা, বুড়ো ছেলের মুখের দিকে চেয়ে ধৈর্য্য ধর মা আমার, আমি আশীর্ব্বাদ করছি ভালো হবে, ভালো হবে তোর।

পুলিনের ব্যবহারে শান্ত, স্নেহ-দুর্ব্বল বৃদ্ধ মরমে মরিয়া গেল। কঠোর হইতে চেষ্টা করিল, পয়সায় টান দিল, কথা বন্ধ করিল, কিন্তু যে পুলিন সেই পুলিনই রহিয়া গেল। অন্ধের কি বা রাত্রি কি বা দিন।

শুধু রসকলির বাড়ীতে বলার সহিত খুড়ার আয়ুর দিন গণনা করিতে লাগিল।

* * *

রামদাস কিন্তু বাঁচিতে চাহিয়াছিল, মরমে মরিয়াও গোপিনীর জন্য বাঁচিতে চাহিল, সর্ব্বদা তাহার ভাবনা হইত সে মরিলে গোপিনীর দশা কি হইবে ?

কিন্তু মানুষ অমর নয়, মরণের পরোয়ানা সঙ্গে লইয়াই জন্ম লওয়া। সহসা একদিন রামদাসের তলব আসিল। মোহান্তের বয়স হইয়াছিল, হাঁপানি ছিল, হঠাৎ একদিন হাঁপানি মৃত্যুর মূর্ত্তিতে বুকে চাপিয়া বসিল।

গোপিনী চোখের জলে বুক ভাসাইয়া সেবা করিতে বসিল। পাড়াপড়শী আসিয়া জমিল, মোহান্ত যেন কার অনুসন্ধান করিতেছিল, কিন্তু সে তখন পাল-পুকুরের ঘাটে বসিয়া 'ব্যাং-চুড়্‌চুড়ি' খেলিতেছিল।

পাড়াপড়শী ভিড় জমাইয়া বসিয়া আছে, কেহ বলে,—'মোহান্ত, হরিবল, বল জয় রাধারাণী !'

রাধারাণীর জয়গানে চিরমুখরকণ্ঠ চারণ কিন্তু আজ এ সময়ে রাধারাণীর ধ্যান করিতে পারিল না, মৃগমায়াচ্ছন্ন রাজা ভরতের মত শুধু কহে,—মা গোপিনী, কিছু করতে পারলাম না মা!

গোপিনী শেষ আছাড় খাইয়া পড়িল। হায়, তাহার নীড় যে ভাঙিয়া যায়! ভ্রষ্টনীড় বিহঙ্গিনীর ক্রন্দন ছাড়া আর উপায় কি ? পাড়ার মেয়েরা দূরে দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু কেহ এই বেপুণা নারীটিকে ধরিতে সাহস করিল না। বুড়া রোগী, কখন শেষ নিঃশ্বাস পড়িবে, খাবি খাইয়া মরিবার নোটীশও হয় ত দিবে না ; মড়া ছুঁইয়া কে অশুচি হয়।

ধরিল শেষ একজন। সে ধরিবে না কেন, তাহার ত

অশুচি হইবার ভয় নাই, লোকে বলে চির-অশুচি সে,—সে মঞ্জরী।

মঞ্জরী আসিয়াই বেপথু গোপিনীকে ধরিল। কহিল,—ভয় কি?

মানুষের সান্ত্বনা পাইবার ভঙ্গী বিচিত্র, গোপিনীর সকল ভয়ের আকর, সকল দুঃখের মূল মঞ্জরী সান্ত্বনা দিল—ভয় কি! আর তাহাতেই গোপিনী যেন বল পাইল।

মুমূর্ষু মোহান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া টানিয়া টানিয়া কহিল,—গ্রামের পাঁচজন আছেন আমার শেষ ইচ্ছা বলে যাই।—আমার স্থাবর সমস্ত সম্পত্তির মালিক হল গোপিনী। আর সকলের কাছে এই ভিক্ষে, ছেলেটাকে যেন ঐ বেশ্যের হাত হ'তে বাঁচিয়ো।

কথাটায় সকলের চক্ষু গিয়া পড়িল ওই অশুচি মেয়েটির উপর। সকলেই ভাবিতেছিল,—সে কি করিয়া বসে, সে কি করিয়া বসে। কিন্তু মঞ্জরী গোপিনীর এলানো দেহখানি পরম সান্ত্বনাভরে জড়াইয়া বসিয়াছিল, বসিয়াই রহিল, চাঞ্চল্য দেখা গেল না।

মোহান্ত যখন কথাটা আরম্ভ করে তখনই বলার সঙ্গে পুলিন আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, সেও কথাটা শুনিল।

কথাটা আজ তাহাকে প্রথম আঘাত দিল, মান অপমানের স্বাদ আজ সে বুঝি প্রথম বুঝিল।

লোকে তখন মোহান্তের শেষ ইচ্ছার সমালোচনায় ব্যস্ত। পুলিন দাওয়া হইতে নামিয়া পড়িল, কেহ লক্ষ্য করিল না, কিন্তু মঞ্জরী ডাকিল,—যাও কোথা?

পুলিন কহিল,—আর এ বাড়ীতে নয়।

মঞ্জরী কহিল,—ছিঃ, এই কি রাগের সময়! যাও খুড়োর মুখে জল দাও, কানে নাম শোনাও।

পাড়াশুদ্ধ লোক এই বেহায়া মেয়েটার সীমাহীন নির্লজ্জতায় অবাক হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। মেয়েরা গালে হাত দিল। পুলিনও মঞ্জরীর মুখপানে চাহিল, তারপর ধীরে ধীরে খুড়ার শিয়রে বসিয়া মুখে গঙ্গাজল দিল, ডাকিয়া কহিল,—বল কাকা, জয় রাধারাণী!

বৃদ্ধ কহিল,—জয় রাধারাণী, দয়া ক'রো মা, অনাথিনী,—দুঃখিনী, দয়া ক'রো মা!

বেলা আড়াই প্রহরের সময় রামদাস মরিল, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হইতে রাত্রি এক প্রহর হইয়া গেল।

তখন মঞ্জরী গোপিনীকে কহিল,—তবে আমি আসি!

গোপিনী বলিল,—এসো।

মঞ্জরী চারিদিক চাহিয়া সরল ভাবেই কহিল,—কর্ত্তা কই? একাটি থাকতে ভয় করবে না তো?

অনেক সময় বক্তা যাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই এমন অর্থ শ্রোতা ধরিয়া থাকে, লেখকের লেখায় কত নূতন অর্থ পাঠক বাহির করিয়া বসে। গোপিনীর মনে হইল, মঞ্জরী বুঝি তাহাকে ঠাট্টা করিল, সে উত্তর করিল,—আসা, যাওয়াই যখন একা তখন একা থাকতে ভয় করলে চলবে কেন? আর একাই তো থাকা এক রকম।

মঞ্জরী কথাটা গায়ে না লইয়া কহিল,—আমি কিন্তু ভাই, একা থাকতে পারি ন', তাই ত পাঁচজনকে নিয়ে আমার কারবার। মা ম'রে থেকে কেমন গা থম্‌থম্ করে।

গোপিনী কহিল,—আমি হলে একা থাকতে না পারতাম মায়ের সঙ্গী হতাম, তবু—

মঞ্জরী এবার একটু ঝাঁঝিয়া উত্তর দিল,—বালাই, ষাট্, মরব কেন? আসি ভাই, কিন্তু রসকলি গেল কোথা?

গোপিনী ক্ষিপ্তের মত কহিল,—রসকলি নাকেই আছে, ঘরে গিয়ে আয়না নিয়ে দেখো, পোড়ার মুখের উপরেই ঝলমল্ করছে।

আঘাতের ধর্ম্মই হইতেছে প্রতিঘাত পাইবেই, তা সে আহত যতই নিষ্ক্রীয় হউক না কেন।

মঞ্জরী বহুকষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়াও শেষটা উত্তরের বেলায় বলিয়া ফেলিল,—রসকলি তো নিজের নাকেই থাকে বৌ, এ যে কেড়ে নেওয়া যায় না। তা তুমি যদি চাও তো না হয় দেবার চেষ্টা করি।

আপন ধন যদি পরে জোর করিয়া কাড়িয়া লয় সে ধন ভিক্ষা চাইতে অতিবড় ভিক্ষুকেরও বাধে, আবার সে-ই যদি বলে চাহিয়া লও তো দিব।

গোপিনী ফোঁস করিয়া উত্তর দিল,—আমার বাড়ীতে দাঁড়িয়ে আমাকেই এত বড় অপমান তুমি কর কি সাহসে। আমার হয় আমাকে ভগবান দেবেন, তোমার কাছ থেকে ভিক্ষে আমি চাই নে, চাই নে। যাও তুমি, যাও।

কথাগুলা এক রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বলিয়াই সে ঘরে ঢুকিয়া মঞ্জরীর মুখের উপরেই দরজাটা হড়াম করিয়া বন্ধ করিয়া দিল।

মঞ্জরী ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরিল, চটুল গতিটি আজ যেন দৃঢ়, মুখের তরল হাসিটি যেন দাঁতের চাপে সম্পূর্ণ বাহিরে আসিতে পারিতেছে না, রসোচ্ছলা যেন কোন সংকল্প-পরায় না।

আপন বাড়ী ঢুকিতেই মঞ্জরী দেখিল, পুলিন তাহার দাওয়ার উপর বসিয়া।

দেহ ব্যাপিয়া একটা হিল্লোল বহিয়া গেল। দাঁতে চাপা হাসিটি নীরবে মুখ ভরিয়া বাহির হইয়া আসিল ...

পুলিন উঠিয়া কহিল,—রসকলি!

মঞ্জরী হাসিয়া উত্তর দিল,—বসো বলি।

পুলিন বসিল।

ঘরের তালা খুলিতে খুলিতে মঞ্জরী কহিল,—রসকলি, তুমি ভাই সোনাকপিলে পুরুষ। স্ত্রী-ভাগ্যে ধন!

পুলিন খুব রাগত ভাবেই কহিল,—ও ধন আমার ভাদ্দর-বৌ, ছুঁতে পাপ।

মঞ্জরী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া কহিল,—আর বৌটি? —কি গো চুপ করে রৈলে যে? উত্তর দিতে পারলে না? আচ্ছা আমিই বলে দি,—সে তোমার গলার মালা, ঠোঁটের হাসি —

পুলিন কহিল,—না রসকলি, হ'ল না, সে আমার গলার ফাঁসী। ঠাট্টা নয় রসকলি, একটা কথা তোমায় বলতে এসেছি, আমি কাল থেকে নিজের বাড়ীতে যাব। ও বাড়ীতে আর থাকব না।

নিজের বাড়ী অর্থে পুলিনের পৈত্রিক বাড়ী। বাস্তব চক্ষে বাড়ীটি একটি মূর্ত্তিমন্ত বিভীষিকা কিন্তু কল্পনায় বাড়ীটি বেশ,—অর্থাৎ উঠান ভরা বনফুল, প্রাচীর ভাঙ্গিয়া সীমা অসীমে মিশিয়াছে, ঘরের ভিতরেও চাঁদের আলো খেলে।

মঞ্জরী কহিল,—বেশ, তা ভালো, তারপর খাবে কি করে?

পুলিন চট্ করিয়াই কহিল,—বোষ্টোমের ছেলে, ভিক্ষে করে খাব।

মঞ্জরী কহিল,—আরও ভালো; কিন্তু ভিক্ষেতে মেলে তো চাল, তা রাঁধবে কে? বৌকে নিয়ে যাও।

পুলিন প্রবল প্রতিবাদে মাথা নাড়িয়া কহিল,—না।

মঞ্জরী কহিল,—কেন? আর তুমি না বল্লেও সে যদি না ছাড়ে?

পুলিন কহিল,—ছাড়বে না? ঘরের হুঁড়কো আছে। জান রসকলি, কথায় আছে,—'পড়লে পরে ছুধু ভাতু, না পড়লে ঠেঙার গুঁতু।'

মঞ্জরী কহিল,—বেশ। রসকলির আমার উপমা ভালো, এ যেন সেই,—ও পারেতে ধান পেকেছে লম্বা লম্বা শীষ, টুকুস্ করে মরে গেল লঙ্কার রাবণ। তা যেন হলো, আজ রাত্রের মত তো বাড়ী যাও।

পুলিন কহিল,—না, আর নয়।

পুলিনের কণ্ঠে স্বরটা নূতন, পাথরের দেওয়ালে খট্খটে, শুষ্ক কঠিন শব্দে যে ইঙ্গিত দেয়, কণ্ঠস্বরে যেন সেই আভাষ মিলিতেছিল, বড় দৃঢ়, ভাঙিবার নয়।

মঞ্জরী পরিহাস ছলেই কহিল,—তবে আজ রাতটা পাল-পুকুরের বট গাছেই কাটাবে না কি?

পুলিন কহিল,—না, তোমার দাওয়াতেই পড়ে থাকব।

মঞ্জরী হাসিল, দুই আর দুই-এ চার হয় এ কথাটা যে বুঝে না, সে চারের গুরুত্ব না বুঝিলে তাহার উপর রাগ করিয়া লাভ কি?

পুলিন বাহির দরজার দিকে ফিরিল।

মঞ্জরী কহিল,—যাও কোথা?

পুলিন কহিল,—দেখি কোথাও—

মঞ্জরী আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিল,—যেতে হবে না, এস শোবে এস।

পুলিন ব্যস্ত হইয়া কহিল,—না, না—লোকে বলবে কি?

মঞ্জরী কহিল,—যা বলবার তার ত বলেই নিয়েছে, আবার বলবে কি? শোন নি, আজই তোমার কাকা বললে ওই —

পুলিন তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—তোমার পায়ে ধরি রসকলি, ছি, ও কথা তুমি ব'ল না।

মঞ্জরী হাসিয়া মৃদুস্বরে গান ধরিল—

'লোকে কয় আমি কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী—
সখি সেই গরবে আমি গরবিনী।'

পুলিন তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিল, স্পর্শে তার সে কি উত্তাপ! মঞ্জরী মৃদু আকর্ষণে হাতখানি ছাড়াইয়া শান্ত মধুর কণ্ঠে কহিল,—ছাড়, বিছানা করি।

তকৃতকে ঘরখানি, লাল মাটী দিয়া নিকানো, আল্পনার বিচিত্র ছাঁদে চিত্রিত; দেওয়ালে খানকয় পট—সেই পুরানো গোরাচাঁদ, জগন্নাথ, যুগল-মিলন, সবগুলির পায়ে চন্দনের চিহ্ন। মেঝের উপর একখানি তক্তপোষ, একদিকে পরিষ্কার 'পিঁড়ুলি'র উপর ঝক্‌ঝকে বাসনগুলি সাজানো।

তক্তপোষের উপর গুটানো বিছানা বিছাইয়া দিয়া একটি ছোট চৌকীর উপর রক্ষিত তোলা বিছানার গাদা হইতে দেখিয়া দেখিয়া একখানা 'সিজুনী' আনিয়া পুরাতন বিছানার উপর বিছাইয়া দিল, 'সিজুনীটি' মঞ্জরীর নিজের হাতে অতি যত্নে প্রস্তুত; চারুশিল্পের অপরূপ ছাঁদ সিজুনীটি শোভা করিয়া আছে। বিছানাটি বেশ করিয়া কয়বার ফিরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিয়া ডাকিল,—এসো।

পুলিন ঘরে আসিয়া তক্তপোষে বসিল। দেখিল মঞ্জরী অভ্যাস মত ঈষৎ বাঁকিয়া দাঁড়াইয়া,—সেই হাসি, সেই সব; শুধু দৃষ্টিটুকু নূতন, সে তখন মুগ্ধ, আবিষ্ট, একাগ্র।

পুলিন কথা কহিল, ভাবটা গদ গদ কিন্তু সঙ্কুচিত,—রসকলি!

মঞ্জরী চমক ভাঙিয়া কহিল,—কি গো!

পুলিন কহিল,—তুমি, তুমি ... আমার ... আমার ... আমার ...

কথাটা শেষ করিতে আর পারিল না, প্রতিবারই বাধিয়া যায়, আর পুলিন রাঙা হইয়া উঠে।

মঞ্জরী খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া কহিল,—তোমার,—তোমার,—তোমার কি গো?

কৌতুকে গ্রীবা বাঁকাইয়া খানিকক্ষণ পুলিনের নত লজ্জিত মুখের উপর উজ্জল দৃষ্টি হানিয়া সহসা মঞ্জরী তাহার মাথাটা পুলিনের কানের কাছে লইয়া গিয়া কহিল,—আমি তো তোমারই গো!

কথাটা বলিয়াই সে সট্ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল—চঞ্চল লঘু গতিতে, ছোট ত্বরিত গতি ঝরণাটির মতই; বাহিরে গিয়াই দরজাটা টানিয়া শিকল আঁটিয়া দিল। একরাশ দমকা দখিনা বাতাস আসিয়া যেন পুলিনকে তৃপ্ত করিয়া অন্তরকে দীপ্ত করিয়া আচমকাই চলিয়া গেল।

মঞ্জরী শিকল টানিয়া দিয়া আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে ঢেঁকিশালায় আসিয়া আঁচল পাতিয়া শুইয়া পড়িল।

* * *

রাত্রিতে পুলিন আসে নাই, বেলা এক প্রহর হইয়া গেল তবুও দেখা নাই; গোপিনী অপেক্ষায় বসিয়াছিল, সহসা সে সব ঝাড়িয়া ফেলিয়া উঠিল, স্নান সারিয়া রান্না চড়াইল।

খুট্ করিয়া শব্দ হয়, ওই বুঝি আসিল। প্রবল অভিমানে ব্যগ্র দৃষ্টিকে রান্নার কড়ায় নিবিষ্ট করিল, হাতের খুন্তি প্রয়োজনাতিরিক্ত অতি বিক্রমে ঘুরিয়া উঠিল—খন্, খন্, খন্।

এই বুঝি ডাকে,—সাপিনী হে!

পোষা বিড়ালটা দাওয়ায় লাফাইয়া উঠিয়া ডাকিল,—ম্যাঁও, ম্যাঁও, ম্যাঁও।

আর দৃষ্টি মানিল না, ফিরিল; কিন্তু কই? শূন্য অঙ্গন, ভেজানো বহির্দ্বার,—মানুষের বার্ত্তা তো দিল না।

হাতের খুন্তিটা সজোরে বিড়ালটার পিঠে হানিয়া গোপিনী গালি পাড়িল,—বেরো, বেরো, বেরো---আপদ বেরো।

কতক্ষণ কাটিয়া গেল, গোপিনীর মনে হইল বুঝি বা একটা যুগ।

সহসা বহির্দ্বার খুলিয়া গেল, বলাই আসিয়া দাওয়ায় বসিল।—হাতে হুঁকা, টানিতে টানিতে কহিল,—শুনেছ মিতেনী, কাল রেতে মিতে যে মঞ্জরীর বাড়ীতে ...

বলাই পুলিনের মিতে, তাই গোপিনীকে ডাকিত—মিতেনী, গোপিনী ডাকিত মিতে।

গোপিনী কহিল,—শুনি নাই,তবে জানি।

বলাই কহিল,—আজ আবার নিজের ঘর সাফ হচ্ছে, সেই খানেই থাক্‌বে, এ বাড়ীতে থাকবে না।

একটা লজ্জা ঢাকিতে পাঁচটা লজ্জা মাথায় লইতে হয়। গোপিনী কহিল,—আমিই যে থাকতে দোব না, সে আমি কাল বলে দিয়েছি, বাড়ী ঢুকলে ঝাঁটার বাড়ি দোব।

বলাই বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া কহিল,—ও, তাই বুঝি এত! আবার মঞ্জরীকে পত্র করবে।

বুকে পাথর চাপা দিলেও মানুষ কাতরাইতে পারে, আবার স্থানবিশেষে আঙ্গুলের টোকাও সয় না। কথাটা এমন স্থানে গোপিনীকে আঘাত করিল যে, সে আর কথা কহিতে পারিল না।

বলাই কহিল,—কাল রেতে জমিদার গাঁয়ে এসেছেন, তুমি নালিশ কর।

গোপিনী দীপ্ত প্রতিবাদে কহিল,—না।

তারপর উভয়েই নীরব, গোপিনীর হাতের খুন্তি নড়ে না, চোখ কড়ার উপর কিন্তু দৃষ্টি নয়; পলকও পড়ে না।

বলাই মনে মনে কি যেন মক্স করিতেছিল, শেষ দালালীর ভঙ্গীতে রসান দিয়া কহিল,—বেশ বলেছ, সেই ভাল,—ও 'দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ই ভাল।'

তারপর আবার হুঁকায় টান পড়িল—ফড়র্ ফড়র্। একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া কহিল,—আমাদের ত ছিঁড়লে মালা গাঁথতে আছে, ভাবনাই বা কি। ভাত থাকলে কি কাকের অভাব হয়? কি বল মিতেনী! আমি রয়েছি সব ঠিক ক'রে দোব তোমার।

পরিশেষে সম্মতির আশায় মিতেনীর মুখপানে চাহিল।

মিতেনী কহিল,—ভাত না থাকলেও ময়লা মাটীর জন্মেও কাক জোটে, কিন্তু কাক ত কেউ পোষে না, ও হ'ল শূয়োর কুকুরের জাত, ছুঁলে চান করতে হয়। তা তুমি যাও আর আমার বাড়ী এস না।

বলিয়া হাতের খুন্তিটা বাড়াইয়া পথ-নির্দ্দেশ করিয়া দিল।

* * *

পুলিন কোদালি হাতে বাড়ী সাফ করিতেছিল। 'অনভ্যাসের ফোঁটায় কোপাল চড়-চড় করে,' পুলিন ঘামিয়া যেন নাহিয়া উঠিয়াছে, হাত টাটায়, শিরদাঁড়া টন্ টন্ করে, তবু কাজ সারা চাই। স্ত্রীলোকের অন্নদাস,—ছিঃ—তার বড় লজ্জা আর কি?

মিতে বলাই আসিয়া কহিল,—ভ্যালারে মিতে, তা ভালো।

পুলিন কোদালি নামাইয়া কহিল,—কল্কেতে কিছু আছে? ... হুঁকো লয়,অশুচ আমার।

বলা কলিকাটা খসাইয়া পুলিনকে দিল। ধুতরো ফুলি ছাঁদে হাত ফাঁদিয়া পুলিন টান মারিল—হুশ, হুশ, হু-শ!

বলাই কহিল,—তা এক কাজ করলি না কেন মিতে, জমিদার এসেছেন, তাঁর কাছে পাড়লে একবার হতো না। তোর হ'ল সোদর খুড়ো, আর ওর সং বাবা, ওয়ারিশ হলি তুই, ও মাগী সম্পত্তির কে? চল তু একবার, দেখবি এখুনি তোর সম্পত্তি তোর হবে।

অদ্ভুত পুলিন, বিচিত্র তার সংসার বোধ, সে কহিল,—ওর কি হবে?

বলাই কহিল,—তোর বৌ—

পুলিন কহিল,—না, না, আমি যে রসকলিকে ...।

বলাই সোৎসাহে কহিল,—রসকলিকেই পত্র করবি, ও না হয় চরে খাবে।

সে যে নেহাৎ অমানুষী হয়, হাজার হউক সে স্ত্রী, তাহাকে ভাসাইয়া দেওয়া ...। মনটা পুলিনের মোচড়

দিয়া উঠিল। পূর্ব্বে তাহার সান্ত্বনা ছিল, তাহার প্রাপ্য ধনমূল্যে গোপিনীর নিকট মুক্তি পাইবার হক্‌দার সে।

পুলিন কহিল, না দিতে, তা হয় না।

যেমন দেবা, তেমনি দেবী! বলাই বিরক্তিভরে উঠিল, রাস্তা ধরিল—জমিদার কাছারী পানে।

পুলিন ভাঙ্গা দাওয়াটার উপর ভাবিতে বসিল।

জমিদারের পশ্চিমা চাপরাশী আসিয়া ভাঙ্গা কাঁসরের মত ঘন্ ঘন্ করিয়া কহিল,—আরে পুলিয়া. আসো, আসো, বাবুর তলব আসে।

পুলিন চমকাইয়া কহিল,—ক্যানে, ক্যানে, কাহেসে দারোয়ানজী?

পশ্চিমা কহিল,—সো হামি জানে না।

* * *

জমিদারের কাছারীতে পুলিন আসিয়া প্রণাম করিল।

বাবু ফরসীতে তামাক টানিতেছিলেন, গোমস্তা কলম পিষিতেছে, দু'জন মাতব্বর বসিয়া, আর ও-ধারে এক পাশে আবক্ষ ঘোমটা টানিয়া সঙ্কুচিতা গোপিনী।

বাবু পুলিনের দিকে চাহিয়া কাছারীকে উদ্দেশ করিয়াই কহিলেন,—সে হারামজাদী কই?

রাখাল পাইক বসিয়াছিল, কহিল,—আজ্ঞে, তিনি চানে গেল, আস্‌চেন।

বাবু পুলিনকে কহিলেন,—পুলিন, তোমার খুড়োর সম্পত্তি খারিজ করতে হবে।

পুলিন শশব্যস্তে কহিল,—আজ্ঞে সম্পত্তি আমার নয়, ওঁর।

যোড় হস্তে অঙ্গুলিনির্দ্দেশে গোপিনীকে দেখাইয়া দিল।

বাবু কহিলেন,—ওই হ'ল হে—ওই হ'ল, স্বামী আর স্ত্রী। মুখ থাকতে নাকে ভাত খায় কে হে? আর তুমি থাকতে সম্পত্তির ও কে? ও সম্পত্তি পেলে কি করে? কথা কও গো, চুপ করে থাকলে চলবে না।

অগত্যা গোপিনী মৃদু কণ্ঠে কহিল,—আজ্ঞে, তিনি আমায় দিয়ে গিয়েছেন।

বাবু কহিলেন,—বেশ তোমাকেই তবে খারিজ করতে হবে, পাঁচশো টাকা লাগবে।

পুলিন কহিল,—আজ্ঞে ও মেয়েমানুষ ...।

বাবু ধমক দিয়া কহিলেন,—তুই থাম্ বেটা। বল গো তুমি বল। আবার চুপ করলে যে, উত্তর দাও, পাঁচশো টাকা চাই আমার।

পুলিন ধমক খাইবার পূর্ব্বেই থামিয়াছিল। গোপিনীর সহিত সম্বন্ধ চুকাইয়াও তাহার জন্য ওকালতি কেন যে সে করিল, সে-ই বুঝে নাই।

পথভ্রান্তকে যে পথ লোকে দেখাইয়া দেয় সেই পথেই চলে।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া গোপিনী পুলিনের কথা ধরিয়াই কহিল,—আজ্ঞে আমি মেয়েমানুষ—

বাবু কহিলেন,—আরে সম্পত্তি তো মেয়েমানুষ নয়। আচ্ছা না পার, সম্পত্তি তুমি পুলিনকে ছেড়ে দাও।

পুলিন শশব্যস্তে কহিল,—আজ্ঞে না।

গোপিনীও কহিল,—আজ্ঞে না।

বাবু চটিয়া কহিলেন,—আচ্ছা তবে সম্পত্তি সদরে বাজেয়াপ্ত হবে। আর পুলিন, তুই বেটা ওই বেশ্যেকে নিয়ে গাঁয়ে ঢলাঢলি করছিস্ কেন? ও সব হবে না, পরিবার নিয়েই থাকতে হবে।

অভিমান অনবুঝ, স্থান, কাল জ্ঞান নাই; পুলিন কিছু না বলিতেই গোপিনী মাথা নাড়িয়া কহিল,—না!

ওই 'না' কথাটা ক্রোধ-বহ্নির পোকার; সব কথাতেই না হইলে রাগে জ্বলিয়া উঠে বোধ হয় হাজার করা ন'শো নিরানব্বই জন।

বাবু চটিয়া দীপ্ত কণ্ঠে কহিলেন,—চোপরাও হারামজাদী, ঐ পুলিনকে নিয়েই তোকে থাকতে হবে।

গোপিনী আতকাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ঠিক তখনই মঞ্জরী আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল,—বাবু, আমায় তলব করেছেন?

বাবু মুখ ফিরাইয়া আর কথা কহিতে পারিলেন না। সম্মুখে রসোজ্জ্বলা মেয়েটি চূড়ার মত চুলটি বাঁধা, নাকে

রসকলিটি আঁকা, মুখে মিষ্ট হাসি, গালে দুটি ঈষৎ টোল; মঞ্জরীকে দেখিয়া ক্ষণেক তাঁহার কথা সরিল না।

মঞ্জরী পুনরায় কহিল,—হুজুর!

চমক ভাঙিয়া বাবু কহিলেন,—হাঁ, এসো। ... শুনচ গো, ও সব চল্‌বে না, পুলিনের সঙ্গেই ঘর করতে হবে।

শেষটা কহিলেন গোপিনীকে। কথার নির্দ্দেশে মঞ্জরীর দৃষ্টি পড়িল ভয়ত্রস্তা গোপিনীর উপর, সে ত্বরিত পদে নিকটে গিয়া গোপিনীকে কাছে টানিয়া লইল।

আশ্বাস লোকে কথাতেও পায়, দৃষ্টিতেও পায়, স্পর্শেও পায়, গোপিনী মঞ্জরীকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল,—রসকলি!

উজ্জ্বল হাসিতে মঞ্জরীর মুখখানি দীপ্ত হইয়া উঠিল, কহিল,—ভয় কি রসকলি!

বাবু পুনরায় কহিলেন,—বুঝলে, এই আমার হুকুম; উত্তর দাও, রাজী কি না? ... শুন্‌চিস পুলিন!

পুলিন, গোপিনী উভয়েই নীরব, উত্তর দিল মঞ্জরী। তেমনি হাসিয়া,—হুজুর, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া কি ধমকে মেটে?

বাবু কহিলেন,—আলবাৎ মিটবে, না মিটলে চলবে না।

মঞ্জরী কহিল,—নাই যদি মেটে হুজুর, তাই-বা কি, আমরা জাতে বোষ্টোম, ছিঁড়লে মালা আমরা নূতন গাঁথি।

বাবু কহিলেন,—বেশ তবে ও বলাকে পত্র করুক।

ও-পাশে বসিয়া বলা মুচকি হাসিল।

গোপিনী প্রবল প্রতিবাদে কহিল,—না, না।

বাবু কহিলেন,—তবে কি মতলব শুনি, কিন্তু আমার রাজ্যে ও সব বদমায়েসী চলবে না।

পুলিন কি একটা প্রতিবাদ করিল কিন্তু এত ক্ষীণ যে কাহারও খেয়ালে আসিল না। সে নড়িয়া চড়িয়া বসিল, যেন ধৈর্য্য আর থাকে না,—গর্ত্তের সাপ ধরা পড়িবার পূর্ব্বে যেমনতর বাহির হইতেও পারে না অথচ ক্রোধে গর্ত্তের ভিতরে কুণ্ডলী পাকাইয়া ঘুরে তেমনিতর।

মঞ্জরী কিন্তু বেশ সবিনয়ে সবল প্রতিবাদ করিল, সে জিভ কাটিয়া কহিল,—ছি, ছি, বাবু—আপনাকে ও সব কথা বলতে নাই।

বাবু অপ্রস্তত হইয়া মঞ্জরীকে ধমক দিয়া কহিলেন,—আচ্ছা, আচ্ছা। তোমারও এখানে থাকা চলছে না, পাঁচজনে তোমার নামে পাঁচ কথা বলছে. তোমায় গ্রাম ছেড়ে যেতে হবে।

মঞ্জরী সবিনয়ে কহিল,—আজ্ঞে কোথায় যাব, মেয়ে-মানুষ আমি ..

বাবু তাহার মুখপানে চাহিয়া কহিলেন,—আচ্ছা আমার সঙ্গে চল তুমি, আমার বাড়ীতে থাকবে।

মঞ্জরী কহিল,—আজ্ঞে, ঝি-গিরি আমি করতে পারব না।

বাবু কহিলেন,—আচ্ছা, কাজ তোমায় করতে হবে না।

মঞ্জরী হাসিয়া কহিল,—বাপরে! রাণী-মা তাহলে ভাত দেবেন কেন?

বাবু এবার বেশ রস দিয়া কহিলেন,—সে ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না, আমাদের বাগানে তোমার কুঞ্জ করে দোব, এখানে যেমন আছ তেমনি থাকবে।

বলিয়া বাবু হাসিলেন, হাসিটি গেঁজলা রসের মত, কেমন যেন বিশ্রী, কুৎসিৎ গন্ধের আভাষ দেয়।

মঞ্জরী কহিল,—আমার পোড়ার মুখকে কি আর বলব, সত্যি সত্যিই এ মুখে আগুন দিতে হয়। আপনি রাজা, আপনিও শেষ ... না হুজুর, আমি এ গাঁ ছেড়ে কোথাও যাব না সে যে যা বলবে বলুক।

বাবু মেয়েটার স্পর্দ্ধা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন, সহসা তিনি উন্মত্তের মত চীৎকার করিয়া কহিলেন,—কেয়া হারামজাদী, ভূতসিং! লাগাও জুতি হারামজাদী কো।

বদ্ধ লৌহদ্বার মত্ত হস্তীও ঠেলিয়া খুলিতে পারে না, আবার অর্গলী খুলিলে আঘাতের অপেক্ষাও সয় না, খুলিয়া যায়, পুলিনের মনের দরজার ঠিক অর্গলটিতে হাত পড়িতে সে খুলিয়া গেল, ভিতরের মানুষটি বাহিরে আসিল, সে একটা ভীষণ দাপে হাঁকিয়া উঠিল,—খবরদার!

রাখাল পাইকের শিথিল মুষ্টির লাঠিগাছটা কাড়িয়া লইয়া মাটিতে ঠুঁকিয়া পুলিন বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল।

ব্যাপারটা গড়াইত কতদুর কে জানে, কিন্তু লোকে ব্যাপারটা গোটা বুঝিতে না বুঝিতে মঞ্জরী ত্বরিত পদে

পুলিন ও গোপিনীর হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল।

স্তম্ভিত ভাবটা কাটিতেই বাবু কহিলেন,—ভুতসিং!

বদা মৃদু কণ্ঠে কহিল,- হুজুর, ওই মঞ্জরীর সঙ্গে গোকুলবাটীর থানার দারোগার পরিবারের সঙ্গে খুব সুখ— একটু বুঝে ...

বলার কথাটা ঢাকিয়া দিয়া লাঠি হস্তে ভুতসিং ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিয়া কহিল,—হজৌর, হুকুম!

বাবু কহিলেন,—কুছ নেহি, যাও।

* * *

মঞ্জরী দুইজনের হাত ধরিয়া আসিয়া উঠিল একেবারে রামদাসের বাড়ীতে। সারাটাপথ সে যেন কি ভাবনায় ভোর হইয়াছিল, ভাবনা বলিলে ঠিক হয় না, সে যেন একটা আবেশ, একটা নেশা।

বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই মঞ্জরী দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া, একগাছা মোটা লাঠি আনিয়া পুলিনের হাতে দিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া কহিল,—বাইরে বসো পাহারাওলা!

পুলিন লাঠি হাতে বাহিরে বসিল, আর ঘরের মেঝেতে দুটি নারী;—গোপিনী নত দৃষ্টিতে আর মঞ্জরী তাহার মুখের পানে চাহিয়া বসিয়া সেই নেশায় ভোর।

সহসা হাসিয়া মঞ্জরী কহিল, - রসকলি!

গোপিনী মুখ তুলিয়া হাসিল, বড় বিষাদের হাসি— যেন মলিন ফুলটি!

মঞ্জরী কহিল,—এককাছাবী লোকের সামনে রসকলি পাতিয়েছ, না বললে তো চলবে না।

গোপিনী কহিল,—হ্যাঁ।

মঞ্জরী কহিল,- তা ভাই, অনুষ্ঠানটা হয়ে যাক্,—তুমি আমার নাকে রসকলি এঁকে দাও, আমি তোমার দিই, যা নিয়ম তা তো করতে হবে!

বলিয়াই খুঁজিয়া পাতিয়া সব সরঞ্জাম বাহির করিয়া তিলক-মাটী ঘসিতে বসিল।

তারপর গোপিনীর কোল ঘেঁসিয়া বসিয়া কহিল,— তুমি ভাই, আগে বলেছ, আগে তোমার পালা, দাও আমায় রসকলি এঁকে দাও।

বলিয়া নিজের আঁকা রসকলিটি মুছিয়া ফেলিল, শুধু নাক মুছিল, না চোখ শুদ্ধ মুছিল সে-ই জানে, কিন্তু অঞ্চলে চোখ শুদ্ধ ঢাকিয়াছিল।

হতভম্ব গোপিনী কম্পিত করে মঞ্জরীর নাকে রসকলি আঁকিয়া দিল।

মঞ্জরী কহিল,—দাঁড়াও, সাক্ষী ডাকি।

বলিয়া বাহিরে পুলিনকে ডাকিল,—সেই মধুভরা কণ্ঠ,— রসকলি, এসো বলি।

পুলিনকে লইয়া গোপিনীর হাতে হাতে নিজের হস্ত-বন্ধনে বাঁধিয়া দিয়া কহিল,—এই নাও রসকলি, আমার রসকলি তোমায় দিলাম।

পুলিনের কথা সরিল না।

তারপর পুলিনকে কহিল,—আমি দিচ্ছি, না বলো না।

গোপিনী ও পুলিন বিস্মিত নির্ব্বাক!

সহসা গোপিনী মঞ্জরীর হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল,— না, না, তুমি শুদ্ধ এসো, আমরা দু বোনে—

রসোচ্ছলা রসোচ্ছলার মতই কহিল,—দূর্, আমি যে রসকলি!

* * *

বৈকালের মুখে মঞ্জরী কহিল,—দাঁড়াও, আমি একবার গাঁয়ের হালচাল দেখে আসি।

পুলিন বাধা দিয়া কহিল,—সে কি, একলা?

মঞ্জরী হাসিয়া চলিয়া পড়িল, কহিল,—ভয় কি, আমার রসকলি যে সঙ্গে।

বলিয়া নাকের রসকলি দেখাইয়া দিল। তারপর আবার কহিল,—ভয় নাই, আমি বাইরে বাইরে খবর নোব, তেমন তেমন বুঝলে আমি গোকুলবাটীর থানায়

যাব। আজ রাত্রে না ফিরতেও পারি, বুঝলে! খবরদার, তোমরা বেরিয়ো না, দিব্যি রইল, মাথা খাও।

সে কণ্ঠস্বরে পরিহাসের বিন্দুও ছিল না, পুলিন সে কথা অবহেলা করিতে পারিল না।

মঞ্জরী চলিয়া গেল, রাত্রে ফিরিল না।

* * *

পরদিন প্রাতে বলাই আসিয়া ডাকিল,—মিতে!

মঞ্জরীর সংবাদের আশায় নিজের বিপদের আশঙ্কা তুচ্ছ করিয়া দরজা খুলিয়া কহিল,—এসো।

বলাই কহিল,—বেশ, বেশ, তা মঞ্জরীকে দিয়ে টাকাটা পাঠালি কেন? নিজে গেলেই তো হত। তা ও বেশ ভালোই হল। বাবুও বল্লেন, বলাই, পুলিন যখন দুশো টাকা জরিমানাই দিলে তখন আর তার উপর রাগ নাই আমার। তা পুলিন বোধ হয় ভয়ে আসে নাই, তাই মঞ্জরীকে দিয়ে পাঠিয়েছে। মঞ্জরীকেও মাপ হয়ে গিয়েছে। তা একবার আজ যাস বাবুকে পেন্নাম করে আসিস্, ভয় নাই আমিও সব বলে কয়ে দিয়েছি।

পুলিনের কথা সরিল না।

জমিল না দেখিয়া বার কয়েক হুঁকা টানিয়া বলাই চলিয়া গেল। পুলিন স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া রহিল। কে জানে—কতক্ষণ! একটি পুঁটুলী কাঁখে মঞ্জরী আসিয়া হাসিমুখে অভ্যাস মত হেলিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিল,—রসকলি!

পুলিন কথা কহিল না।

হাসিয়া মঞ্জরী কহিল,—রসকলি, রাগ করেছ?

পুলিন অভিমানভরে কহিল,—তুমি জমিদারকে—

মঞ্জরী কহিল,—জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বাদ করা কি চলে গো? তাই মিটিয়ে ফেল্লাম।

পুলিন কহিল,—টাকা ...

মঞ্জরী কথা কাড়িয়া কহিল,—সে ত তোমারই গো, আমি কি তোমার পর?"

তারপর পুলিনের হাতদুটি ধরিয়া কহিল,—তবে আসি ...

উদ্ভ্রান্তের মত পুলিন কহিল,—কোথায়?

মঞ্জরী কহিল,—বৃন্দাবন।

মঞ্জরীর হাত দুইটা সজোরে যেন বাঁধিয়া কহিল,—না, না, না।

আকর্ষণে কাঁখ হইতে পুঁটুলীটা মাটিতে গড়াইয়া গেল। মঞ্জরী পুলিনের মুখপানে চাহিয়া আবেশে কহিল—

—রসকলি!

মঞ্জরী কহিল,—আমি ত তোমারই গো।

গোপিনী দ্বারের পিছনে ছিল,সম্মুখে আসিয়া যেন দাবী করিল,—যেতে পাবে না।

মঞ্জরী কহিল,—তীর্থের সাজ খুলে কুকুর হব?

গোপিনী কহিল,—বল তবে ফিরে আসবে?

মঞ্জরী কহিল,—আসব।

গোপিনী কহিল,—আসবে? দেখো!

মঞ্জরী কহিল,—হাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ—তিন সত্যি। আসব লো আসব।

গোপিনী কহিল,—এসে কিন্তু রসকলি নয়, তা বলছি, দুই---তাই---বুঝেছ!

মঞ্জরী হাসিয়া পুঁটলীটা তুলিয়া লইয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িল। বিচিত্র সে হাসি,—রহস্যের মায়া মাধুরীতে ভরা, কে জানে তার অর্থ।

চলিতে চলিতে গান ধরিল—

'লোকে কয় আমি কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী
সখি সেই গরবে আমি গরবিনী গো
আমি গরবিনী।'

নাকে তার রসকলি, মুখে তার হাসি, চলনে সে কি হিল্লোল, রসধারা যেন সর্ব্বাঙ্গ ছাপাইয়া ঝরিতেছিল। ✓

দেবী-দর্শন

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

ক্ষ্যাপা-কালীতলায় বৈঠক বসিয়াছে।

গোবিন্দ গাঙ্গুলী বালাপোষ মুড়ি দিয়া কলিকা সেবন করিতেছিলেন, এক ধমক কাসিয়া লইয়া অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, যাই হোক, কথাটা ভাল নয় উপেন-ভাই! মা যে নিশুতি রাত্রে মন্দির ত্যাগ করে বেলতলায় সফর করতে যাবেন—শুনতে সে ভারি বিশ্রী! স্বামী-ভক্তির প্রশংসা না হয় করলুম, কিন্তু আমরাও ত তাঁর সন্তান! কি বল হে?

গাঙ্গুলীর প্রশ্নের উত্তরে কেহই কিছু বলিলেন না, যে যার মনে মনে বিষয়টা আলোচনা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। হুঁকা-কলিকা হস্তান্তরিত হইতে লাগিল।

ব্যাপারটা একটু খুলিয়া বলা প্রয়োজন। এই বেল-পুকুর গ্রামের উত্তরাঞ্চলে যে চিরজাগ্রত দেবীটি অনির্দ্ধারিত কাল হইতে নর-নারীর শ্রদ্ধা-ভক্তি আদায় করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহার নাম ক্ষেপাকালী। মন্দিরটী গ্রামের একান্তে, সুনিবিড় ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে অবস্থিত। বহুকাল হইতেই সেবাইৎ নিযুক্ত করিয়া তাঁহার পূজা চলিয়া আসিতেছে। বেলপুকুরে জনপ্রবাদ ছিল, এই ক্ষেপা কালীর কৃপায় কোন অসম্ভবই সম্ভব হওয়া বিস্ময়ের নয়! বন্ধ্যা নারী তাঁর সুনজরের কৃপায় কতবার জোড়া ছেলে লাভ করিয়াছে, হৃত সর্ব্বস্ব কে এক থাককালী একবার পাঁঠা মানত করিয়াই কোলিয়ারীর দৌলতে কলিকাতায় গিয়া চক মেলান অট্টালিকা ফাঁদিয়া ফেলিয়াছে। সম্প্রতি গ্রামে রব উঠিয়াছে, এই উন্মাদিনী দেবীমাতা নাকি প্রতিদিন রজনীর তৃতীয় প্রহরে টকটকে রাঙ্গাপাড় শাড়ী পরিধানে, ঘাসের উপর আলতা-রাঙা পা ফেলিয়া একগলা ঘোমটা টানিয়া অদূরবর্ত্তী নেড়া বেলতলায় স্বামী-সাক্ষাৎ করিতে বাহির হ'ন।

রাঘব মণ্ডল সপ্তাহে দুই তিন বার সহরে যায় মনোহারী দোকানের জিনিষ-পত্র খরিদ করিতে। একটু রাত থাকিতেই তাহাকে যাত্রা করিতে হয়। প্রথম সমাচার সে-ই আনিয়াছিল। সে দিন জ্যোৎস্না রাত। ঘুম ভাঙিয়া রাঘব ভাবিল, ভোর হইয়া গিয়াছে। কাল বিলম্ব না করিয়া সে বাহির হইয়া পড়িল। এবং সেই দিনই কালী তলার পথে দেবী-দর্শন ঘটিয়া গেল।

কথাটা প্রথমে কেহ বিশ্বাস করে নাই, কিন্তু গত রাত্রে গোবিন্দ গাঙ্গুলী নিজে ঘটনা প্রত্যক্ষ দেখিয়া যখন সাক্ষ্য দান করিলেন—তখন আর অবিশ্বাস করিবার উপায় ত রহিলই না, কণ্টকিত গাত্রে উপস্থিত সবাই বারম্বার সেই অদ্ভুত দেবীর উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করিতে লাগিল।

জগাই চক্রবর্ত্তী আরক্ত নেত্র আনত করিয়া বলিলেন, সন্তানের অপরাধ নিয়ো না মা! মা গো!

মন্দিরের সেবাইৎ বৃন্দাবন সাশ্রুনেত্রে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, কৈবল্যদায়িনী, পূজায় তোর কি বিঘ্ন ঘটল মা! অবোধ সন্তানকে জানাবি নে!

উপেন বলিলেন,—জানাবেন বই কি ভট্‌চায মশাই! মায়ের স্নেহ কি এত অল্পে দূর হয়।

কেবল চুপ করিয়া রহিলেন, গোবিন্দ নিজে। বাড়ীতে তার ছোট নাতির অসুখ। গ্রামের মধ্যে ডাক্তার-বৈদ্যের বালাই নাই। সে কারণে গাঙ্গুলী গত রাত্রের শেষ প্রহরে নাতিকে দুই দেওয়া গরুর গাড়ী করিয়া সহরে লইয়া যাইতে ছিলেন। গো-শকট কালীতলার নিকটবর্ত্তী হইতেই কি এক দুর্ভর আশঙ্কায় তাঁহার হাত পা ভারি হইয়া আসিল, বাতাসে ফুলের গন্ধ আসিতে লাগিল এবং মনে হইল অদূরের একটা ঝোপের আড়ালে কাহারা যেন কথা কহি-তেছে। গোবিন্দ নিমেষের জন্য একবার সেই দিকে

দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন—এবং তাহাতেই সুস্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন, টক্‌টকে রাঙা পাড় একখানা শাড়ী বন মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

বৃন্দাবন সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—তোমরা দশজন আজ একত্র হয়েচো, একটা উপায় বলে দিয়ে যাও! একটা শান্তি স্বস্ত্যয়ন, কিম্বা—

উপেন কহিলেন,—মোষ বলি হোক।

এ ব্যবস্থায় আপত্তি করিলেন জগাই।—আরে না, না। ও কি একটা কথা! ন' দেবায় ন ধর্ম্মায় চ'! বলি হয়, পাঁঠা বলি হোক। কি বল হে?

কেহ কিছু বলিলেন না, কিন্তু বোঝা গেল আপত্তি কাহারো নাই। পাঁঠা মহাপ্রসাদ বলিয়া খাওয়া যায়, কিন্তু ...

গোবিন্দ প্রশ্ন করিলেন,—এ পূজোটা দিচ্চে কে?

উপেন কহিলেন,—গ্রামের সবাই। এ' যে সকলের কাজ!

বৃন্দাবন বলিলেন,—পরশু মঙ্গলবার, দিনটে ভাল,—সেই দিনই—?

জগাই বলিলেন,—অবশ্য। শুভস্য শীঘ্রম্!

গোবিন্দ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন,—কিন্তু আমায় ভাই ছাড়ান দিতে হবে, ক্ষুদিরামের চিকিচ্ছের জন্যে শেষ গাইটি পর্য্যন্ত আজ ডাক্তার সাহেবের হাতে দিয়ে এসেছি। ... তবে, উপস্থিত তোমাদের কেউ যদি ওটা দিয়ে দাও ত' আমি সময় মত চুকিয়ে দেব। বলি, ক্ষ্যাপা বেটীকে ক্ষ্যাপাতে সাহস করাও ত ঠিক নয়!'

গোবিন্দ যুক্ত করে ক্ষ্যাপা বেটীকে প্রণাম করিলেন।

বৃন্দাবন বলিলেন, তাতে কি গাঙ্গুলী মশাই, আপনার ভাগের ভার আমার উপর রইল!

গোবিন্দ খুসী হইয়া খড়ম খুঁজিতে লাগিলেন। সভা ভাঙিল।

মন্দির-সংলগ্ন ছ'টী প্রশস্ত চালাঘর লইয়া ক্ষ্যাপা কালীর সেবাইৎ বৃন্দাবনের বাস। বৃন্দাবনের সহধর্ম্মিণী বহুকাল পূর্ব্বে স্বর্গীয়া হইয়াছেন। ব্রাহ্মণের সংসার বলিতে লোকে এখন তাহাকে এবং তাহার একমাত্র কন্যা রমাকেই বোঝে।

রমার বয়স কুড়ি। দেবীর ভোগ রন্ধন হইতে ধূপ দেওয়া পর্য্যন্ত সব সে একাই করে। ছেলেবেলায় গাঙ্গুলীর মধ্যম পুত্র পরেশের সহিত তাহার বিবাহের ঠিক ঠাক হইয়াছিল, তারপর কোনো কারণে সে বিবাহ আর হয় নাই। গাঙ্গুলী পরেশকে লেখা পড়ার জন্য কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন, আর বৃন্দাবন কন্যার বিবাহ দিলেন—শান্তিপুরের এক বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থ পরিবারে। কিন্তু এক বৎসরও গেল না, রমা এক দিন শ্বেত বস্ত্রে শূন্য হাতে পিতার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই হইতে সে বেলপুকুরেই রহিয়া গেছে।

পাড়ার শীর্ষস্থানীয়েরা চলিয়া গেলে রমা পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, কি ঠিক হোল বাবা?

বৃন্দাবন কহিলেন, আপাতত সামনের মঙ্গলবারে মায়ের কাছে জোড়া পাঁঠা নিবেদন করা, তারপর মায়ের যা ইচ্ছা?

রমা অল্পক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর যুক্ত করে দেবীর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বলিল, কি যে মায়ের মনে আছে! রাত্তিরে চোখের পাতা এক করতে পারি না।

বৃন্দাবন কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পূজায় কোনো বিঘ্ন ঘটে নি ত' মা?

রমা কহিল,—জ্ঞানে ত কিছু হয় নি বাবা, তবে ভুল হয়ে থাকে, সেই ভয়ে মায়ের শাঁখা-শাড়ী পূজো, মানত করেচি।

বৃন্দাবন মুখে কিছু বলিলেন না; মনে কি হইল তিনিই জানেন।

বেলপুকুর ব্রাহ্মণ প্রধান গ্রাম। এক কালে না কি ইহার সমৃদ্ধি ছিল। বর্ত্তমানে সেই সমৃদ্ধির স্মৃতিচিহ্নের মত অনেক পূজামণ্ডপ, অনেক আটচালা, জনহীন ধূলাকীর্ণ হইয়া পড়িয়া আছে। গ্রামে সর্ব্বসমেত পঞ্চাশ ষাট ঘরের

বসবাস। পরদিন দেবীর স্বস্ত্যয়ন—উদ্দিষ্ট যুগল ছাগশিশু ক্রয়ের সাড়া সারাগ্রামময় ছড়াইয়া পড়িল। ভীতি ও ভক্তিতে আকুল হইয়া সবাই সাধ্যমত মায়ের পূজা দিল।

মঙ্গলবার রাত্রে যথাবিহিত ঢোল-কাঁসি বাজাইয়া, ধূনা জ্বালাইয়া শান্তি স্বস্ত্যয়ন হইয়া গেল। মাস কয়েক হইতে পরেশ গ্রামেই বাস করিতেছিল, গোবিন্দ পুত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, পরেশ, যাও বাবা—ছাগল ছটীকে স্নান করিয়ে নিয়ে এসো।

শীতের মধ্য রাত্রে বয়ঃবৃদ্ধদের পুকুরে নামিয়া ছাগল নাওয়ানো যে কত বড় দুঃসাধ্য ব্যাপার গোবিন্দ তাহা ভাল করিয়াই জানিতেন। তাই পরেশের প্রতি এইরূপ আদেশ হইল।

স্নান শেষে কম্পিত-দেহ যুগল ছাগশিশুকে লইয়া পরেশ ফিরিয়া আসিল। আর একবার ঢাক-ঢোল বাজিয়া উঠিল, আশঙ্কায় কণ্টকিত হইয়া সবাই একবার করিয়া চোখ বুজিল, তারপর একে একে দুই ছাগশিশুর রক্তাক্ত মুণ্ডহীন দেহ যূপকাষ্ঠের নিকট ছট্‌ফট্ করিতে করিতে শান্ত হইয়া গেল।

রমার মুখের প্রতি চাহিয়া পরেশ কহিল, মা এবার শান্ত হ'লেই মঙ্গল। কি বল রমা?

রমা বারবার প্রণাম করিতে করিতে বলিল,—হবেন বৈ কি পরেশ-দা, মা কি পাষাণ!

মায়ের পাষাণ মূর্ত্তির অন্তরালে কোমল হৃদয় ছিল কি ছিল না তাহা ভাল বোঝা গেল না বটে, কিন্তু উপদ্রব বাড়িয়াই চলিল। সে দিন অতি-প্রত্যুষে নিমাই বাগ্‌দী মাঠে একটা অপরিহার্য্য প্রয়োজন সমাধা করিতে গিয়াছিল, ফিরিবার সময় সে স্পষ্ট দেখিয়াছে ৺নকুল ভট্টাচার্য্যের পোড়ো পূজাবাড়ী হইতে বাহির হইয়া মা সরাসর কালী বাটীর দিকে চলিয়া গেলেন!

সুতরাং আবার সভা বসিল, আবার আলোচনা চলিল।

উপেন বলিলেন,—তখনই আমার সন্দ হয়েছিল। কামার বেটা খাঁড়া হাতে করে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল—তোমরা কেউ লক্ষ্যই করলে না! কার পাপে কি হয়—কে জানে ভাই!

জগাই বলিলেন,—সত্যি কথা। আর একবার—

আর একবার পশু বলি হইলে মহাপ্রসাদ পাওয়া যাইত সন্দেহ নাই, কিন্তু দেবীর নিশি ভ্রমণ যে তাহাতেই প্রশমিত হইবে—এ আশা আর কাহারো ছিল না। সুতরাং জগদীশের ঐ প্রস্তাব আমল পাইল না।

উপেন বলিলেন,—মায়ের কাজে বাধা দেওয়া উচিত কি না—সে কথাটাও ভেবে দেখ।

বৃন্দাবন বলিলেন,—অপরাধই যদি কিছু হয়ে থাকে ত' শান্তি স্বস্ত্যয়নেও কি মা তুষ্ট হ'লেন না। আমার সন্দেহ হয়—

সেবাইৎ কি সন্দেহ করেন শুনিবার জন্য সবাই উদ্‌গ্রীব হইরা উঠিল।

বৃন্দাবন বলিলেন,—একবার ভাল করে লক্ষ্য করা উচিত।

কি লক্ষ্য করা? সকলে প্রশ্ন করিল।

বৃন্দাবন বলিলেন,—তিনি যে দেবীই—শুধু এইটেই কি বিশ্বাস করতে বলো?

উত্তেজনায় আশঙ্কায় সবাই চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

তবে?

বৃন্দাবন বলিলেন,—আজ রাত্রে আমি মায়ের সঙ্গে দেখা করব; যদি দেখা পাই, পায়ে ধরে ক্ষমা চাইব—

এ প্রস্তাব সবাই ভাল বলিয়াই বিবেচনা করিলেন।

—কিন্তু একলা যেতে সাহস হয় না ভাই, আর কেউ ...

গোবিন্দ বলিলেন,—ক্ষুদিরামের ব্যায়রাম না হ'লে ...

জগাই বলিলেন,—পেসাদীর মা আবার আজকেই নিমন্ত্রণ করে গেল, নইলে ...

উপেন কি আপত্তি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া হঠাৎ হাঁচিতে সুরু করিলেন।

বোঝা গেল, দেবভক্তি ইহাদের যত বড়ই প্রবল হউক, জীবন্ত দেবী-দর্শন করিবার সাহস ও প্রয়োজন কাহারো নাই। কিন্তু বৃন্দাবন ছাড়িলেন না, একজনকে সঙ্গে তাঁহার চাইই!

জগাই কহিলেন,—গেরস্তর মেয়ে খরচপত্তর করে রেঁধে বেড়ে বসে থাকবে, নইলে ... তা', গোবিন্দ-দা', তোমার ক্ষুদিরাম ত' সহরে ... তুমিই কেন ... ?

গোবিন্দ আপত্তি করিতে যাইতেছিলেন, বৃন্দাবন একেবারে তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন।

—গাঙ্গুলী মশাই এ যে সকলের কাজ—আপনি যদি এমন ...

উপেন বস্ত্রের সূক্ষ্ম প্রান্তভাগ নাশা-গহ্বরে প্রেরণ করিয়া দিয়া বলিলেন,---বটেই ত'!

তারপর বিস্তর অনুনয়-বিনয়ের পর গোবিন্দ যাইতে রাজী হইলেন। স্থির রহিল, রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বে এ' প্রস্তাব আর কাহারো নিকট ব্যক্ত করা হইবে না।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের পর গোবিন্দ আসিয়া বৃন্দাবনের দরজায় ডাক দিলেন। বৃন্দাবন জাগিয়াই ছিলেন, দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া আসিলেন।

—ছাতা কেন গাঙ্গুলী ?

গাঙ্গুলী বলিলেন,—বালাপোষটা খুঁজে পেলাম না তাড়াতাড়ি ... ঠাণ্ডার ভয়ে ছাতিটাই ··· এসো, এসো!

বৃন্দাবন বলিলেন,—দাঁড়াও ভাই, রমা ও-ঘরে ঘুমুচ্চে—একবার ডেকে দিয়ে আসি, সজাগ হয়ে থাক।

গাঙ্গুলী শীতে কাঁপিতেছিলেন বলিলেন, দরকার নেই, এসো, রাত চলে বুঝি ভোর হয়ে এল। বেজায় ঠাণ্ডা!

গোবিন্দ ভট্টাচার্য্যের হাত ধরিয়া টান দিলেন। অগত্যা বাহির হইতে শিকল তুলিয়া দিয়া বৃন্দাবন দেবী-দর্শনে যাত্রা করিলেন। রমা ঘুমাইয়াই রহিল।

পথে একটা লোক নাই; অন্ধকারের মধ্যে গাছ-পালাগুলি রূপকথার দৈত্যের মত মহাবাহু বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দূরে কোথায় একদল ঘুম-ভোলা কুকুর চীৎকার করিয়া পল্লীর শান্তি-রক্ষা করিতেছে। উভয়ে একটা পড়ো মেটে বাড়ীর আড়ালে গিয়া দাঁড়াইলেন! দেবী কোন্ পথ দিয়া আসিবেন, কোথায় প্রবেশ করিবেন উভয়ে মনে মনে বোধ করি তাহারই জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিলেন।

অদূরস্থিত স্বর্গীয় নকুল ভট্টাচার্য্যের পরিত্যক্ত জনহীন পূজা-বাড়ীটায় হঠাৎ একটা আলো দেখা গেল, রাঙা শাড়ীর প্রান্ত এবং আরও একটা মূর্ত্তি ··· !

বৃন্দাবন কহিলেন --দেখলে?

গাঙ্গুলীর শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইতেছিল, বলিলেন, হুঁ--- ...

বৃন্দাবন বলিলেন,—এগোও ...

ছাতাটা জোর করিয়া দুই হাতে চাপিয়া গাঙ্গুলী বলিলেন,—বেজায় ঠাণ্ডা ... আর ... অনিষ্ট হয় যদি কিছু ... এ্যা?

বৃন্দাবন বলিলেন,—না, গোবিন্দ, আমাদের অভিপ্রায় ত' মন্দ নয়! কোনো ভয় নেই!

বৃন্দাবন গোবিন্দকে টানিয়া লইয়া চলিলেন। ভট্টাচার্য্যের মনে তখন কি হইতেছিল জানি না, গাঙ্গুলী চক্ষু মুদিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে কল্পনা করিতে লাগিলেন- সেই রাঙা শাড়ী এখনই কৃষ্ণাবরণা, মুক্তকেশা, নরমুণ্ডমালিনীর মূর্ত্তিতে রক্ত জিহ্বা বিস্তার করিয়া 'সংহার'রব করিয়া উঠিবে আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে এই শীতের রাত্রে পথে পড়িয়া মৃত্যু বরণ-করিতে হইবে! বালাপোষটাও গায়ে থাকিবে না!

উভয়ে যখন পূজা-বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, গোবিন্দের অর্দ্ধেক জীবনীশক্তি তখন ব্যয় হইয়া গেছে। বৃন্দাবন বলিলেন, এইখানেই অপেক্ষা কর গোবিন্দ, মা যেই সিঁড়ি দিয়ে নামতে যাবেন, অমনি দু'পা জড়িয়ে ধরব!

তারপর উভয়ে রুদ্ধশ্বাসে সেইস্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন, হিমে সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া ভারী হইয়া উঠিল। গোবিন্দ কবে, কতক্ষণ পূর্ব্বে এই স্থানে আসিয়াছেন সব বিস্মৃত হইয়া গেলেন! মনে হইল, অনন্তকাল হইতে তিনি এমনি প্রতীক্ষা করিয়া আছেন আর এই প্রতীক্ষা এ' জীবনে কোনোদিন শেষ হইবে না।

... হঠাৎ চণ্ডীমণ্ডপ আসিবার দ্বার ভিতর হইতে খুলিয়া গেল।

গোবিন্দ রাঙা শাড়ী দেখিবেন কি মুক্ত, কালো কেশ দেখিবেন—স্থির করিতে পারিতেছিলেন না, সামনে চাহিতেই দেখিলেন চণ্ডীমণ্ডপে দাঁড়াইয়া বৃন্দাবনের কন্যা রমা আর তারই পশ্চাতে কম্পিত, নতমুখ পরেশ—গোবিন্দের পুত্র—তাঁহারই বালাপোষ গায়ে দিয়া।

রমা লালপাড় শাড়ীও পরে নাই এবং আলতাও পায়ে দেয় নাই।

*

* *

ভোর হইতে না হইতে গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বৃন্দাবনের বাসগৃহ ঘিরিয়া ফেলিলেন। কি হোল হে, বলি একটু খুলে বল, কি রকম করে জড়িয়ে ধরলে পা .. ইত্যাদি প্রশ্নে গোবিন্দ ও বৃন্দাবন অস্থির হইয়া উঠিলেন।

অবশেষ গোবিন্দ বলিলেন,---বাপ! শেষরাত্তিরে এই পৌষমাসের শীতে ... মা কি দেখা না দিয়ে পারেন! ভট্‌চার্য্যি মশাই ত' ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগলেন, ... বল্‌ মা, কি পাপে ... ? মা বললে,---তোর মেয়ের দোষেই আমার মন টেঁকে না। বড় নোংরা ... ওকে আমার কাজ করতে বারণ করিস্—আর—বলনা ভট্‌চায—

বৃন্দাবন বলিলেন,—আর ... পরেশ যেন গ্রামে না থাকে, কলকেতায় গিয়ে সে ম্লেচ্ছ হয়ে এসেছে দেশে ওর স্থান নেই ...

জগাই জিজ্ঞাসা করিলেন,-- শান্তি-স্বস্ত্যয়ন ... জীববলি এ সব—?

গোবিন্দ বলিলেন, না ভায়া, মায়ের আদেশটুকু পালন করলেই তিনি সন্তুষ্ট হ'বেন।

প্রত্যক্ষ দেবী-দর্শনে পুণ্যবান গোবিন্দ ও বৃন্দাবনকে সবাই নত হইয়া প্রণাম করিল।

পর-স্ত্রী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিজয়া দশমীর রাত্তির এগারোটা বেজে গেল—বন্ধুরা একে একে সম্ভাষণ সেরে নিয়ে সকলেই বিদায় নিল—তবু অরুণ তেমনি ভাবে পাথরের মত বসে রইল। হাতের মুঠোর ভেতর আধখানা ছেঁড়া একখানা মলিন সবুজ কাগজে লেখা চিঠিটা বারবার নিস্পেষণে প্রায় অস্তিত্ব হারাবার উপক্রম করেছিল—তাড়াতাড়ি সেটাকে টেবিলের ওপর ছড়িয়ে পেতে—ড্রয়ার থেকে একটা Magnifying Glass বার করলে। সবুজ কাগজের পাতায় আঁচড় কাটা কটা কথার সম্পূর্ণ অর্থটুকু কিছুতেই সে খুঁজে পাচ্ছিল না—কাঁচ দিয়ে ভাল করে এ-পিঠ ও-পিঠ উল্টে—কোনগুলো লক্ষ্য করে—তুষ্টি আর কিছুতে পেলে না—শেষে নিরুপায় হ'য়ে ডাকলে—বীণা!

সন্ধ্যা থেকে বীণা স্বামীর বন্ধুদের পরিচর্য্যায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল—এই মাত্র সে অন্য ঘরে গিয়ে খোকার আহারের ব্যবস্থা করছিল—হঠাৎ স্বামীর এই অপ্রত্যাশিত রুক্ষ স্বরে বিস্মিত হয়ে দ্রুতপদে ছুটে এল। দরজার সামনে আসতেই স্বামীর চোখের তলায় মোড়ান কাগজটার ওপর সব চেয়ে আগে নজর পড়্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত

রক্ত শুকিয়ে মুখখানা পাথরের মত সাদা হয়ে গেল। কোনও মতে দরজার হাতোলটা ধরে পড়ার হাত থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে প্রবল উদ্যমে নিজেকে সামলে নিয়ে ধীর ভাবে জিজ্ঞেস করলে—কি বলছ? অরুণ শুষ্ক দৃষ্টিতে সমস্ত ব্যাপারটা তীক্ষ্ণ ভাবে লক্ষ্য করছিল, তীব্র বিদ্রূপের ভঙ্গিমায় ওষ্ঠাধর সম্বদ্ধ করে বল্লে—কি বীণা, চিঠিটা চিনতে পার?

উৎকণ্ঠিত আগ্রহে বীণা চিঠিটা ছিনিয়ে নিতে গেল, অরুণ আগে থাকতেই বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেল্লে। পরে কঠিন ব্যঙ্গের স্বরে বলে উঠল—হ্যাঁ যা ভাবছিলাম—তাই সত্যি। ঘরটা কি গরম! অসহ্য বোধ হচ্ছে,আর পারি না। শেষে বিজনটা এতবড় Scoundrel হবে তা ভাবতে পারি নি! ও কি মাটিতে লুটিয়ে পড়লে কেন বীণা? অস্বীকার কর এ চিঠি সত্যি নয়! বল'—মুখে হেসে মনকে লুকিয়ে বল'!—না তোমারই বা দোষ কি—যা সেই—ও কি বাইরে এত রাত্রে ডাকে কে?

অরুণ—অরুণ—অরুণ, বাড়ী আছ?

বাহিরের অপ্রত্যাশিত কণ্ঠস্বরে বীণা শঙ্কায় লজ্জায় নিজেকে আর সামলাতে পারল না। কোনও মতে বিপুল বলে ছুটে গিয়ে নিজের ঘরে দরজা দিল। অশ্রুর বন্যায় ভাবনার কূলকিনারা না পেয়ে শুধু অনিশ্চিত কি একটা অতি ভীষণ ঘটনা মুহূর্ত্তের মধ্যে ঘটে উঠবে—এই আশঙ্কায় মূঢ়ের মত পড়ে রইল।

সিঁড়ির উপর বিজনের কণ্ঠস্বর আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল—কি রে বীণা, এরই মধ্যে সব ঘুমিয়ে পড়লি না কি? খোকা কোথায়—ঘুমুচ্ছে?

সাড়া না পেয়ে অরুণের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সহাস্যে বিজন বল্লে—কি হে অরুণ, ওঠো। সব জায়গায় সেরে আসতে ভাই বেজায় দেরী হয়ে গেল। আর তোমার এখানে সব শেষে এসে 'মধুরেন সমাপয়েৎ' করব এইটেই বরাবর ইচ্ছে ছিল।

অরুণের মুখের চেহারা দেখবার অবসর বিজনের ছিল না—দেখলে হয় ত চমকে যেত; কিন্তু যে অস্বাভাবিক বিকৃত স্বরে অরুণ উত্তর দিলে—সেটার জন্যে বিজন মোটেই প্রস্তুত ছিল না।

কিছুই নয়—অরুণ বল্লে—একটা তোমার ভয়ানক ভুল হয়ে গেছে বিজন—আমি বাড়ীতে না থাকলেই বোধ হয় তোমার বিজয়ার সম্ভাষণ সব চেয়ে সার্থক হ'ত।

বিজন আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞেস করলে—সে কি কথা অরুণ?

অরুণ বল্লে—কেন ঠিক নয়? দেখ দিকি এই চিঠিখানা চিনতে পারো কি না?

এক টুকরো ছেঁড়া কাগজের ভেতর যে মানুষের এতখানি যন্ত্রণা লুকোন থাকতে পারে তা অরুণও কল্পনা করতে পারে নি—সেই মুহূর্ত্তে বিজনের মুখের চেহারা দেখবার আগে পর্য্যন্ত। মৃত্যুকল্পী লোকের শেষ আশ্রয়টুকু হারানোর পর অন্তিম দীর্ঘশ্বাসের মত একটা প্রচণ্ড নিঃশ্বাস ফেলে অপরাধীর আত্মসমর্পণেরই সমান ম্লান স্বরে বিজন বল্লে—এ চিঠি তুমি কোথায় পেলে?

কোথায় পেলুম—সে কথা শুনে তোমার লাভ নেই—তবে পাওয়াটা আমার পক্ষে অভিশাপ, না বর সেটা এখনও ঠিক করতে পারি নি।

বিজন পূর্ব্বের মতই ম্লান স্বরে বল্লে—আমি জানতুম ও চিঠির অস্তিত্ব পৃথিবী থেকে লোপ পেয়েছে—কিন্তু—

অরুণ ক্ষিপ্ত স্বরে বলে উঠল—ঐ কিন্তুটাই আজ সত্যি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে বিজন! ভেবেছিলে সমস্ত চিহ্নই মুছে ফেলেছো। কিন্তু মেয়েমানুষের অসাবধানতা অকস্মাৎ আজ সত্যের ছবি প্রকাশ করে দেবে তা ভাবো নি। একখানা চিঠি আজ বীণার বালিশের তলা থেকে বেরুল। কিন্তু ঐ একখানা চিঠিই আরও শত শত চিঠির সাক্ষ্য দিচ্ছে।

বিজন মৃদুভাবে ঘাড় নেড়ে বল্লে—না, অতটা সর্ব্বনাশ কল্পনার কারণ নেই, অরুণ বাস্তবিকই আমি অপরাধী সত্যি—কিন্তু—

বাধা দিয়ে অরুণ বল্লে—কিন্তু আর আমি শুনতে চাই না। শুধু সত্যি কথাটুকু জানতে চাই। দুবছর ফ্রান্সে কাটিয়ে এলুম, তোমার সঙ্গেই একসঙ্গে চন্দননগর থেকে গিয়েছিলুম। পাশাপাশি একই field-এ দাঁড়িয়ে একই সঙ্গে মরণকে সামনে করে দাঁড়িয়ে কামান ছুঁড়লুম

—একই সঙ্গে মরণের সুমুখে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম বিজন! বাড়ী ফিরে এসে দেখলুম—সবই তেমনি রয়েছে, কিন্তু একটা কি নেই! আজ হঠাৎ তুচ্ছ দৈনন্দিন খুঁটিনাটি কাজের মাঝখানে এমন একটা ঘটনা ঘট্‌ল—যা কল্পনারও অতীত। সত্যি বীণাকে আমি যতখানি বিশ্বাস করতুম এতখানি বিশ্বাস বোধ হয় কেউ কর্‌তে পারে না। আর —না—আমি অনুরোধ কর্‌ছি বিজন, সমস্ত কথা আমায় খুলে বল, আমার মনের অবস্থা বোধ হয় কল্পনা কর্‌তে পার্‌বে—

বাঁ হাত দিয়ে বুকটা চেপে ধরে ক্ষীণ কণ্ঠে বিজন বল্‌লে—হ্যাঁ, সমস্ত কথাটাই তোমাকে বলব। অনেক আগেই—উঃ একটু দাঁড়াও ভাই! সেই বুকের ব্যথাটা আমার হঠাৎ খোঁচা দিয়ে উঠ্‌ল—হ্যাঁ—এক গ্লাশ জল খেয়ে নিই আগে, তোমার ঘরে কুঁজো ছিল না—

বিজনের মুখের দিকে তাকিয়ে অরুণ ভয়ে শিউরে উঠ্‌ল! মনে হ'ল যেন সেই মুহূর্ত্তেই সে মরে যাবে। তাড়াতাড়ি উঠে বিজনকে ধরাধরি করে বিছানার ওপর বসালে, পাশের সোরাই থেকে এক গ্লাশ জল এনে তাকে দিয়ে বল্‌লে—থাক, একটু ঘুমিয়ে পড় বিজন—আমি কি বল্‌ছিলাম—

একনিঃশ্বাসে অরুণের দেওয়া সমস্তটুকু জল খেয়ে বিজন উঠে বসে বল্লে—না, ও কিছু না, আমি বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছি। কি বিশ্রী এই ব্যথাটা—হ্যাঁ বল্‌ছিলুম কি—ও কি বোসো ঠিক হয়ে ওই চেয়ারটায়—হ্যাঁ বল্‌ছিলাম কি, সে অনেক দিন আগেকার কথা অরুণ—তাই বলে নিজের কৈফিয়ৎ দেবার মত কিছুই নেই। তোমাকে বল্‌বো আজ—

অরুণ উত্তেজিত হয়ে বল্‌লে—একেবারে সম্পূর্ণ সত্যি কথা টুকু—সমস্তটা, একটুও বাদ দিয়ো না।

অন্তরের তীব্র আগ্রহ কথার প্রতি-ভঙ্গিমাতে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠ্‌ছিল! ঘরের ভিতর দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন আকৃতির প্রাণী, অথচ ঠিক সেই সময়ের উত্তেজনা ও বেদনার ভঙ্গীতে দুজনকে আশ্চর্য্যরূপ সমান দেখাচ্ছিল। এক জনের স্বাভাবিক সুগৌর সহাস্য মূর্ত্তি অপরের দৃঢ় তীক্ষ্ণ অবয়ব মানষিক অপ্রকৃতিস্থতায় একইরূপ বিকৃত ও বিহ্বল।

বিজন বল্‌তে আরম্ভ করলে—তুমি জানো নিশ্চয়ই অরুণ, ছেলেবেলা থেকেই বীণার সঙ্গে আমার জানা-শোনা। আমাদের পাশের বাড়ীতেই সে থাকৃত—আমারই সঙ্গে বীণা বল্‌তে গেলে একরকম মানুষ হয়েছে। ছেলেবেলা থেকেই ও কেমন যেন একটু অন্য রকমের মেয়ে ছিল। পুতুল খেলা ছেড়ে আমার কাছে এসে গল্প শুন্‌তেই ওর বেশী ভালো লাগ্‌ত। আমিও দিন রাত কত গল্পই ওকে বলেছি—আমার নিজের পড়ার বইয়ের সমস্ত ভাল ভাল কাহিনী ওকে বলে বলেই পড়া তৈরী করেছি। ও তার কতদূর বুঝতো জানি না; কিন্তু আমার ওই গল্প করার একটা নেশা ছিল। তবে সেটা সেইখানে গিয়েই শেষ হয়েছিল। আমি জানতুম, আমাদের সেই আলাপের ভেতর দোষের কিছু ছিল না—তাই যেমনি অসঙ্কোচে আমি তার সঙ্গে মিশ্‌তুম—তেমনি সরল ভাবেই সে আস্‌ত।

ক্রমে সে একটু একটু করে বড় হ'ল, অনেক জিনিষ বুঝ্‌তে শিখ্‌লে, কিন্তু আমার কাছে সঙ্কোচ কোনও দিন সে করে নি। মনে মনে বীণা কি ভাব্‌ত তা ভাব্‌বার অবসর আমার কোনও দিনই হয় নি, কারণ ক্রিকেট খেলা ও বায়স্কোপের রেকর্ড করবার অত্যধিক আবশ্যকটা আমাকে বেশীর ভাগই ব্যাপৃত রেখেছিল। তার ওপর বিদেশের মোহটা মাঝে মাঝে এসে মনের কোণে উঁকি মারত। মেরুপ্রান্তে অরোরার ইন্দ্রধনু—নরওয়ের নিশীথ সূর্য্য—সুইটজারল্যাণ্ডের তুষার অভিযান—মেক্সিকোর Cow boy—ব্রেজিলের Amazon নারী—এরা আমাকে প্রায়ই ডাকত।

ও কি, তুমি ছট্‌ফট্‌ করছ কেন? ভাল করে বুঝিয়ে না বল্‌লে ত তুমি বিচার কর্‌তে পার্‌বে না। হ্যাঁ—কি বল্‌ছিলুম—তাই দক্ষিণ আমেরিকায় পালাবার যে দিন সুবিধে পেলুম, সে দিন আর আমাকে কেউ আট্‌কাতে পার্‌লে না।

পালাবার আগের দিন রাত্তিরে বীণা আমাদের বাড়ী এসেছিল। দুজনে একলা ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত গল্পই করলাম, রোজকার মত হাস্‌তে হাস্‌তে বীণা

কত অনুযোগ আব্‌দারই না করলে। গল্প করতে করতে কত রাত্তির হয়ে গেল—হ্যাঁ এখনও আমার স্পষ্ট মনে পড়্‌ছে, উজ্জ্বল জ্যোৎস্নার তলায় বীণার নিবিড় চোখ দুটি আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি রকম জলে ভরে এল—ঠিক বিদায় নেবার আগে। এখন আমার মনে হয় সেই একটি মুহূর্ত্ত এসেছিল—যখন আমাদের দুটি উন্মুখ তরুণ জীবন পরস্পরকে আত্মসমর্পণ করবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল—দুইটি ওষ্ঠাধর নিয়ত মিলনের তরে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। আমার মনে পড়ে সেই মুহূর্ত্তের চাঁদের মায়াতে আমিও নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু বীণার কাছ থেকে বিদায় নিলাম, ঠিক তেমনি—অপূর্ণ আলিঙ্গনের শূন্যতা নিয়ে।

কোনও দিন আমি নিজেকে ভাল করে বিচার করতে শিখি নি; কিন্তু আমি এইটুকু স্থির জানি, তার পরের সমস্ত জীবন সেই না-দেওয়া না-পাওয়া একটি চুম্বনের জন্য কেঁদেছি। হয় ত সে সময় বীণা সরে দাঁড়াত—হয় ত—তবুও আমি নিজেকে কিছুতেই সান্ত্বনা দিতে পারি নি—এই সম্ভাবনায়—হয় ত সে-দিন সেই চুম্বন আমি গ্রহণ করতে পারতুম; কিন্তু করি নি।

বিদেশে গিয়ে বীণাকে একটি কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলাম, আমার স্মৃতি তার মন থেকে মুছে ফেল্‌তে অনুরোধ করে। ছেলে মানুষীর ঝোঁকে নিশ্চয়। তারপর প্রায়ই চিঠি লিখ্‌তাম, আমার ঘুরে বেড়ানোর কীর্ত্তি, কাহিনী বোঝাই করে। সে সব চিঠি তার কাছে পৌঁছত কি না জানি না, তবে প্রায় তিন বছর পরে বিজয়ার নমস্কার জানানো, এক চিঠি পেলুম। তখন তার বিয়ে হয়ে গেছে।

বিজন একটুখানির জন্যে চুপ করে অরুণের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে, সে যেন অন্যমনস্ক হয়ে পরপর ঘটনাগুলো শূন্য দৃষ্টিতে মিলিয়ে নিচ্ছে—তারপর আবার বলতে আরম্ভ করলে—

—সেই ছোট নমস্কারি-চিঠির ভিতর একটা জিনিষ বড় স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলুম। কিছুই লেখে নি তোমার কথা—তবুও তার প্রতিকথার আড়ালে—তোমার প্রতি অগাধ ভালবাসা ফুটে বেরুচ্ছে। সেই চিঠিতেই দেখ্‌লাম, আগেকার চেয়ে সে ঢের বেশী কথা কইতে শিখেছে। সংসারের কত কথাই লিখেছে। তুমি গরীব, সে কথা সে গ্রাহের মধ্যেই আনে না—কেমন অল্প খরচে গুছিয়ে সংসার করতে শিখেছে—এই খবরটাই সে বেশী করে দিয়েছিল! পড়্‌তে পড়্‌তে আমার নিজেরই হাসি আস্‌ছিল—সেই অতটুকু মেয়ে এর মধ্যে এত গিন্নী হয়ে গেল।

যাই হোক, সংবাদটা মনে একটু ঘা দিলেও অভিভূত হয়ে পড়ি নি মোটেই, কারণ পৃথিবী তখনও রঙিন হয়েই আমার কাছে ধরা দিয়ে ছিল। তার একবছর পরে আমি দেশে ফিরি। ফেরবার প্রথম দিনই বিকেল বেলা বীণার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তখন তোমরা বরানগরের বাড়ীতে থাক'। আমি যেতেই বীণা তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলে—কোলে তোমার ছেলে।—উঃ আবার সেই ব্যথাটা—

হাত দিয়ে বুক্‌টা চেপে ধরে বিজন খানিকক্ষণের জন্য চুপ করে রইল। অরুণ অধীর হয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—ও কি চুপ করলে কেন—বলে যাও। ক্ষীণ স্বরে বিজন বল্‌লে—বল্‌ছি ভাই, একটু দাঁড়াও—বুক্‌টা চিরে হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়ে হাতে করে আর এক জনের চোখের তলায় ধরা যে কি যন্ত্রণা—তা জান না। আমার যতদূর সম্ভব সম্পূর্ণ টুকু চেষ্টাই করছি অরুণ!—হ্যাঁ সেই দিন, সেই গোধূলির স্বর্ণোজ্জ্বল ছটায় নতুন আলোয় নতুন মূর্ত্তিতে বীণাকে সেই দেখ্‌লুম—সেই মুহূর্ত্তে সেই সব চেয়ে বড় সত্যি কথাটা মনের মধ্যে অনুভব করলুম, বীণাকে কি ভয়ানক ভালবাসি।... ও কি, চম্‌কে উঠো না—স্থির হয়ে শোনো। হ্যাঁ—সে আমাকে দেখে যে পর্য্যন্ত আনন্দিত হয়েছে—তা বুঝ্‌তে পারছিলাম; কিন্তু সমস্তক্ষণ সে তোমার কথাই কইতে আরম্ভ করলে, ছোট্ট সংসার পেতে সে কেমন আনন্দে আছে—আমি বেশ অনুভব করতে লাগ্‌লাম। আমি যখন বল্‌লুম—আমি বেশীক্ষণ থাকতে পারব না—তোমার সঙ্গে দেখা করবার সময় নেই—সে ভয়ানক দুঃখিত হ'ল।

সেই রাত্রেই আমি কল্‌কাতা ছেড়ে পালালাম। এই স্মৃতি মুছে ফেল্‌বার পালা—আমার তরফ থেকে সুরু হ'ল।

মনের জ্বালায় সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করলাম। কিছুতে তৃপ্তি না পেয়ে ব্যবসা করতে গেলাম। অদৃষ্টের ভণ্ডামিতেই হোক্, বা আমার নিজের টাকার দিকে ভ্রূক্ষেপ না থাকার জন্যেই হোক্—টাকা হু হু করে আস্তে লাগ্‌ল। তারপর একদিন মজার কথা—অমৃতসহরের এক মেয়েকে বিয়ে করে ফেল্‌লাম।

হঠাৎ অরুণের মুখের কোণে একটু ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠ্‌ল।

বিজন বল্‌লে—সত্যি হাসবারই ত কথা বটে, আমার বিয়ে--ভাবো দিকি; কিন্তু সে বিয়েতে আমি ঠিক বল্‌তে পারি অলক্ষ্যে কোন দেবতাই সাক্ষী ছিল না—হোমের আগুনে অগ্নিদেব নিশ্চয়ই অবিভূত হ'ন নি। তার চেয়ে বেশী অপবিত্র অনুষ্ঠান তোমরা বোধ হয় কল্পনাতেই আন্‌তে পার্‌বে না। আমার তরফ থেকে কোনও ত্যাগই স্বীকার করতে হয় নি, কারণ আমার টাকা ছিল,আর আমার সঙ্গিনীর তরফ থেকে কোন আবেগই খরচ কর্‌তে হয় নি, কারণ সেইটেই তার অভাব ছিল। সে দেখ্‌তে খুবই সুন্দর ছিল, কিন্তু সে সৌন্দর্য্য ছিল ঠিক বেলোয়াড়ী কাঁচের মত—সূর্য্যের আলো পড়্‌লে যাতে ভ্রম হয় নানা বর্ণের কত মূল্যবান মণিমাণিক্য বুঝি লুকোন আছে; কিন্তু সত্যি যাতে কিছু নাই, এমন কি যার ওপরে কোনও আঁচড়ই পড়ে না। একবার-যে বীণাকে ভালবেসেছে—সে যে কেমন করে অমন মেয়েমানুষকে বিয়ে করতে পারে এর চেয়ে বেশী আশ্চর্য্য হবার বোধ হয় কিছুই নেই; কিন্তু মজার কথা, পৃথিবীর রহস্যমালার এইটেই একটা প্রধান অংশ যে, অমনি ধারা কাজ আমরা মাঝে মাঝে করি।

দুর্ব্বিসহ জীবনের যন্ত্রণা তা নইলে জুট্‌বে কেন! বেশী দিন যেতে হয় নি, বুঝ্‌তে পার্‌লুম কি করেছি। জীবনের যে কতখানি অভাব, কতখানি আশঙ্কা তা উপলব্ধি কর্‌তে বেশী দেরী হয় নি কিন্তু কি কর্‌ব তখন ফাঁসি পড়েছি। আমার সঙ্গিনীর বাইরের সেই চক্‌চকে প্রস্তরের আবরণ কখনও ভেদ করতে পারি নি, পারলেও তার নীচে কিছু পেতুম কি না বিশেষ সন্দেহ। থেকে থেকে আমার ঘূর্ণী রোগটা আমায় পেয়ে বস্‌ল।

তারপর প্রতি পল, অনুপল—দুঃখ ক্ষোভ অনুতাপের বোঝায় দুর্ব্বিসহ হয়ে উঠ্‌ল। চোখ চাইলেই চারিদিকের জগতের কোলাহল কেবলই বেসুরো হয়ে কানে এসে লাগ্‌ত, চোখ বুজলেই বীণার সজল চোখ দুটি ভেসে উঠে আমায় পাগল করে তুল্‌ত। এক-একবার খুব নিবিড় নির্জ্জনতার মাঝে মনে হ'ত, আমার এই মর্ম্ম-দাহী আশঙ্কা, এই জীবনব্যাপী উগ্র তৃষ্ণা, সে কি পার্থিব বাস্তব জগতকে ছাপিয়ে আমাদের আত্মায় আত্মায় মিলন সাধন কর্‌তে পার্‌বে না? আমি metaphysics কোনও কালে পড়ি নি। ... ও কি তোমার বেজায় কষ্ট হচ্ছে অরুণ ... না—তা হলে থাক ... আর আমার ...

বাধা দিয়ে অরুণ বল্‌লে—না—না- না—আমি শুন্‌ছি, তুমি বলে যাও।

বিজনের উদ্‌গ্রীব রুক্ষ বেদনা-বিক্ষুব্ধ দেহটা দেখে মনে হচ্ছিল, যেন একটা ব্রোঞ্জের মূর্ত্তি, সহসা চেতনা পেয়ে জেগে উঠেছে।

বিজন বল্‌লে—না অরুণ, আমায় এত কথা বল্‌বার কারণ হচ্ছে, আমি তোমাকে বোঝাতে চাই যে কেন আমি ফিরে এলুম। জীবনে ভালবাসা ত চিতার আগুনে পোড়ালুম। যদি একটুখানি স্নেহও কোথা থেকে পাই, তা হ'লে হয় ত এ জীবনটায় বেঁচে যাব। সবই ত বিসর্জ্জন দিয়েছি। বীণাকে একবার দেখে একটা সহানুভূতির দুটো মিষ্টি কথা যদি সম্বল কর্‌তে পারি, তা হ'লে হয় ত—হ্যাঁ, আমার অর্দ্ধাঙ্গিনীকে সংস্থানের বিষয়ে বঞ্চিত করে রাখি নি ... আর বোধ হয় ঐ একটি জিনিষই তার পৃথিবীতে কাম্য ছিল। তাই ... তারপর ত তুমি জানো ...

তোমার এখানে এসে পৌঁচলুম। তুমি কি অকৃত্রিম স্নেহ দিয়ে বন্ধুত্ব দিয়ে আমাকে ডেকে নিলে! বাস্তবিক অরুণ আমি এসে বেঁচে গেলুম—নয় ত আত্মহত্যা কর্‌তুম নিশ্চয়ই। তোমার এখানে এসে আমার কি স্বপ্নময় দিনগুলো কাট্‌তে লাগ্‌ল, আর নিজেকে আমি কি আশ্চর্য্য রকম সংযত করে চল্‌তে আরম্ভ করলুম। প্রতি ছোটখাটো কাজে, প্রতি তুচ্ছতম চলাফেরায় আমি জীবনকে যে-পথে

চালিয়ে নিয়ে যাব বলে মনে মনে এঁকে নিয়েছিলাম, শপথের মত তাই পালন করবার চেষ্টা করতুম। এমন চাহনি আমি তাকাইনি যা তুমি না দেখেছো, এমন একটি কথা আমি উচ্চারণ করি নি, যা তুমি না শুনেছ'। এক মুহূর্ত্তের জন্যে আমি বীণার সঙ্গে একলা থাকি নি, পাছে নিজেকে হারিয়ে ফেলি। বাস্তবিক এটা সত্যি কথা অরুণ, নিছক সত্যি—আরও এই কথাটা আমি তোমাকে বোঝাতে চাই পরে কি হয়েছিল। সেটা বলতে আমার বুক শুকিয়ে আস্‌ছে।

আর এক গ্লাস জল অরুণ। হ্যাঁ—আঃ—তারপর যুদ্ধ বাধ্‌ল। আঃ—আমার জন্যে যে বাংলা দেশে এমন ধারা স্বর্গের সিংহদ্বার উন্মুখ হবে তা স্বপ্নেও ভাবি নি—আমার মত এত আনন্দে যুদ্ধে যোগদান বোধ হয় এ দেশ থেকে আর কেউ করে নি—পাছে বাঙালী-পল্টনকে সত্যিকারের যুদ্ধ করতে না হয় তাই আমার সেই কোনো-দিন না-দেখা কাকার দোহাই দিয়ে চন্দননগর থেকে artillery-তে join কর্‌লুম। কিন্তু আজও পর্য্যন্ত বুঝে উঠতে পারলুম না, তুমি কি অভিশাপে সেই মরণের রাজ্যে গিয়ে পড়েছিলে। শুনেছিলুম তোমাকে Supply Transport-এর আফিস থেকে না কি পাঠিয়েছিল। তাই সেখানে গিয়ে যুদ্ধের হুজুগে মাত্‌লে কেন জানি না। তোমারও যে-দিন যাবার সব ঠিক হ'ল, তুমি বল্‌লে, একই দিনে যাত্রা করা যাবে। কিন্তু আমি বল্‌লুম—না, আমাকে তখুনি তখুনি বেরিয়ে পড়্‌তে হবে।

যাবার দিন রাত্তিরে সেই চিরস্মরণীয় রাত্তিরে আমি বীণার কাছে বিদায় নিলুম। তুমিও সে দিন সেখানে ছিলে। যাবার সময় তোমাতে আমাতে এক সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। একটু দূর গিয়েই তোমার হঠাৎ কি একটা জরুরি কাজের কথা মনে পড়ল...তাই অন্য রাস্তায় চলে গেলে—আমি বল্‌লুম আমি ষ্টেশনে যাচ্ছি...কিন্তু আমি তা যাই নি···আমি বীণার কাছে ফিরে গেলাম।

বিজন হঠাৎ চুপ করে গেল। পাশের ঘর থেকে একবার একটা অস্ফুট কান্নার ক্ষীণ শব্দ ভেসে এল। অরুণের সেদিকে লক্ষ্যই ছিলনা—বিজনকে আসতে দেখে ব্যগ্র আগ্রহে বলে উঠল—বলে যাও, বলে যাও বিজন—চুপ করছ কেন?

অতি ধীরে ধীরে প্রায় চুপি চুপি ভাঙ্গা গলায় বিজন বলতে আরম্ভ করলে—কেন আমি আজ রাত্তিরেই ফিরে গেলাম আমি নিজেই ভাল জানি না। বোধহয় হঠাৎ আমার ভয় হয়েছিল সেই রাত্তিরেই বুঝি নিঃসন্দেহ মরব। বিগত অতীত জীবনটার দিকে তাকিয়ে হয়ত একবার মনে হয়েছিল কি সীমাহীন শূন্যতা সেখানে হু হু কর্‌ছে—বিজন মরু প্রান্তরে ক্ষুদ্রতম সার্থকতার বারিকণাও বুঝি নেই—আর সেই আমি জীবনটাকে রিক্ততায় ভরেই চলেছি মরণের পথে, একটি মুহূর্ত্তেরও মধুরতম স্মৃতির সম্বল না নিয়ে—জীবনভরা ব্যর্থতার ইতিহাসে এমন একটি অতি ক্ষুদ্র স্বপ্নকণাও নেই যাকে মরণের পথের পাথেয় কর্‌তে পারি!

তবুও, তবুও অরুণ আমি এখনও বলছি—কৈফিয়ত দেবার আমার কিছুই নেই—নিজেকে সমর্থন কর্‌বার আমার কোনও অছিলা নেই—সত্যি বলছি তোমায়, ফিরে আসবার আমার মোটেই ঠিক ছিল না—কিন্তু ফিরে এসে দেখি—বীণা একলাটি বারান্দার রেলিং ধরে কাঁদছে—তারপর—তারপর সেই একটি মুহূর্ত্তের অসংযম আমার জীবনে অনুভূতির উগ্রতায় অমরত্ব দিয়েছে। আমার ব্যর্থতা আমাকে কাঙাল করেছে। আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছিল নিশ্চয় তাই সেই অবস্থায় বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ ভুলে গিয়ে শুধু তৃষিত আবেগে বীণার বিকম্পিত দেহখানি নিজের বুকের ভিতর টেনে নিয়েছিলাম। নিয়ে আমার সেই যৌবন-জীবনের অসম্পূর্ণ চুম্বন নিবেদন সম্পূর্ণ করে অন্তরের উৎস মুক্ত করে নিয়েছিলাম। তারপর সেই নিভৃত-সঞ্চিত সযত্ন রক্ষিত সংযমের পাষাণ প্রাচীর ভেদ করে যে অন্তর-নর্ম্মদা শতধারায় উৎসারিত হয়ে এল সে সর্ব্বগ্রাসী বন্যায় আমার অন্তর সম্ভ্রম সম্মান আত্মগরিমা সব হারিয়ে কোন্ অতল তলে মিলিয়ে গেলাম। আমি জানি, শতবার জানি আমার প্রেম নিবেদন করবার কোনও প্রয়োজন ছিল না, কোনও অধিকার ছিল না তবুও কেন জানি না—না আমার বলবার

কিছুই নেই অরুণ—সকলের চেয়ে আমি নিজে বেশী করে জানি আমি কতখানি অপরাধী।

বিজনের মুখ দিয়ে আর কথা ফুটল না—সে চুপ করে স্থির হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল—অরুণ কি করে কি বলে—কিন্তু সে আশ্চর্য্য হয়ে গেল—অরুণের ওষ্ঠপ্রান্ত ক্ষীণভাবে কি নিবেদন করতে গিয়েই আবার স্তব্ধ হয়ে গেল।

বিজন বলতে আরম্ভ করলে—অবিশ্যি আমি মরব বলেই আশা করেছিলাম—আর সত্যি সত্যি মরতে আমি চেয়েছিলুম বটে।

অরুণের পাংশু মুখে আবার ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠ্‌ল।

বিজন বললে—সেই যে যুদ্ধের Stripeগুলো দেখেছিলে ওগুলো আমার মোটেই প্রাপ্য নয়। আমার সাহসের পুরস্কার না হয়ে ওগুলো আমার দুঃসাহসের পরিচয়। যুদ্ধক্ষেত্রে নির্ভীকতা আমি দেখাইনি। শুধু মরিয়া হয়ে জীবনটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছি। কতবার কত দিক দিয়ে কত পথে মরণকে ডাকলুম কিন্তু মৃত্যু আর আমাকে নিলে না। শুধু এই পাঁজরার নীচে Sharpnail-এর একটা খোঁচা দিয়ে চলে গেল। তবু কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিল আমি মরব আর সেই আনন্দেই বীণাকে চিঠি লিখতুম...মনের মন্দিরে প্রকাণ্ড রাজ্য গড়ে নিয়ে। জানতুমইত মরবই মরব।

বিজনের কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ আরও নত হয়ে এল—যেন ব্যাকুল আগ্রহে কিসের প্রতীক্ষা করছে। ঠোঁটদুটো অস্পষ্টস্বরে কি উচ্চারণ করতে লাগল। অর্দ্ধস্ফুট বাক্যের মাঝে অরুণ শুনলে বিজন বলছে—“বীণাও ভেবেছিল—আমি মরব। তাই সে আমাকে মাঝে মাঝে চিঠি লিখ্‌ত। সেই চিঠিই হলো আমার অভিশপ্ত জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

অরুণ অস্পষ্টস্বরে কি উচ্চারণ করতে গেল—পারলে না। শুধু হাঁ করে বিজনের দিকে তাকিয়ে রইল। একবার মনে হ'ল—কি অদ্ভুত এই লোকটা—কি বিচিত্র তার জীবন—আর যাই হোক্ তার সামনের এই রোগা লোকটা সহিষ্ণুতার দিক্ দিয়ে কত উঁচুতে!

বিজন জোরে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে অরুণের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে—আমি বেশী দিন আর পৃথিবীতে থাকবো না অরুণ। তাই বল্‌ছিলাম—তুমি ত জীবনের সব জিনিষই পূর্ণ মাত্রায় পেয়েছো। তুমি বীণাকে ভালবাস'—বীণাও তোমায় প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। তাই বল্‌ছিলাম ভাই যদি, কোনও দিন বীণা এক মরণ পথের হতভাগ্য যাত্রীকে মনে রাখবার মত কোনও উপহার—

এক নিমেষে অরুণ চঞ্চল হয়ে চীৎকার করে উঠ্‌ল—তাই বল'—তাই বল'—এখনও বল, আজকের রাত্রে তোমার এখানে আস্‌বার এত কি—ও কি—ও কে—বিজন—বিজন—কি হ'ল—

হঠাৎ অরুণের চোখের সামনে দেখলে—প্রাণপনে একটা প্রচণ্ড আবেগের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে বিজন তীব্র আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌ল—পরক্ষণেই অন্তিম যন্ত্রণায় বিকৃত তার দেহটা চেয়ারের ওপর এলিয়ে পড়্‌ল।

লাফিয়ে উঠে অরুণ তাড়াতাড়ি বুকের বোতাম খুলে—হৃৎপিণ্ডটা পরীক্ষা করতে গেল—হঠাৎ সঙ্গোপনে লুকোন একতাড়া চিঠির ওপর হাত পড়ে চম্‌কে উঠ্‌ল—মুহূর্ত্তের এক দুর্দ্দমনীয় কৌতুহলে—অরুণের মনে হ'ল—মৃতনিথর বন্ধুর অসাড় দেহ থেকে ছিনিয়ে চিঠিগুলো দেখে—দরজার গোড়ায় বীণার উচ্ছ্বসিত চাপা কান্নায়—চম্‌কে ফিরে দাঁড়াল—সে একটুও লক্ষ্য করে নি—কখন বীণা এসে ঘরের সামনে দাঁড়িয়েছে—শুধু ফিরে দেখ্‌লে—দরজার কবাট ধরে বীণা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে যাবার মত হয়েছে। হাত বাড়িয়ে ধরতে যাওয়াতে বীণা ঘরের ভেতর এসে লুটিয়ে পড়ল। পরক্ষণেই রক্তহীন ফ্যাকাসে মুখটি তুলে উজ্জল আয়ত চোখ দুটি অরুণের চোখের উপর রেখে নীরব ভাষায় যেন জিজ্ঞেস কর্‌লে—কার এ কাজ। কে এ করলে।

অরুণ আর সইতে না পেরে ঘর ছেড়ে এগিয়ে চলে গেল। শুধু নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে অনন্ত-যাত্রীর নিস্পন্দ দেহের মধ্যে মূর্ত্তিমতী সহানুভূতি নীরবে অশ্রু-অর্ঘ্য ঢেলে কাহাকে অভিষেক করে নিলে।

ডাক্তার এসে বল্‌লে—হঠাৎ অত্যধিক মানসিক

আবেগে পুরোনো ক্ষতের মুখ খুলে গেছে—মৃত্যুও তাই এক দণ্ডও আস্‌তে বিলম্ব করে নি।

দুই

শোবার ঘরের সামনের দেয়ালে টাঙ্গানো বড় এন্‌লার্জমেণ্ট ছবির দিকে তাকিয়ে মার কোলে বসে খোকা জিগ্যেস করে—মা ও কে? বীণার সমস্ত অন্তরে উদ্বেলিত সুরে এই একই প্রশ্ন জেগে ওঠে—তাইত—ও কে? মুহূর্ত্তের আত্মবিস্মৃতির পর বীণা কথা চাপা দিয়ে খোকাকে বলে—নম কর। ক্ষুদ্র শিশু দুটী ছোট নরম হাত তুলে প্রতিকৃতিকে অভিবাদন করে।

লীলাকমল

শ্রীহেমচন্দ্র বাগ্‌চী

এ লীলাকমল দোলাব তোমারি বুকে,
নব নব কৌতুকে!

কোমল মৃণাল মৃণাল-ভুজের পাশে,
শঙ্খ-গ্রীবায় সরসী-সুরভি নিয়া,
সারা তনুখানি ব্যাপিয়া মধুর হিয়া,
সরোজ-কিশোরী ফিরিবে তোমারি আশে;
বাহির-বাঁধনে পারি না বাঁধিতে তোরে;
কোমলা, তোমায় বাঁধিব কমল-ডোরে!

অস্ফুট কোরকে রেখেছি প্রাণের তৃষা,—
শেফালিগন্ধ-মিশা।
কাশের হাসিটি সুদূর বিথারী মাঠে,
চপল মেঘের কাজল বরণখানি,
বরষা-শেষের তৃণের আসন আনি'
বিছায়ে রাখিব যতনে হৃদয়-পাটে!

নলিনী-দলের সবুজ-শয্যা পরে'
অতসী কুসুম সাজাইব থরে থরে !

উশীর-লেপনে স্নিগ্ধ কুচের চূড়া !
লোধ্র-কেশর-গুঁড়া—
পাণ্ডু কপোলে ; আনত আঁখির নীচে,
যে মোহন মায়া চকিতে উঠিছে দুলে,—
পূর্ণা তটিনী যেন কলরোল তুলে ;—
সে মেঘ-মায়ার সকলি নহে ত মিছে ?

প্রাচীন-দিনের প্রসাধনে তাই প্রিয়া,
সাজা'ব তোমায় এ লীলাকমল দিয়া ।

———

যাদুঘর

শ্রীনরেন্দ্র দেব

১৫

প্রকাশ তার পড়বার ঘরে বসে নিবিষ্ট মনে একখানা পত্র লিখছিল, উমা ঘরে ঢুকে ডাক্‌লে—দাদা!

প্রকাশ সে ডাক শুনতে পেলে না। উমা আর একটু এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে—দাদা কি করছো?

প্রকাশ এবার উমার গলা পেয়ে চম্‌কে উঠে তাড়াতাড়ি তার চিঠিখানার উপর একখানা ব্লটিং কাগজ চাপা দিয়ে বললে—এ কি! তুই এমন সময় বাইরে এলি কেন? এখনি কে এসে পড়বে; যা বাড়ীর ভিতর পালা।

উমা একটু মৃদু হেসে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে বললে—এ সময় কেউ এসে পড়বার সম্ভাবনা থাকলে কি তুমি এমন নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে কোনও গোপনীয় পত্র লিখতে পারতে দাদা?

প্রকাশ একবার চকিতের ন্যায় টেবিলের উপরের ব্লটিং চাপা চিঠিখানার দিকে চেয়ে নিয়ে বললে—গোপনীয় পত্র লিখছি কে বললে?

উমা আবার সেই স্নিগ্ধ হাসি হেসে বললে—কেন মিছে আমার কাছে লুকোবার চেষ্টা করছো দাদা, আমরা তোমাদের মুখ দেখলে তোমাদের মনের কথা সব বুঝতে পারি!

প্রকাশ একটু শুষ্ক হাসি হাসবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বললে—ও সব ধাপ্পা আমার কাছে চলবে না উমা, ও তুই ভোলাকে বলিস্—সে বিশ্বাস করবে।

ভোলা হচ্ছে প্রকাশের মামাতো ভাই। অল্পবয়সে পিতৃমাতৃহীন হওয়ায় সে তার পিসীমার কাছেই মানুষ হচ্ছিল। অবিনাশ বাবুই এখন তার অভিভাবক। প্রকাশের চেয়ে সে বয়সে ছোট। আই-এ পড়ে। উমা এই ছেলেটিকে তার দাদার মতই ভালবাসে। উমা যা বলে ভোলানাথ তাই শোনে। তাই দাদার চেয়ে ভোলাদার সঙ্গেই উমার বনে বেশী। প্রকাশ সেটা জানে বলেই যখন তখন ভোলানাথকে খেলো করবার চেষ্টা করে উমাকে জব্দ করতে প্রয়াস পেতো।

উমা প্রকাশের কথার উত্তরে গম্ভীর ভাবে বললে—ভোলাদা তো বিশ্বাস করবেই; সে তো আর তোমার মতো অবিশ্বাসী নয়,—মাষ্টারের মেয়েকে বিয়ে করতে পেলে না বলে মনের দুঃখে কোনও দিন বুড়ো বাপমাকে ফেলে সে বাড়ী ছেড়ে পালায় নি!

প্রকাশের কর্ণমূল পর্য্যন্ত লাল হ'য়ে উঠলো; অপ্রতিভের মতো সে বললে—আমি বুঝি সেই জন্যে চলে গেছলুম মনে করেছিস্?

—তবে কি মনে করবো তুমি কাউকে কিছু না বলে জয়পুরে হাওয়া খেতে চলে গেছলে?

—আমি বায়োস্কোপে ছবি তোলাতে গেছলুম। বাবাকে বলে গেলে কি তিনি যেতে দিতেন? তাই না বলে পালিয়ে গেছলুম।

—দেখো, বার-বার মিছে কথা বোলো না বলছি। পুরুষদের উপর আমার অশ্রদ্ধাটাকে আর এমন করে বাড়িয়ে তুলোনা দাদা।

—কেন, পুরুষদের চেয়ে কি মেয়েরা বেশী শ্রদ্ধার যোগ্য বলে মনে করো? তারা কি কেউ মিছে কথা বলে না বলতে চাও?

তারা কেউ মিছে কথা বলে না এমন কথা কেন বল্‌বো, আমার তো মাথা খারাপ হয়নি। তবে একথা

ঠিক্ যে পুরুষদের মতো তারা হৃদয়হীন কপট নয়। মিছে কথায় কাউকে ভুলিয়ে রাখে না!

—আর আমি যদি তাদের হৃদয়হীনতা ও কপটতার একাধিক প্রমাণ দিতে পারি?

—তাহলে আমিও প্রমাণ করে' দেখাবো যে সে হৃদয়-হীনতা ও কপটতাটুকু তারা পুরুষদের কাছেই শিখেছে! শুধু কি তাই! তোমরা এদেশের মেয়েদের গারদে বন্ধ রেখে একেবারে অমানুষ করে দিয়েছো! চারিদিক থেকে তাদের এমন করে বেঁধে রেখেছো যে তারা একটু নড়-চড়বার পর্য্যন্ত অবকাশ পায় না!

—এই এতো বজ্র বাঁধনের মধ্যে থেকেও তারা যা ভেল্কী দেখায়—খোলা থাকলে না জানি কি সর্ব্বনাশই করতো!

—এটা তোমার সম্পূর্ণ ভুল ধারণা দাদা। পৃথিবীর সাড়ে তিনভাগ অংশে মেয়েরা সব স্বাধীন। তাদের দেশে মনুসংহিতাও নেই আর রঘুনন্দনের স্মৃতিও নেই! অথচ সে দেশের মেয়েরা দেখো আমাদের চেয়ে কত বিষয়ে শ্রেষ্ঠ!

—সে কথা মনেও ভেবো না। বাইরে থেকে দেখলে তাই মনে হয় বটে, কিন্তু তুমি জানো না ওদের অবস্থা তোমাদের চেয়েও খারাপ। একটি মনের মতো স্বামী সংগ্রহ করবার জন্যে ওদেশের মেয়েদের প্রাণান্ত চেষ্টা করতে হয়।

—তাকি এ দেশেও করতে হয়না দাদা? তবে এ দেশে সে প্রাণান্ত চেষ্টাটা মেয়েদের পরিবর্ত্তে মেয়েদের বাপেরাই করে থাকেন এই যা তফাৎ! তার ফলে হয় এই—যে—পিতার নির্ব্বাচিত পতিকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে না পারলেও অনেক মেয়েকে বাধ্য হয়ে সতী সেজে থাকতে হয়।

প্রকাশ অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—কিন্তু আমার ভগ্নীপতি নির্ব্বাচনে আশা করি বাবার কোনও ত্রুটী ছিল না।

উমা একটু করুণ হেসে বললে—না থাকবারই কথা বটে, কারণ কোনও মাষ্টার মহাশয়ের পুত্রকে বিবাহ করবার জন্য তো আমি ক্ষেপে উঠিনি!

প্রকাশের মুখখানি আবার রাঙা হয়ে উঠলো। ধরা গলায় সে বললে—সেটা কি আমার একটা মস্ত অপরাধ হয়েছিল?

উমা সজোরে ঘাড় নেড়ে বললে—না দাদা; একটুও না। তোমরা যে পুরুষ মানুষ। তোমাদের ইচ্ছামতো পত্নী নির্ব্বাচনে অধিকার আছে যে! ওইটেই অপরাধ বলে গণ্য হতে পারতো—যদি, আমি কোনও মনোমত পাত্রকে পতিত্বে বরণ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করতুম। কারণ স্ত্রীলোকদের নাকি সে স্বাধীনতাটুকুও থাকা পাপ!

প্রকাশ উত্তেজিত হয়ে উঠে বললে কে বলেছে পাপ! সেকালে তো এ দেশের মেয়েরা সবাই স্বয়ম্বরা হতো।

উমা বললে—হ্যাঁ, তা হতো—কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ দাদা যে, এটা 'সেকাল' নয়—এ কাল! এ কালে মেয়েরা স্বামী কি—তা জানবার বা বোঝবার আগেই তোমরা তাদের এক একটি স্বামীর হাতে গছিয়ে দাও! ফলে, আমার মতো কত অভাগী স্বামীকে জানবার অবকাশ পাবার পূর্ব্বেই বৈধব্যকে বরণ করে বসে!

—সেই জন্যই তো বাবা তোর আবার বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তুইই তো তাতে সকলের চেয়ে বেশী আপত্তি করেছিলি!

যে বন্ধন থেকে ভগবান আমাকে মুক্তি দিয়েছেন, আমি আবার তাই যেচে পরতে যাবো দাদা? আমি এতটা বোকা নই! তাছাড়া আর একটা কথা কি জানো—দীর্ঘ কালের সংস্কার এ দেশের মনকে এমন করে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে যে সহজ সত্যটুকুও আর আমাদের কিছুতেই উপলব্ধি হয় না! আচারকে আমরা এত বড় করে দেখতে শিখেছি যে মানুষের আসল যে ধর্ম্ম—অর্থাৎ তার মনুষ্যত্বটুকু একেবারে হারিয়ে বসে আছি! তাই এ দেশে মানুষের পরিবর্ত্তে অমানুষের ভীড়ই বেশী! তারা মুখে বিধবা বিবাহ সমর্থন করলেও কাজে দেখাতে সাহস করে না! তাদের সংস্কারে বাধে! তাই স্ত্রীর মৃত্যুর পর পুরুষের আবার বিবাহ করাটা আজ এখানে যেমন সহজ হয়ে গিয়েছে—বিধবার বিবাহ দেওয়া বা করা ওটা সহজ নয়। তোমরা মুখে আমাদের প্রতি যতই

সহানুভূতি দেখাও না কেন, আমরা যদি সত্যই আবার বিবাহ করে সংসার পেতে বসতুম, তোমরা তাহলে কিছুতেই আমাদের মনে মনে ক্ষমা করতে পারতে না। সমস্ত বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন—আমাদের অন্তরে অন্তরে ঘৃণা করতো—এই জন্যই আমার মতো স্বামী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বিধবাদেরও পুনরায় বিবাহিত হ'তে সাহসে কুলোয় না। সকলের ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে ব্রহ্মচর্য্য পালন করাটাই তারা সুবিবেচনার কাজ বলে মনে করে।

প্রকাশ চুপ করে কি ভাবছিল, উমা বললে—কিন্তু আমার কি মনে হয় জানো দাদা? এ দেশের বিধবাদের এই রকম অসহায় অবস্থায়—আত্মীয় স্বজনের গলগ্রহ হ'য়ে—তাদের আশ্রয়ে—তাদের অনুকম্পার উপর নির্ভর করে নিজে অন্তরাত্মাকে নিয়ত ক্ষুণ্ণ ও অপমানিত হতে দিয়ে বেঁচে থাকার হীনতা বোধ হয় দ্বিতীয়বার পতিগ্রহণ করার চেয়েও অনেক বেশী লজ্জাকর।

প্রকাশ এবার সচকিত হয়ে উঠে বললে—তাই যদি তোর অভিমত তবে কেন তুই দ্বিতীবার বিবাহে সম্মতি দিলি নি?

উমা বিরক্ত হয়ে উঠে বললে—আঃ! ওই বড়ো তোমাদের দোষ! তোমরা তর্ক করতে বসে তার মধ্যে ব্যক্তিগত ব্যাপার এত বেশী এনে ফেলো যে তোমাদের সঙ্গে কোনও বিষয়ে আলোচনা করা এখন দায় হয়ে উঠেছে। আমার কথা তুমি একেবারে ভুলে যাও—শুধু এইটুকু মনে করো যে যাদের অন্তরে স্বর্গগত স্বামীর একটা অস্পষ্ট ছায়া পর্য্যন্ত পড়বার সুযোগ ঘটেনি সেই সব বালবিধবার এই সংসারের শত প্রলোভনের মধ্যে কেমন করে তার স্বামীনামক সেই অজ্ঞাত মানুষটিকে শুধু ধ্যান করে বেঁচে থাকতে পারে? এত বড় একটা অন্যায় অস্বাভাবিক অসম্ভব ব্যাপারকে যারা ধর্ম্ম ও সমাজ শৃঙ্খলার অজুহাতে জোর করে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায় সে জাতির সভ্যতা যত বড় প্রাচীনই হোক আমি তাদের বুদ্ধি বিবেচনার কিছুতেই অনুমোদন করতে পারছিনি!

প্রকাশ নতমস্তকে শুধু ধীরে ধীরে বললে—আমারও তোর সঙ্গে একমত উমা!

একটা প্রসন্নহাস্যে উমার সুন্দর মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো! সে স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠে বললে—আমি তা জানি দাদা, সেই সাহসেই তোমার কাছে একটু মনখুলে দুটো কথা বলে মনটা একটু হালকা করে নিলুম। বাবার কাছে এ সব কথা বললে কি রক্ষে ছিল?—তিনি মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হ'তেন। তাঁরা যে যুগের মানুষ তাতে তাঁদের ধারণা যে স্ত্রীলোকদের এ সব বিষয়ে চিন্তা বা আলোচনা করাও পাপ! আমি সেই জন্য সাধ্য মত কখনও তাঁকে আঘাত দিই নি! কিন্তু তোমার প্রতি তিনি এই যে অবিচার করেছেন—তাঁর এই অন্ধ আভিজাত্য গর্ব্বের অপরাধ আমি যে কিছুতেই ক্ষমা ক'রতে পারছিনি দাদা!

প্রকাশ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে উদাস ভাবে বল্‌লে—যাক্‌গে! যা হবার হ'য়ে গেছে, তাই নিয়ে দুঃখ ক'রে আর কোনও ফল নেই বোন্! কি বলিস্? ওঁরা ছেলে মেয়ের বিবাহটাকে যেন পুতুল খেলা বলে মনে করেন! এ যে রক্ত মাংসে গড়া জীবন্ত মানুষ নিয়ে কারবার... এর সঙ্গে যে তাদের জীবন মরণের সমস্যা জড়িয়ে আছে... সে কথাটা তাঁদের মনেই থাকে না! নিজেদের খেয়াল মতোই চলেন। রোস্‌না ..আমিও এর শোধ নেবো, আমি চিরকুমার থাকবো, কখনই আর বিবাহ করবো না।

—আর কাউকে বিবাহ করতে পারলে তো ক'র্‌বে!

এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে উমার চোখে মুখে একটা সকৌতুক হাসির আভাস দেখা গেল! সে আবার বল্‌লে—আচ্ছা দাদা, তুমি আমার মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি ক'রে বলোতো তুমি কি বিভাকে কখন ভুলতে পারবে?

প্রকাশ চুপ ক'রে রইল। উমা বললে—বুঝিচি দাদা, আর তোমাকে মুখে কিছু বলতে হবে না, শুধু একটা কথা আমাকে বলো—জয়পুরে বিভার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল? প্রকাশ ঘাড় নেড়ে জানালে হয়েছিল এবং এ কথাও বললে যে সে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ। তারপর, সেই দেখার শেষ পর্য্যন্ত যা ঘটেছিল তাও সে একে একে এই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী ছোট বোনটির কাছে না বলে থাকতে পারলে না!

উমা সব শুনে একটু হাসলে। প্রকাশ লজ্জিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—হাস্‌লি যে উমা?

উমা বললে—তোমাকে উপহাস করবার জন্য হাসি নি দাদা—হাসলুম বিভার ছেলে মানুষীটা ভেবে! সে মনে করেছে তোমাকে জয়পুর থেকে সরিয়ে দিলেই সে যেন তার অন্তর থেকেও তোমাকে সরাতে পারবে!—মানুষ এমন ভুলও ক'রে! কিন্তু, দোহাই তোমার দাদা, তুমি তার উপর—একটুও রাগ করো না যেন! সে কৃপার পাত্রী! বিকারের রোগী যেমন ব্যাধির প্রকোপে কত কি বলে—কত কি করে—এও ঠিক তাই! তোমার প্রতি তার অগাধ ভালবাসার উত্তেজনাতেই সে এত বড় নিষ্ঠুর হ'তে পেরেছিল, নইলে এ কাজ সে কিছুতেই পারতো না! তুমি নিশ্চয় তাকেই অনুযোগ ক'রে চিঠি লিখতে বসেছিলে না দাদা?—

বিস্ময় বিহ্বলের মতো উমার মুখের পানে নির্নিমেষ নেত্রে চেয়ে প্রকাশ ভাবতে লাগল...এ কেমন করে তা জানতে পারলে!

দাদার চোখের দৃষ্টিতে যে প্রশ্ন ফুটে উঠেছিল উমা সেটা অনুমান করে বললে—আমি কেমন করে তা' ধরতে পারলুম ভেবে তুমি আশ্চর্য্য হয়েছো না? কিন্তু আশ্চর্য্য হবার এতে কিছু নেই দাদা! আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি যে—আমরা মেয়ে মানুষ, তোমাদের মুখ দেখে আমরা তোমাদের মনের কথা বুঝতে পারি!

প্রকাশ হঠাৎ প্রশ্ন করলে..তুই কি কখন কাউকে ভাল-বেসেছিলি উমা?

উমা হেসে ফেলে বললে—কেন? সে খোঁজে তোমার দরকার কি?

—নইলে এত কথা তুই শিখলি কেমন ক'রে? আমার কিন্তু ভয়ানক সন্দেহ হ'চ্ছে।

—আচ্ছা, ধরো যদি বলি হ্যাঁ বেসেছি। তা হলে কি তোমরা তার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে দেবে?—

—নিশ্চয়, যেমন ক'রে পারি তোর ভালবাসা যাতে সার্থক হয় আমি তার উপায় করবো!

—ইস্! তোমাকে আমি অগ্রিম ধন্যবাদ দিয়ে রাখছি। অতটা অনুগ্রহ আর তোমাকে ক'রতে হবে না দাদা! যে ভালবাসতে পারে সে কারুর সাহায্য না নিয়েই তার ভালবাসাকে সার্থক ক'রে তুলতেও পারে! আচ্ছা, তুমি কি মনে করো দু'জন স্ত্রী-পুরুষ যারা পরস্পরকে ভালবেসেছে তাদের সে ভালবাসার সার্থকতা নির্ভর করে শুধু একটা সামাজিক বন্ধন স্বীকার করে নেওয়ার উপর? আমি তা' মনে করি না! এবং আমার বিশ্বাস বিভাও তা' মনে করে না! সে তোমাকে ভালবেসেছে এবং যে মুহূর্ত্তে জানতে পেরেছে যে তুমিও তাকে ভালবেসেছ। সেই শুভক্ষণেই তার ভালবাসা তাকে চরম সার্থকতা এনে দিয়েছে! নইলে তুমি যখন পিতার বিনা অনুমতিতেই তাকে বিবাহ করতে প্রস্তুত হয়েছিলে, তখন সে কিছুতেই অন্যের গলায় মালা দিতে পারতো না! ভালবাসার একটা মস্ত গুণ কি জানো ভাই? সে মানুষকে ত্যাগের শক্তি এনে দেয়! কামনা তখন তার কাছে একেবারে তুচ্ছ হয়ে যায়! সে তোমাকে সম্পূর্ণরূপে পেয়েছে বলেই তোমার সঙ্গে বাইরের সম্বন্ধটাকে সে অত সহজে প্রত্যাখান করতে পেরেছিল। এই বৃহৎ ত্যাগকে স্বীকার ক'রে নিয়ে সে তোমাকে এবং নিজেকে পিতৃদ্রোহীতা থেকে রক্ষা ক'রেছে! কিছু মনে করো না দাদা, তোমাদের মতন দেহের সম্বন্ধটাকে আমরা কোনওদিনই বড় বলে মনে করি নি! ভালবাসা এই দেহটাকে বাদ দিয়েও সার্থক হ'য়ে ওঠে!

আচ্ছা, আমি যে বাবার বিনা অনুমতিতেও বিভাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলুম এ খবর তুই কি করে জান্‌লি?

—হাত গুণে!

—তামাসা রাখ্! সত্যি করে বল্। বিভা ছাড়া আর তো কেউ এ কথা জানে না।

—তবে আর জিজ্ঞাসা ক'রছো কেন? তোমার প্রশ্নের উত্তর তো ওইখানেই পাচ্ছ!

—বিভা বলেছে?

—তাছাড়া আর কেউ তো ওকথা জানে না।

—কবে বলেছে?

—বিয়ের রাত্রে!

—ও!

প্রকাশ অনেকক্ষণ চুপ করে কি ভাবতে লাগল, তারপর জিজ্ঞাসা ক'রলে—আর আর একটা কথা—বিভা যে জয়পুরে আছে সে খবর আমিও জানতুম না কিন্তু তুই কি ক'রে জান্লি উমা ?

উমা হাসতে হাসতে বললে—কি ক'রে জান্লুম যদি বলি, শুনে তুমি খুব খুশী হবে, কিন্তু আমাকে কি দেবে বলো,—অমনি বল্‌ছিনি !

প্রকাশ বললে—তুই যাকে ভালবেসে ধন্য হয়েছিস্‌ তাকে একদিন নিমন্ত্রণ করে এনে খাওয়াবো !

—সে আমার নিমন্ত্রণ ছাড়া আসবে না, তোমার নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করবে ।

—বেশ আমিই না হয় তোর নিমন্ত্রণ বহন করে নিয়ে যাবো !

—আমার বয়ে গেছে তাকে তোমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ক'রে এনে খাওয়াতে ! আমার যেদিন আপন কুটীরে তাকে আবাহন করে এনে খাওয়াবার সুযোগ হবে সেইদিন তাকে রঙীণ লিপি পাঠাবো ।

—তুই যে কবি হয়ে উঠেছিস্‌ দেখ্‌ছি !

—আমার পূর্ব্বেও অনেকে হয়েছেন—মীরাবাঈ জেবউন্নিসা প্রভৃতি—

—আচ্ছা তোমার ত আপন কুটীর ছেড়ে আপন প্রাসাদ রয়েছে। শশুর বাড়ীর সম্পত্তি তো এখন সবই তোর !

—পাগল হ'য়েছো দাদা, আইনের হিসেবে সে সব সম্পত্তি আমার বটে, সমাজও তাই স্বীকার করবে, কিন্তু আমার মন যে তাতে সায় দেয় না ভাই ! যে স্বামীকে আমি কোনওদিন পাই নি, তার সম্পত্তিটা আমি ফাঁকি দিয়ে নিতে চাইনি ; তবে নেহাৎ যখন ঘাড়ের উপর এসে পড়েছে, এই লটারীর টাকা পাওয়ার মতো আর কি !—তখন ওটার যাতে সদ্ব্যয় হয় সেইটুকু শুধু দেখবো, আমি ভোগ করবো না কিছু !

—তাইত উমা ! তুই যে আমাকে অবাক করে দিলি ! বাড়ীর এই উচ্চপ্রাচীরের মধ্যে আজন্ম আবদ্ধ থেকেও কবে যে তুই চুপি চুপি আমাদের ছাড়িয়ে এতটা এগিয়ে গেছিস্‌ কিছু টের পাই নি ত ? আজ তোকে আর ছোট বোনটি বলে মনে হ'চ্ছে না—দিদি বলে ডাকতে ইচ্ছে ক'রছে !

—আচ্ছা বেশ, তাহ'লে—দিদি যা বলে শোনো—ও চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলে দাও। বিভাকে তুমি কিছু লিখো না ; সেই লিখবে। জয়পুর থেকে নিশ্চয় চিঠি আসবে—তুমি সেই চিঠির অপেক্ষা করে থাকো। বিভা যে জয়পুরে আছে সে খবর বিভাই আমাকে দিয়েছিল। তোমার নিরুদ্দেশ হ'য়ে যাওয়ার সংবাদে ব্যাকুল হ'য়ে সঠিক সংবাদ জানবার জন্য সে আমাকে পত্র লিখেছিল !

—ও ! বুঝেছি এইবার ।

—আচ্ছা দাদা, পরস্ত্রীর প্রতি আসক্তি সর্ব্বদেশেই শাস্ত্র ও ধর্ম্ম বিগর্হিত তা জানো তো ?

—জানি ।

—তবে ?

—কি তবে ?

—বিভা—?

—বিভা কি পরস্ত্রী ?

—নয়ত' কার ? সে কি নির্ম্মল বাবুর স্ত্রী নয় ?

—না আমার ! নির্ম্মল আমার স্ত্রীকে বিবাহ করেছে !

—উমা তার আঁচলটা গলায় দিয়ে প্রকাশের পায়ের কাছে ঢিপ্‌ করে মাথা ঠুকে একটা প্রণাম ক'রে উঠে বললে—বিভা পোড়ারমুখী জন্ম-এয়োস্ত্রী হ'য়ে বেঁচে থাক। তারপর সে বাড়ীর ভিতর চলে গেল। যেতে যেতে বলে গেল—কিন্তু নিমন্ত্রণের কথাটা যেন ভুলো না দাদা—

উমা চলে যেতেই প্রকাশ যে চিঠিখানা লিখছিল সেখানা ব্লটিং প্যাডের ভিতর থেকে বার করে আর একবার পড়ে দেখলে, তারপর একটু ভেবে সে কুচি কুচি ক'রে চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলে দিলে।

—ক্রমশ

উমা বললে—তোমাকে উপহাস করবার জন্য হাসি নি দাদা—হাসলুম বিভার ছেলে মানুষীটা ভেবে! সে মনে করেছে তোমাকে জয়পুর থেকে সরিয়ে দিলেই সে যেন তার অন্তর থেকেও তোমাকে সরাতে পারবে!—মানুষ এমন ভুলও ক'রে! কিন্তু, দোহাই তোমার দাদা, তুমি তার উপর—একটুও রাগ করো না যেন! সে কৃপার পাত্রী! বিকারের রোগী যেমন ব্যাধির প্রকোপে কত কি বলে—কত কি করে—এও ঠিক তাই! তোমার প্রতি তার অগাধ ভালবাসার উত্তেজনাতেই সে এত বড় নিষ্ঠুর হ'তে পেরেছিল, নইলে এ কাজ সে কিছুতেই পারতো না! তুমি নিশ্চয় তাকেই অনুযোগ ক'রে চিঠি লিখতে বসেছিলে না দাদা?—

বিস্ময় বিহ্বলের মতো উমার মুখের পানে নির্ণিমেষ নেত্রে চেয়ে প্রকাশ ভাবতে লাগল...এ কেমন ক'রে তা জানতে পারলে!

দাদার চোখের দৃষ্টিতে যে প্রশ্ন ফুটে উঠেছিল উমা সেটা অনুমান করে বললে—আমি কেমন করে তা' ধরতে পারলুম ভেবে তুমি আশ্চর্য্য হয়েছো না? কিন্তু আশ্চর্য্য হবার এতে কিছু নেই দাদা! আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি যে—আমরা মেয়ে মানুষ, তোমাদের মুখ দেখে আমরা তোমাদের মনের কথা বুঝতে পারি!

প্রকাশ হঠাৎ প্রশ্ন করলে ..তুই কি কখন কাউকে ভাল-বেসেছিলি উমা?

উমা হেসে ফেলে বললে—কেন? সে খোঁজে তোমার দরকার কি?

—নইলে এত কথা তুই শিখলি কেমন ক'রে? আমার কিন্তু ভয়ানক সন্দেহ হ'চ্ছে।

—আচ্ছা, ধরো যদি বলি হ্যাঁ বেসেছি। তা হলে কি তোমরা তার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে দেবে?—

—নিশ্চয়, যেমন ক'রে পারি তোর ভালবাসা যাতে সার্থক হয় আমি তার উপায় করবো!

—ইস্! তোমাকে আমি অগ্রিম ধন্যবাদ দিয়ে রাখছি। অতটা অনুগ্রহ আর তোমাকে ক'রতে হবে না দাদা! যে ভালবাসতে পারে সে কারুর সাহায্য না নিয়েই তার ভালবাসাকে সার্থক ক'রে তুলতেও পারে! আচ্ছা, তুমি কি মনে করো দু'জন স্ত্রী-পুরুষ যারা পরস্পরকে ভালবেসেছে তাদের সে ভালবাসার সার্থকতা নির্ভর করে শুধু একটা সামাজিক বন্ধন স্বীকার করে নেওয়ার উপর? আমি তা' মনে করি না! এবং আমার বিশ্বাস বিভাও তা' মনে করে না! সে তোমাকে ভালবেসেছে এবং যে মুহূর্ত্তে জানতে পেরেছে যে তুমিও তাকে ভালবেসেছ। সেই শুভক্ষণেই তার ভালবাসা তাকে চরম সার্থকতা এনে দিয়েছে! নইলে তুমি যখন পিতার বিনা অনুমতিতেই তাকে বিবাহ করতে প্রস্তুত হয়েছিলে, তখন সে কিছুতেই অন্যের গলায় মালা দিতে পারতো না! ভালবাসার একটা মস্ত গুণ কি জানো ভাই? সে মানুষকে ত্যাগের শক্তি এনে দেয়! কামনা তখন তার কাছে একেবারে তুচ্ছ হয়ে যায়! সে তোমাকে সম্পূর্ণরূপে পেয়েছে বলেই তোমার সঙ্গে বাইরের সম্বন্ধটাকে সে অত সহজে প্রত্যাখান করতে পেরেছিল। এই বৃহৎ ত্যাগকে স্বীকার ক'রে নিয়ে সে তোমাকে এবং নিজেকে পিতৃদ্রোহীতা থেকে রক্ষা ক'রেছে! কিছু মনে করো না দাদা, তোমাদের মতন দেহের সম্বন্ধটাকে আমরা কোনওদিনই বড় বলে মনে করি নি! ভালবাসা এই দেহটাকে বাদ দিয়েও সার্থক হ'য়ে ওঠে!

আচ্ছা, আমি যে বাবার বিনা অনুমতিতেও বিভাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলুম এ খবর তুই কি করে জানলি?

—হাত গুণে!

—তামাসা রাখ্! সত্যি করে বল্। বিভা ছাড়া আর তো কেউ এ কথা জানে না।

—তবে আর জিজ্ঞাসা ক'রছো কেন? তোমার প্রশ্নের উত্তর তো ওইখানেই পাচ্ছ!

—বিভা বলেছে?

—তাছাড়া আর কেউ তো ওকথা জানে না।

—কবে বলেছে?

—বিয়ের রাত্রে!

—ও!

প্রকাশ অনেকক্ষণ চুপ করে কি ভাবতে লাগল, তারপর জিজ্ঞাসা ক'রলে—আর আর একটা কথা—বিভা যে জয়পুরে আছে সে খবর আমিও জানতুম না কিন্তু তুই কি ক'রে জান্‌লি উমা ?

উমা হাসতে হাসতে বললে—কি ক'রে জান্‌লুম যদি বলি, শুনে তুমি খুব খুশী হবে, কিন্তু আমকে কি দেবে বলো,—অমনি বল্‌ছিনি !

প্রকাশ বললে—তুই যাকে ভালবেসে ধন্য হয়েছিস্, তাকে একদিন নিমন্ত্রণ করে এনে খাওয়াবো !

—সে আমার নিমন্ত্রণ ছাড়া আসবে না, তোমার নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করবে।

—বেশ আমিই না হয় তোর নিমন্ত্রণ বহন করে নিয়ে যাবো !

—আমার বয়ে গেছে তাকে তোমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ক'রে এনে খাওয়াতে ! আমার যেদিন আপন কুটীরে তাকে আবাহন করে এনে খাওয়াবার সুযোগ হবে সেইদিন তাকে রঙীণ লিপি পাঠাবো।

—তুই যে কবি হয়ে উঠেছিস্ দেখ্‌ছি !

—আমার পূর্ব্বেও অনেকে হয়েছেন---মীরাবাঈ জেবউন্নিসা প্রভৃতি—

—আচ্ছা তোমার ত আপন কুটীর ছেড়ে আপন প্রাসাদ রয়েছে। শ্বশুর বাড়ীর সম্পত্তি তো এখন সবই তোর !

—পাগল হ'য়েছো দাদা, আইনের হিসেবে সে সব সম্পত্তি আমার বটে, সমাজও তাই স্বীকার করবে, কিন্তু আমার মন যে তাতে সায় দেয় না ভাই ! যে স্বামীকে আমি কোনওদিন পাই নি, তার সম্পত্তিটা আমি ফাঁকি দিয়ে নিতে চাইনি। তবে নেহাৎ যখন ঘাড়ের উপর এসে পড়েছে, এই লটারীর টাকা পাওয়ার মতো আর কি !—তখন ওটার যাতে সদ্ব্যয় হয় সেইটুকু শুধু দেখবো, আমি ভোগ করবো না কিছু !

—তাইত উমা ! তুই যে আমাকে অবাক করে দিলি। বাড়ীর এই উচ্চপ্রাচীরের মধ্যে আজন্ম আবদ্ধ থেকেও কবে যে তুই চুপি চুপি আমাদের ছাড়িয়ে এতটা এগিয়ে গেছিস্ কিছু টের পাই নি ত ? আজ তোকে আর ছোট বোনটি বলে মনে হ'চ্ছে না---দিদি বলে ডাকতে ইচ্ছে ক'রছে !

—আচ্ছা বেশ, তাহ'লে—দিদি যা বলে শোনো—ও চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলে দাও। বিভাকে তুমি কিছু লিখো না ; সেই লিখবে। জয়পুর থেকে নিশ্চয় চিঠি আসবে—তুমি সেই চিঠির অপেক্ষা করে থাকো ! বিভা যে জয়পুরে আছে সে খবর বিভাই আমাকে দিয়েছিল। তোমার নিরুদ্দেশ হ'য়ে যাওয়ার সংবাদে ব্যাকুল হ'য়ে সঠিক সংবাদ জানবার জন্য সে আমাকে পত্র লিখেছিল !

—ও ! বুঝেছি এইবার।

—আচ্ছা দাদা, পরস্ত্রীর প্রতি আসক্তি সর্ব্ব দেশেই শাস্ত্র ও ধর্ম্ম বিগর্হিত তা জানো তো ?

—জানি।

—তবে ?

—কি তবে ?

—বিভা—?

—বিভা কি পরস্ত্রী ?

—নয়ত' কার ? সে কি নির্ম্মল বাবুর স্ত্রী নয় ?

—না আমার ! নির্ম্মল আমার স্ত্রীকে বিবাহ করেছে !

—উমা তার আঁচলটা গলায় দিয়ে প্রকাশের পায়ের কাছে ঢিপ্ করে মাথা ঠুকে একটা প্রণাম ক'রে উঠে বললে—বিভা পোড়ারমুখী জন্ম-এয়োস্ত্রী হ'য়ে বেঁচে থাক। তারপর সে বাড়ীর ভিতর চলে গেল। যেতে যেতে বলে গেল—কিন্তু নিমন্ত্রণের কথাটা যেন ভুলো না দাদা—

উমা চলে যেতেই প্রকাশ যে চিঠিখানা লিখছিল সে খানা ব্লটিং প্যাডের ভিতর থেকে বার করে আর একবার পড়ে দেখলে, তারপর একটু ভেবে সে কুচি কুচি ক'রে চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলে দিলে।

—ক্রমশ

আমার মেঘ্না নদী

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

মেঘ্নার তীরে বাঁধিয়াছি বাসা ছোট একখানি নীড়,
ফিরি করে' আর ফিরি না পরাণ,নই আর মুসাফির।
আমার মেঘ্না নদী
শুকাইত, ওর সাথে মোর আঁখিজল না মিশিত যদি!
ছোট গ্রামখানি লাজুক শ্যামল নববধূটির মত,
শূন্যতাভারে বিরহী আকাশ চুম্বনে অবনত।
জেগে বসে' মেঘগর্জ্জন আর জলকল্লোল শুনি,
শ্রান্ত শ্রাবণ নয়নে ও নভে নাই ফুল ফাল্গুনি।
নদী মাছি মাটি ধান—
আপনার মাঝে শুনি সবাকার প্রাণধারণের গান।
হে বিদেশী নাও,কোথা যাও ভেসে
বারেক আসিবে হেথা,
তোমার কক্ষে যাপিছে কি নিশি আমার মহাশ্বেতা?
মেঘ্না মেঘের প্রিয়া,
পরাণের সে যে নাই, এ যে মোর নয়নের আত্মীয়া।
তাহার শিয়রে রূপার প্রদীপ, মৃত্যু শিয়রে মোর,
তাহার আকাশে ঊষা উদ্ভাসে হেথা হায় ঘনঘোর।
তাহার চন্দ্রহার,
মোর আছে শুধু মেঘ্লা আকাশ আর জল মেঘ্নার॥

———

নহেক প্রথমতম

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

তোমার প্রথম গুণ্ঠনখানি সোহাগে টানিয়া দিয়ো,
বিবাহের বাঁশি বেজে উঠিয়াছে, এল পরমাত্মীয় !
কণ্ঠে মিলনমালা,
সে জ্বালা জুড়াও বিধাতা ও মোর বুকে জ্বলে যেই জ্বালা !
সীমন্তে নব শুভ শৃঙ্গারভূষণ শোভিছে কিবা,
কা'র লীলায়িত ভুজবন্ধনে বন্দী মৃণাল-গ্রীবা !
জলতরঙ্গ বাজিল কি দেহে,—অপূর্ব্ব ঝঙ্কার,
পুরাতন রস-রভসে শিহরি' উঠিয়ো পুনর্ব্বার !
নয়ন করিয়া নত,
অস্ফুট সুখে বোলো 'ভুলিব না' সেই সে দিনের মত।
তব বন্ধুর রাত্রির পারে এস কল্যাণী ঊষা,
দুই হাতে আন স্নেহ সান্ত্বনা অনাবিল শুশ্রূষা !
পরাণ ভরিয়া প্রীতি,
পুণ্য প্রভাতে শুধু আনিয়ো না গত গোধূলির স্মৃতি !
হেথা নগরীর ধূলি-কুৎসিত পথে আমি একা চলি,
সেবায় পূর্ণ থাকুক সে গৃহলক্ষ্মীর অঞ্জলি !
অকারণ চলা মম,
প্রিয়তম তবু তোমারি, যদিও নহেক প্রথমতম !

স্বপ্নমানের আলাপনা

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

মহাত্মা রোমাঁ রোলাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় বিগত মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই। যুদ্ধের সময়ে জর্ম্মানীরা শত্রুপক্ষীয় লোকদের প্রতি যে অমানুষিক অত্যাচার করছিল সেই কথা উল্লেখ কোরে তিনি বর্ত্তমান যুগের একজন বিখ্যাত জর্ম্মান সাহিত্যিককে পত্র লিখেছিলেন। সেখানকার সাহিত্যিকরা তাঁদের রাজশক্তির এই অমানুষিক অপব্যয়ের বিরুদ্ধে অন্ততঃ মৌখিক আপত্তিও যে কেন জানাচ্ছেন না, এই ছিল তাঁর অভিযোগ। সেবারে এই পত্রখানি নিয়েই আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল। আমার বক্তব্য ছিল যে, যুদ্ধের পরে শান্তির সময়ে, মিত্রপক্ষীয় কোন এক জাতি তাদের উপকারী, অধীনস্থ ও নিরস্ত্র লোকদের ওপর যে অমানুষিক অত্যাচার করছিল তার প্রতিবাদ করবার জন্য সে দেশের সাহিত্যিকদের তিনি কোনো পত্রাঘাত করলেন না কেন?

আমার প্রশ্ন শুনে রোলাঁর স্বভাব-মলিন মুখখানি আরও মলিন হোয়ে উঠেছিল। এ প্রশ্নের কোনো জবাব না পাওয়া সত্ত্বেও আমি আর তাঁকে কোনো প্রশ্নই করিনি। সেবারের আলোচনা এই খানেই স্থগিত হয়েছিল।

অনেকদিন পরে আবার একদিন বিকেলে হ্রদের ধারে তাঁর সেই সুন্দর বাড়ীটিতে গিয়ে হাজির হয়েছিলুম। রোলাঁ সচরাচর বাইরে কোথাও যান না। দেখা হো'লে, সাদর সম্ভাষণ হোয়ে যাবার পর তিনি বল্লেন—দেখ, তোমার মুখ আমার মনে পড়ছে কিন্তু নামটা তো মনে নেই।

আমি হেসে বল্লুম—আশ্চর্য্য! লোকে কিন্তু আমার নামটাই মনে রাখে, চেহারা মনে রাখে না।

রোলাঁ বল্লেন—কেন বল তো?

—আমার চেহারার মধ্যে মনে থাকবার মতন বিশেষত্ব কিছুই নেই, কিন্তু আমার নামের মধ্যে এমন কিছু আছে যা লোকের পক্ষে ভোলা শক্ত।

রোলাঁ বল্লেন—তা হোলে নাম তুমি আমায় বলনি।

—খুব সম্ভব তাই। কারণ ঐ বিশেষত্বটুকু থাকার জন্যই আবার লোকের কাছে নাম বলতে আমার সঙ্কোচ হয়। আমার যা নাম সে নামে আমার পূর্ব্বে পৃথিবীতে আর কেউ অভিহিত হন নি। এর জন্য বাইরে যেমন গৌরব আছে, আমার অন্তরের দিকে ঠিক সেই রকম একটা লজ্জাও আছে।

—আচ্ছা বল তোমার নামটা শুনি।

নাম বল্লুম। আমার নাম শুনে তিনি বল্লেন—ঠিক বলেছ তুমি! তোমার নাম ভুলব না। তোমার দেশের অনেকের সঙ্গেই আমার আলাপ হয়েছে। এই যেমন কালিদাস, দিলীপ, তারকনাথ—এদের নাম আমি কখনো ভুল করি না।

আমি বল্লুম—আজ্ঞে ওঁদের নামগুলো যে এমন বিশেষ কিছু মনে রাখবার মতন, তা নয়। তবে তাঁদের নামের পেছনে যে ব্যক্তিটী আছেন সেই ব্যক্তিটীকে যে ভোলা শক্ত। ব্যক্তিটীকে মনে পড়লেই নামটী মনে পড়বে। কিন্তু আমার বেলায় ঠিক তার উল্টো। আমার ব্যক্তিটী নামের পালচাপা পড়ে হাঁপিয়ে উঠেছে, কিছুতেই নিজেকে প্রকাশ করতে পারছে না।

রোলাঁ স্মিতহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন—ইউরোপে কতদিন এসেছ? এবার কিছু উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছ নাকি?

—এখানে সম্প্রতি এসেছি। দুটি উদ্দেশ্য অবশ্য আছে। রোলাঁ বল্লেন—ভারতবাসীরা তো এদেশে শিক্ষা

লাভ করবার উদ্দেশ্যেই প্রধানতঃ আসে। স্কুলে কলেজে পড়ে, শিক্ষা শেষ হোলে জন্মভূমিতে ফিরে যায়। তা তোমার তো দেখছি—

—আপনি ঠিক অনুমানই করেছেন। আমার সে বয়েস কেটে গিয়েছে। যে বয়সে লোকে শিক্ষালাভ করে ও শিক্ষার্থী হোয়ে এদেশে আসে সে বয়সে ঐ শিক্ষালাভের উদ্দেশ্য জিনিসটা আমার মধ্যে কখনো জাগ্‌ল না।

—রোলাঁ বল্লেন—তবে এবারের উদ্দেশ্যটা কি? অবিশ্যি বলতে যদি বাধা থাকে—

—আজ্ঞে না, বাধা তো দূরের কথা আপনাকে বলতেই এসেছি। বলতে কি, আপনাকে কেন্দ্র কোরেই আমার এবারকার উদ্দেশ্যটা দানা বেঁধে উঠেছে।

—বল তা হোলে শুনি।

এমন সময়ে রোলাঁর ভগ্নী শ্রীমতী মাদেলিন রোলাঁ এসে বল্লেন—তোমাদের কি এখানেই চা দিতে বল্‌ব, না ঘরে আস্‌বে?

রোলাঁ আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমি বল্লুম—এখানেই আপত্তি কি।

চা খেতে খেতে কথা সুরু হোলো। আমি বল্লুম—আজকাল অনেক যুবক য়ুরোপে এসে বলতে থাকেন যে এ দেশটা কিছু নয়। এখানে তাঁদের মন টেকে না। এখানে কিছুকাল বাস করবার পর জন্মভূমিকে লক্ষ্য কোরে সাংঘাতিক রকমের কবিতাও কেউ কেউ লিখে ফেলছেন। মনে হোলো, নিশ্চয় য়ুরোপ একটা বড় রকমের ভোল ফিরিয়েছে। সে ভোলটা কি ধরণের সেটা দেখবার ইচ্ছা হোলো। কারণ তিনপুরুষ আগে থেকে য়ুরোপের প্রশংসা শুনে এটা যে একটা ভাল দেশ—এ বিষয়ে আমার মনে একটা সংস্কার জন্মে গিয়েছে। এমন দেশটা হঠাৎ একেবারে বাসের অযোগ্য হোয়ে উঠ্‌ল কি কোরে সে সম্বন্ধে একটা প্রশ্নও মনের মধ্যে জাগ্‌ল।

—উত্তর পেলে সে প্রশ্নের?

—হ্যাঁ উত্তর একটা পেয়েছি।

—কি?

—ঐ রকম বলাটা আজকালকার ষ্টাইল অথবা রেওয়াজে দাঁড়িয়েছে। আপনাদের দেশে যেমন পোষাক বদলায়, আমাদের দেশে তেমনি মাঝে মাঝে বুলি বদলাবার রেওয়াজ আছে। দেখুন, একজন চিন্তাশীল ভারতবাসী কোনো সময়ে ইউরোপে এসে বলেছিলেন যে, য়ুরোপের অবস্থা বড় শোচনীয়, এরা যে পথে চলেছে সে পথে নিশ্চিত মৃত্যু। কথাটির মধ্যে সত্য কিছু হয় ত আছে। কিন্তু এরা যা বলুচে তার মধ্যে সাহসই রয়েছে বেশী।

রোলাঁ বল্লেন—দেখ ভারতবাসীরা তো য়ুরোপ সম্বন্ধে আরও অনেক প্রশংসাও করেছেন; সে সব কথা ভুলে গিয়ে এই কথাটাই তাদের অন্তরে যে বাজ্‌ছে তার কারণ আছে নিশ্চয়।

আমি বল্লুম—জনসাধারণের মনস্তত্ত্ব কারণ—অকারণ সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করে না! কথাটা বেশ মনে লাগ্‌ল—দু'বার আওড়ে নিলুম। দেখুন না, য়ুরোপে তো অনেক ভাল ভাল গানের চলন আছে, যুদ্ধের সময় সে সব গান না চলে অতি মামুলী গান নিয়ে লোকে পাগল হয়ে উঠ্‌ল।

—তুমি ভুল করছ। সেই মামুলী গানগুলো সেই সময়ের উপযোগী বলে বিবেচিত হয়েছিল।

—তা হোতে পারে। হয় ত সেই কারণেই এখন এই সব কথারও রেওয়াজ হয়েছে।

—আগে আগে অনেক য়ুরোপীয়ান ভাবুক লোকও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন। নিশ্চয় তার কিছু কিছু পড়েছ!

—আজ্ঞে হ্যাঁ কিছু কিছু পড়বার সৌভাগ্য হ'য়েছে। তবে তার অধিকাংশের মধ্যেই ভাবুকতার বিশেষ কোনো লক্ষণ দেখতে পাই নি। বর্ত্তমানে এই সব ভারতীয় যুবকেরা য়ুরোপ সম্বন্ধে যা বলছেন অনেকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সেই ধাঁচেরই অনেকে কথা বলেছেন। তবে সে সব কথার বাঁধুনি ভাল, সে সব লেখার মধ্যে মুন্সীয়ানাও আছে, এমন আল্‌গা ঢোলা ঢোলা নয়।

—কি রকম একটা দৃষ্টান্ত দিতে পার?

—এই দেখুন, একজন আমাদের, অর্থাৎ বাঙালীদের

রোগা রোগা পা আর চলবার ধরণ দেখে মন্তব্য করেছেন যে বাঙালীরা ধরণীর ওপর বিচরণ করবার উপযুক্ত নয়।

আমার কথা শুনে রোলাঁ হেসে বল্লেন—এ কথার মধ্যে কি কোনো সত্য তুমি খুঁজে পাও নি?

—আজ্ঞে না। কারণ ধরণীর ওপর বিচরণ করবার শক্তি আছে কি না আছে তার মীমাংসা করবার একমাত্র শক্তি আছে বাঙালীকে ধরণীতে যিনি এনেছেন তাঁর। তাদের ধরণী থেকে নির্ম্মূল করবার মধ্যে, অন্ততঃ বিচরণ করবার শক্তিটুকু বন্ধ ক'রে দেওয়ার মধ্যে যাদের স্বার্থ নিহিত আছে তাদের নয়। তারপরে পা রোগা, কি বীরদর্পে না হাঁটলে যে ধরণীতে বিচরণ করবার অধিকার তার নেই এ কথা ভাবুক লোকে বলতে পারে না। জীব জগতে আরশোলার পা খুবই সরু কিন্তু তারা সৃষ্টির আদিকাল থেকে বেশ সদর্পেই বিচরণ করছে আর হাতী তার মোটা পা থাকা সত্ত্বেও প্রায় নির্ম্মূল হোয়ে আসছে। আর দেখুন, য়ুরোপীয়দের হাতগুলি বেশ ষণ্ডা ষণ্ডা। আমি যদি বলি এ হাত বিচারের দণ্ড ধারণ করবার উপযুক্ত নয় কারণ বিচার অতি সূক্ষ্ম জিনিষ! ঐ হাত একমাত্র ঘোড়ার লাগাম ধরবার উপযুক্ত। তা হোলে আমার ভাবুকতার প্রশংসা আপনি নিশ্চয়ই করবেন না। যদিও কথাটা বেশ চটকদার বলেই মনে হবে। কিন্তু এ সব বাজে কথা যাক্, আমার দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটা কি তাই শুনুন।

—বল।

—আমি আপনাকে ভারতবর্ষে নিয়ে যেতে এসেছি। দিনকতকের জন্য আপনার নিবিড়তর সঙ্গ লাভের আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে প্রবল হোয়ে উঠেছে। চলুন আপনি।

আমার প্রস্তাব শুনে রোলাঁর মুখখানি খুসীতে উদ্ভাসিত হোয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র। তিনি বল্লেন—তোমাদের দেশে যাবার ইচ্ছা আমার খুব প্রবল কিন্তু কতকগুলো কাজের মধ্যে পড়েছি তা শেষ না করে নড়তে পারছি না।

জিজ্ঞাসা করলুম—কি কাজ করছেন?

রোলাঁ বল্লেন—উপন্যাসখানার শেষটুকু লিখতে হচ্ছে, তা ছাড়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সম্বন্ধে একখানা বই লিখ্‌ব, তার উপকরণ সংগ্রহ করছি।

আমি বল্লুম—হ্যাঁ দিলীপকুমার রায় মশায়ের কাছে শুনছিলুম বটে যে আপনি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সম্বন্ধে একখানা বই লিখছেন।

—হ্যাঁ, ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের রামকৃষ্ণ পড়ে ইউরোপ ও আমেরিকার একদল লোক মহা খাপ্‌পা হোয়ে উঠেছেন। সে সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই।

তাঁর এ কথার কোনো জবাব দিলুম না। কিছু পরে তিনি বল্লেন—মুখোপাধ্যায়ের বই তুমি পড়েছ!

—হ্যাঁ, কিন্তু রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বইখানা পড়ি নি। তবে তাঁর, কারি, Gay Neck Caste & Out caste, My Brothers face ইত্যাদি বইগুলো পড়েছি।

—তাঁর লেখা তোমার কেমন লাগে?

—আজ্ঞে আমি যে বইগুলোর নাম করলুম ভারতবাসীদের কাছে সে লেখার কোনো মূল্য নেই। ওগুলো য়ুরোপ আমেরিকার জন্যই লেখা, সেখানে ওর আদরও হয়েছে। মুখোপাধ্যায় মশায় মাতৃভাষায় ঐ সব লিখলে বইগুলির তিন ভাগ দপ্তরীর বাড়ীতেই থাকৃত।

রোলাঁ আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন—সে কি! তাঁর নাম তোমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদের কাছে খুব পরিচিত বলে শুনেছি।

—আজ্ঞে হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন। তবে সে পরিচয়টা তাঁর বইয়ের গুণ বিচার কোরে হয় নি। তাঁর বই য়ুরোপ আমেরিকার লোকেরা পয়সা দিয়ে কেনে এতেই তারা খুশী আছে আর তাঁর লেখা যে খুব উঁচুদরের সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত আছে।

রোলাঁ বল্লেন—'দেখ ইউরোপ এখন এশিয়ার প্রতি অত্যন্ত বীতরাগ হোয়ে পড়েছে। এরা এখন নির্ব্বিচারে এশিয়াকে অশ্রদ্ধার চোখে দেখতে আরম্ভ করেছে! এটা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় নয় কি? কি বল তুমি?

আমি বল্লুম—দেখুন এ সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে, অনুমতি করেন তো নিবেদন করি।

—বল এতে আর 'কিন্তু' হবার কি আছে?

—প্রথমেই গণ্ডিটাকে একটু ছোট কোরে আনতে

চাই। ইউরোপের সঙ্গে এশিয়ার না বলে' ইউরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করলে আমার সুবিধা হবে।

—বল।

—অতি পুরাতন যুগে ভারতের সঙ্গে ইউরোপের সম্বন্ধ কি ধরণের ছিল তা এখনো সঠিক সাব্যস্ত হয় নি। মধ্য যুগের মাঝামাঝি সময় থেকে ইউরোপের সম্যক পরিচয় আমরা পেতে আরম্ভ করি। সে সময়ের পরিচয়ের ফলে অনুরাগ না জন্মালেও উভয় পক্ষেরই কারুর দিকে বিরাগ যে জন্মায় নি সে কথা জোর কোরে বলা যেতে পারে। তারপরে অষ্টাদশ খৃষ্টান শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে আর উনবিংশ খৃষ্টান শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত যে পদ্ধতির ভেতর দিয়ে আমাদের সঙ্গে ইউরোপীয়দের পরিচয়টা নিবিড় হোয়ে উঠ্‌ল, তাতে আর যাই হোক না কেন অনুরাগ যে হয় নি তা উভয় পক্ষেই জান্‌ত। এবং উভয় পক্ষের পরস্পরের প্রতি মনোভাব নিত্য নিত্য যে ভাবে নানা আকারে ফুটে উঠ্‌ত তাতে কোনো পক্ষই বিস্মিত হোতো না। এমন সময় আপনাদের এই খ্রীষ্টান ভূমিতে লেগে গেল যুদ্ধ। যার ফলে আপনাকে দেশত্যাগী হোতে হয়েছে। এই সময় আত্মরক্ষার জন্য ইউরোপীয়রা ভারতের প্রতি হঠাৎ অনুরাগে ঢলে পড়লেন। ভারতবর্ষের লোকেরা অনুরাগ জিনিষটাকে তন্ন তন্ন কোরে বিশ্লেষণ করেছে তবু সে সময়ে আপনাদের মুখে যে সব বুলি শুনেছিলুম তা আমাদের কানে একেবারে নতুন শোনাল। তারপর কড়ায় গণ্ডায় কাজ চুকে যাবার পর ইউরোপীয়দের গলা থেকে কাঁটা নেমে গেলে সুস্থ হোয়ে ভারতবর্ষের প্রতি আবার সেই পূর্ব্বভাব ধারণ করলে। উপকারীর প্রতি যে কোনো কারণেই হোক মন্দ ব্যবহার করবার প্রয়োজন হোলে সে ব্যক্তি যে অত্যন্ত নীচ লোক এটা প্রচার করা উপকৃতের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক। ভারতবর্ষের প্রতি এই অশ্রদ্ধার বীজ যেখানে ছড়ানো হচ্ছে তাদের কামানের ডগাটা ইউরোপের সমস্ত দেশের লোকের সামনে জাজ্জ্বল্যমান, কাজেই ভারতবাসী সম্বন্ধে তাদের যা মতামত সমস্ত ইউরোপেরও সেই মতামত। এখন যদি আপনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ভাল কথা কিছু বল্‌তে যান তা হোলে হিতে বিপরীত হবে।

—তা হোলে তোমার মতে আমার এই লেখাটা একেবারে পণ্ডশ্রম হবে?

—লেখাটা যে বেবাক পণ্ডশ্রম হবে এমন কথা আমি বলতে চাই না। কারণ আপনাদের মতন লোকের লেখার মূল্য আছে। তবে আপনি যদি মনে করেন যে এই বই পড়ে ইউরোপ এশিয়ার প্রতি সশ্রদ্ধ হোয়ে উঠ্‌বে —আপনার সে ধারণা সফল হবে কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। সে সন্দেহের কারণ আপনার কাছে ব্যক্ত করেছি।

আমার কথা শুনে মহাত্মা হ্রদের দিকে মুখ ফিরিয়ে রইলেন। দেখতে দেখতে তাঁর বিষাদম্লান চক্ষু দুটি সজল হোয়ে উঠ্‌ল। হ্রদের নীল জলের ছায়া সেই সজল চোখের ওপর পড়ে মুখখানি আরও করুণ কোরে তুল্লে। আমি এক দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলুম এমন সময় হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন—আচ্ছা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ভারতবর্ষকে আমি কিছু নূতন কথা কিছু বড় কথা শোনাতে পারি না?

আমি বল্লুম—আজ্ঞে না। কারণ রামকৃষ্ণ অথবা বিবেকানন্দ যা বলেছেন তার মোদ্দা কথাটা অতি পুরাতন —অর্থাৎ তাঁরা নিজেরাই ভারতবর্ষকে নতুন কথা শোনাতে পারেন নি। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের মত মহাত্মা ভারতবর্ষে যুগে যুগে জন্মেছেন এবং তাঁরা কথাবার্ত্তাও যা বলে গেছেন তাও বেশ বড় বড়। বিবেকানন্দ অধিকাংশ কথাই তাঁর স্বদেশবাসীদের আহ্বান কোরে বলেছিলেন। তার তুলনায় বিদেশীদের সম্মুখে খুব কম কথাই বলে গিয়েছেন। তিনি আমাদের যা বলেছিলেন তা আমরা কতক পরিমাণে ভুলে গেছি আর কতক কানেই তুলি নি। তার প্রমাণ হচ্ছে আমরা ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর উপদেশ একদম মানি না। কিন্তু তিনি আপনাদের দেশে এসে আপনাদের যা বলে গিয়েছিলেন সে সব কথা আমাদের মনে এখনও জলজল করছে। বিবেকানন্দ হিন্দু সন্ন্যাসী হোয়ে ইউরোপ ও আমেরিকার মতন অহিন্দু দেশে প্রচারে

এসেছিলেন এইখানেই তিনি আমাদের কাছে অনেকখানি বড়। তাঁদের সম্বন্ধে বড় কথাও আমাদের শোনাতে পারবেন না বল্‌ছি এই জন্য যে, আমাদের দেশের লোকেরা তাঁদের দেবতা বলে। আপনি তাঁদের সম্বন্ধে যত কিছুই বলুন না কেন দেবতার চাইতে তো আর কিছু বলতে পারবেন না? তাঁদের গুণাগুণ সম্বন্ধে যতই কিছু নতুন তথ্য সংগ্রহ করুন সেটা এখানে নতুন হবে কিন্তু সেখানে নয়। কারণ দেবতাদের সব গুণই থাকে। তবে আপনি তাঁদের সম্বন্ধে বই লিখলে আমাদের একটা সুবিধা হোতে পারে।

আমার এই কথা শুনে মহাত্মার চক্ষু দুটি উজ্জ্বল হোয়ে উঠল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কি সুবিধা?

আমি বল্লুম—অন্য লোকের সঙ্গে তর্ক করবার বেলায় আমরা বলতে পারব যে তাঁদের সম্বন্ধে আপনি পর্য্যন্ত লিখেছেন। আপনার লেখাটা সময় বিশেষে যুক্তি হিসাবে প্রয়োগ করতে পারব।

রোলাঁ হেসে বল্লেন—এটা কি একটা যুক্তি হোলো?

—আজ্ঞে আমাদের দেশের কেউ লিখলে অবশ্য যুক্তি হোতো না। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইউরোপের কেউ লিখলে সেটা যুক্তিতেই দাঁড়ায়।

রোলাঁ বল্লেন—কথাগুলো একটু ভেবে বল, আন্দাজে বোলো না।

—আজ্ঞে না, এ আমার আন্দাজ নয়, আমার হাতে প্রমাণ আছে।

—আচ্ছা একটা প্রমাণ দাও দিকিন।

—এই দেখুন, রবীন্দ্রনাথের কবিতা আগে আমাদের দেশের অনেক লোকই বুঝতে পারত না। তাঁর কবিতার ওপরে নোবেলের ছাপ পড়ামাত্র লোকের সে কবিতা বুঝতে আর কোনো কষ্ট হচ্ছে না।

—তোমার এ কথাটা সকল দেশের সম্বন্ধেই প্রয়োগ করা যেতে পারে—কম আর বেশী।

—আচ্ছা নোবেল প্রাইজের কথাটা না হয় ছেড়েই দিলুম। সামান্য বাংলা জানেন এমন ইউরোপীয়ের কাছ থেকে প্রশংসাপত্র এনে বিজ্ঞাপন হিসাবে ব্যবহার করার পদ্ধতি আমাদের দেশে খুব চল্‌তি আছে।

—অতি সামান্য বাংলা জেনে বাংলা রচনা সম্বন্ধে প্রশংসা পত্র দেয় এমন কোনো ইউরোপীয়ের নাম তো শুনি নি।

—আজ্ঞে বাংলা তো দূরের কথা। নিজের মাতৃ-ভাষাতেও তিনি যে একটা বিশেষ দিগ্‌গজ তার প্রমাণও এমন কিছু পাই নি আমরা।

এবার আর রোলাঁ আমার কথার কিছু জবাব দিলেন না। আমি এতক্ষণ তাঁর সঙ্গে ইংরেজীতেই কথাবার্ত্তা চালাচ্ছিলুম। যদিও রোলাঁ ইংরেজী একেবারেই জানেন না, তবে আমার সে ভাষা ইংরেজী না জানলেই ভাল বুঝতে পারা যায় বলে, এতক্ষণ তাঁর বুঝতে কিছু কষ্ট হচ্ছিল না।

কিন্তু আমাদের আলোচনার শেষ দিকটায় আমার কথাগুলো তিনি ভাল বুঝতে পারছিলেন না বলে মনে হওয়ায় আমি ফরাসী ভাষাতেই আমার বক্তব্য সুরু করলুম। ফরাসী তাঁর মাতৃভাষা, সেইজন্য আমার ফরাসী বুঝতে তাঁকে বিশেষ বেগ পেতে হচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরে দেখলুম তিনি চেয়ারে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। অগত্যা সে দিনকার মতন আলোচনা স্থগিত রেখে আমিও চোখ বুজলুম। *

* বলা বাহুল্য এই সাক্ষাৎ এবং কথোপকথন স্বপ্নে হয়েছিল—লেখক।

ফেরদৌসির অগ্রদূত কবি দকিকী

মহম্মদ মনসুরউদ্দীন

সামানিয়া বংশের রাজত্বকাল জ্ঞান বিজ্ঞানের নিত্য নব অরুণ-আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। নুহবিন মনসুরের সময় ইহার বিকাশের চরম পরিণতি হইয়াছিল। পারস্যের অতীত গৌরবজনক সামগ্রী, শাহনামা—যাহাকে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবন-অল-আসির "কোরাণ-অল-আজম"—পারস্যের কোরাণ—বলিয়াছেন তাহার রচনা-সূচনা তাঁহার রাজত্বকালেই আরম্ভ হইয়াছিল। ইহা যদি আরম্ভ না হইত তবে সুলতান মাহমুদের ইতিহাসের সহিত ভুবন বিখ্যাত "শাহনামার" অতুলনীয় স্মৃতি বিজড়িত হইত কিনা কে বলিবে ?

সামানিয়া সম্রাটগণ প্রথম হইতেই তাঁহাদের বংশের ও অতীতে পারস্যের কীর্ত্তিকাহিনী, সাধারণ-বোধ্য সহজ সরল ও প্রাঞ্জল কবিতায় দেখিতে অভিলাষী ছিলেন। কিন্তু তখনও পারস্য কবিতার ততদূর উন্নতি হয় নাই। কাজেই তাঁহাদের এই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইতেছিল না। মানুষ চিরদিনই অমর হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে চাহে—কেহ সাধনার মধ্যে এই সাফল্য লাভ করেন, কেহ অবিনশ্বর কীর্ত্তি সৃষ্টি করিয়া চিরন্তনভাবে কালের কপোল তলে আপনার স্মৃতি রাখিয়া যান।

নুহবিন মনসুর ৩৬৫ হিজরাতে সিংহাসন আরোহণ করেন। বোখারায় তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার রাজ সভা বোখারার বিখ্যাত ও বিদ্বান কবিমণ্ডলী দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। তাঁহাদের মধ্যে কবি দকিকী অন্যতম। তাঁহার আসল নাম মনসুর বিন-আহমদ। তিনি কবিজীবনের প্রারম্ভে চোগানিয়া আমির আবুল মুজাফ্‌ফরের নিকট অবস্থান করিতেন। যখন তাঁহার কবি প্রতিভার খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়া ফেলিল তখন সম্রাট নুহ বিন-মনসুর তাঁহাকে সাদর নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার দরবারে লইয়া যান এবং "শাহনামা" রচনা করিবার ভার তাঁহার উপর অর্পণ করেন। তাঁহার নিজের প্রতিভা সম্বন্ধে তাহার দৃঢ় আত্মবিশ্বাস ছিল, কাজেই সানন্দে তিনি এই গুরু কর্ত্তব্যভার অবনত মস্তকে গ্রহণ করেন। তিনি প্রায় বিংশতি সহস্র কবিতা লিখিয়াছেন, কেহ কেহ আবার তাঁহার কবিতা সংখ্যা এক সহস্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহার কবিতা সংখ্যা যাহাই হউক তাহার সমাধান অসম্ভব না হইলেও বর্ত্তমানে অত্যন্ত দুঃসাধ্য। তিনি শাহনামার যে সমস্ত কবিতা লিখিয়া গিয়াছিলেন কবি ফেরদৌসি তাহার শাহনামায় তাহাদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। কবি ফেরদৌসি ইহার উল্লেখ করিয়াই বলিতেছেন,—

জওয়ানে বেআমাদ কোশাদা জবান।
সখ্‌নগুয়া ও খুশ্‌তবে' ও রওশন রওয়াঁ।
বশে'র আরম ই নামারা গুফ্‌ত মান।'
আজউ শাদমান শাদ দিল-ই-আঞ্জুমান।
যে গোক্‌তাস্‌প ও আরজাস্‌প বয়েতে হাজার,
বজোফ্‌ত ওসের আমাদ ওয়রা রোজগার।

একজন বাগ্মী যুবক আসিলেন,
তিনি কবি, রসিক ও গুণী।
তিনি বলিলেন 'আমি এই গল্প কবিতায় লিখিব।'
ইহা শ্রবণ করিয়া দরবারের সকলে পুলকিত হইলেন।
তিনি প্রায় সহস্রচরণ কবিতা, গুশ্‌তাসপ ও খারজাসপ সম্বন্ধে রচনা করিয়াছেন।

এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

কবি ফেরদৌসি কবি দকিকীর কবিতা যে শাহনামার মধ্যে স্থান দান করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়ের পরিচায়ক। ফেরদৌসি যদি শাহনামার

মধ্যে দকিকীর নাম উল্লেখ না করিতেন ও তাঁহার কবিতা গ্রন্থভুক্ত না করিতেন তাহা হইলে বোধহয় দকিকীর নাম সকলের হৃদয়ে এত স্থান অধিকার করিয়া থাকিত না। অতীত কালের অতল অন্ধকারে তাহার অতুল স্মৃতি চিরতরে ডুবিয়া থাকিত। মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া কবি ফেরদৌসি বড়ই উদারতা দেখাইয়াছেন। হিংসা বা অবহেলা করিয়া দকিকীর কবিতা তিনি দূরে নিক্ষেপ করিয়া ফেলেন নাই। তিনি স্বয়ং শাহনামায় বলিতেছেন—

কম্নু রাজহা বাজ জুয়েম তোরা,
হদিসে দকিকী বগুয়েম তোরা।
চুনান দিদ গুয়েন্দা এক শব বখাব।
কে একজাম মিদাশ্‌তে চুন গুলাব।
দকিকী যে জায়ে পদিদ আমাদে,

বদাঁ জাম মায় দাস্তানহা জদে।
ব ফেরদৌসি আওয়াজ দাদে কে মায়,
মখোর জয় আইন-ই কাউস কায়।
কে শাহে গজিদি যে গীতি কেতখ্‌ত.
বনাজ, বদোতাজ ও শমশির ও বখ্‌ত।
শাহান্‌দা মাহমুদ গিরন্দা শহর.
জে শাদী বহর কাস রেসালন্দা বহর।
বদিনামা গর চান্দ বশেতাফ্‌তে,
কনুন হর্‌ চে জস্তি হামা ইয়াফ্‌তে।
আজ আন্দাজা মান বেশ গুফ তম সোখন,
আগর বাজ ইয়াকু বখিলী মাবন।
জেগোশ্‌তাস্‌প ও আর্‌জাস্‌প বয়েতে হাজার,
বগোফতাম সর আমাদ মারা রোজগার।
গর্‌ আঁ মায়া নজদে শাহানা রশদ,
রওয়ানে মান আজ খাক্‌ বর মা রসদ।
বদানদ কে পেশ আজতু আখের কাসে,
দর্‌ইঁ দাস্তান রঞ্জ বোর্‌দন বসে।
পজির ফতম ও দাশতম জেউ সেপাস,
মরা দর দিল্‌ আমাদ জে হর সু হয় আস।
কে রোজে মরা হাম এবায়েদ গোজাস্ত,
জে গোফ্‌তাবে উদর না শায়েদ গোজাস্ত.
জে গোফতারে উ বশোনো, আকুনুন সোখন।
গোফতাআস্ত ইঁ-দাস্তান-ই কোহন।

—আমি পুনরায় আপনাদের জন্য রহস্য সন্ধান করিব, এবং আপনাদিগকে দকিকীর কথা বলিব।

—বক্তা একদিন স্বপ্নে দেখিলেন যে, তিনি গোলাপের মত লাল এক পেয়ালা মদ ধরিয়া রহিয়াছেন।

—দকিকী এক স্থান হইতে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং সে মদপূর্ণ পাত্রের সাতিশয় প্রশংসা করিলেন। তিনি ফেরদৌসিকে ডাকিয়া বলিলেন যে, মদ সম্রাট কায়কাউসের ন্যায় ব্যতীত গ্রহণ করিও না। তুমি একজন সম্রাটকে মনোনয়ন করিয়াছ যাহার সিংহাসন, তরবারী অদৃষ্ট গর্ব্বিত। শাহানশা মাহমুদ, যিনি দেশ বিদেশ জয়ী, সকলকেই তাঁহার আনন্দ পরিবেশনে অনুগৃহীত করিয়াছেন। যদি তিনি এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে অগ্রসর হইতেন, তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই প্রাপ্ত হইতেন।

—সাধারণের অনুমান হইতেও আমি অধিক কবিতা রচনা করিয়াছি। যদি তুমি তাহা হইতেও অধিক বলিতে পার তবে কৃপণতা করিও না। আমি গুস্তাশপ ও আর্‌জাস্‌পের প্রশংসায় সহস্র কবিতা লিখিয়াছি। উহা রচনা হইলে আমার শেষদিন আসিয়াছিল।

—আমার সেই মূল্যবান কবিতা যখন সম্রাটের নিকট পৌছিবে তখন আমার আত্মা এই মাটির দেহ পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্ররাজ্যে পৌছিবে। লোকে তাহা হইলে জানিতে পারিবে যে, তাহার পূর্ব্বে একজন এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি যাহা বলিলেন তদনুসারেই কার্য্য করিলাম আমার হৃদয়ে প্রতি দিক হইতে ভয়ের

* এই প্রবন্ধ লিখিতে শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক আগা মুহম্মদ কাজেম শিরাজী সাহেব ব্যক্তিগত ভাবে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।—লেখক।

সৃষ্টি হইতেছে। এমন একদিন আসিবে যেদিন আমাকেও এস্থান হইতে চলিয়া যাইতে হইবে, কাজেই তাহার অনুরোধ আমি উপেক্ষা করিতে পারিলাম না।

এখন তাঁহার কবিতা শ্রবণ কর

যে এই পুরাতন কাহিনী এইভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

(২)

দকিকীর জীবনে এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। তাঁহার একজন সুন্দর ও সুশ্রী ভৃত্য ছিল, তাহার প্রতি কবি অতিশয় আকৃষ্ট ও অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, ভৃত্য তাঁহার গভীর প্রণয় ও স্নেহের কোনই প্রতিদান করে নাই প্রত্যুত তাঁহার হত্যা সাধন করে। ফেরদৌসি এই অপ্রীতিকর ঘটনার প্রতি উদ্দেশ করিয়াই বলিয়াছেন—

জওয়ানবা থুয়ে বদইয়ার বুদ,
আবা বদ হামেশা ব পয়কার বুদ।
একাএক আজউ বখ্‌ত বরগাশ্‌তা শোদ,
বদস্তে একে বান্দায়ে কোশ্‌তা শোদ,

—যুবক ভৃত্যের স্বভাব খারাপ ছিল, এবং সকল সময়ই দকিকীর সহিত ঝগড়া করিত। হঠাৎ একদিন তাহার ভাগ্য বিরূপ হইল,

ভৃত্যের হস্তে তিনি নিহত হইলেন।

দকিকী 'মসনবী' 'কাসিদা' ও গজলের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন।

পারস্য সাহিত্য আরবী সাহিত্যের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রভাবান্বিত হইয়া গিয়াছিল। সর্বপ্রথম দকিকীই এই প্রভাব বিদূরিত করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কবি ফেরদৌসি তাঁহার সমগ্র শাহনামার মধ্যে মাত্র কয়েকটি আরবী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া যে প্রসিদ্ধি আছে তাহা হইতেই দকিকীর প্রচেষ্টার সাফল্য অনুধাবন করা যাইবে। আরবী প্রভাবের মধ্যে থাকিয়াও এই সংমিশ্রন-প্রভাব হইতে তাঁহার কবিতা সম্পূর্ণ মুক্ত; যথা—

চু গুশতাস্‌প রা দাদ লহরাস্‌প তখ্‌ও,
ফরুদ আমাদ আজ তখ্‌ও ও বরবস্ত বখ্‌ও।
বল্‌খ গজি শোদ বদাঁ নও বাহার,
কে ইয়াজদান পরস্তানে আঁ রোজগার।
মর আঁ খানা রা দাশ্‌তান্দে চুনান,
কে মর মক্কা রা তাজিয়ান ই জমান। *

[যখন লহরাস্‌প গুশ্‌তাস্‌পকে সিংহাসন সমর্পণ করিলেন তখন তিনি সিংহাসন আরোহণ করিলেন এবং বলখ অভিমুখে যাত্রা করিলেন; সেই স্থান মনোনয়ন করিলেন, যেখানে খোদা তত্ত্বান্বেষী সাধকের বেশী বিবসতি।

তিনি সেই গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ এমনভাবে করিলেন যেমনভাবে আজকাল আরববাসীরা মক্কার রক্ষণাবেক্ষণ করে।]

আজকাল Natural Poetry বলিয়া যাহা সাহিত্য রসিকগণের অতীব প্রিয়, পারস্য কবিকুল মধ্যে দকিকীই পারস্যে উহার প্রথম লেখক। উদাহরণ স্বরূপ বসন্ত সম্বন্ধে তাঁহার একটি কবিতার কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,—

সহরগাহান কে বাদে নব্‌ম জম্বর,
বজম্বানদ্ দরখন্তে সোরখ ও আসফর।
তু পেন্দারী কে আজ গরদূনে মে তারা,
হামী বারিদ বর দিবায়ে আখজর।

* এই কবিতা কয়েক ছত্রে লক্ষ্য করিবার বিষয়, ইহাতে কোন আরবী শব্দ ব্যবহার হইয়াছে কি না। আমার ভয় হয় বাঙালী পাঠক আরবী পারশী ভাষা না জানায় ইহারপ্রতি সম্যক সুবিচার করিতে পারিবেন না, এবং এই জন্যেই মাত্র নমুনাস্বরূপ অল্প কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—লেখক।

নেগার আন্দর নেগার ও লুঁদর লু,
হাজারান্ দরশোদাহ পয়কার বা পয়কার।

[প্রভাতে শান্ত সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে, ইহাতে হলুদ ও লাল ফুলের গাছ আন্দোলিত হইতেছে। তোমার মনে হইবে যেন আকাশ হইতে নক্ষত্র সমূহ, পৃথিবীর সবুজ গালিচার উপর যেন ঝরিয়া পড়িয়াছে! তাহারা দেখিতে সুন্দর ও সুশ্রী, এবং বিভিন্ন বর্ণের, সহস্র সহস্র পুষ্প পরস্পরের পাশাপাশি প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে।] মদ ও প্রিয় সম্বন্ধে এই ধরণের অন্য একটি কবিতায় বলিতেছেন,

দর আফগান্দ, আয়ে সনম্ আবরে বেহেশ্‌তী,
জমিন রা খেলায়েতে উর্দ্দি বেহেস্তী।
জমিন বরসা খুন আলুদা দিবা,
হাওয়া বরসা মেন্দক্ আন্দদাহ দশ্‌তী।
বদী মানদ কে গুয়ী আজমায় ও মেশক,
মেদশালে দোস্ত বর সহরা নারেশ্‌তী।
বোতে রোখসারে উ হামরঙ্গে ইয়াবুত,
মায় বর গুনায়ে জামা কনস্তী।
জাহান তাউস গুনা গশুগুয়ী।
বজায়ে নরমী ও জায়ে দরস্তী।
জেগুল বুয়ে গুলাব আয়েদ বদীসা,
কে পেন্দারী গুল আন্দর গুল সেরস্তী।
দকিকী চার খসলত বরগজিদাস্ত,
বগিতী আজহামা খুবী ও জস্তী।
লবে ইয়াকুতরঙ্গ ও নালায়ে চঙ্গ,
মায়ে খুন্ রঙ্গ ওকিশে জওয়াস্তী। *

[হে মোর প্রিয়, বসন্ত মেঘ অবিশ্রান্ত বারি বর্ষণ করিতেছে, এবং পৃথিবীকে সবুজ সাজ পরাইয়া দিয়াছে।

পৃথিবীর বুকে রক্ত-রঙীন লালা ফুল ফুটিয়া খুন মাখা দেখাইতেছে, এবং বাতাস কস্তুরী গন্ধে দিগদিগন্ত আমোদিত করিতেছে। প্রকৃতি যেন আম্বর ও কস্তুরীর আধিক্য বশতঃ খোলা মাঠে সুন্দরী প্রিয়তমার মত দেখাইতেছে। প্রিয়তমার গণ্ড যেন কোহিনুরের মত উজ্জল, এবং আঙুর লতা যেন আগুনের আচ্ছাদনে আবৃত রহিয়াছে। ধরণী যেন একটি নয়নাভিরাম ময়ূরের মত দেখাইতেছে, ইহার কোথাও নরম আর কোথাও শক্ত। গোলাপ ফুল হইতে যেন গুলাব-জলের গন্ধ আসিতেছে, তাহাতে মনে অসংখ্য গোলাপ ফুল যেন স্তূপীকৃত হইয়া আছে। সমস্ত জগতের মধ্যে যাহা ভাল ও মন্দ আছে তাহার মধ্যে দকিকী চারিটি জিনিস মনোনীত করিয়াছে,

—ইয়াকুতের মত ওষ্ঠ, বীণার ঝঙ্কার, লাল রঙীন মদ ও জুরস্ত্রারের ধর্ম্ম।

মৌলানা শিবলী বলিয়াছেন, ফেরদৌসি খোদাই-সোখনাস্ত—ফেরদৌসি কাব্যের ব্রহ্মা—সুতরাং তাঁহার সহিত কবি দকিকীর কাব্য তুলনা অনেকের কাছে ধৃষ্টতা বলিয়া মনে হইতে পারে। দকিকীরও বর্ণনা ও বক্তব্য বিষয় হৃদয়গ্রাহী তাহা পাঠকের বিচার শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই একটি কবিতা তুলিয়া দিতেছি,—

জেবসে বাঙ্গে আস্পান ও জোশ ও খরুশ,
হামী নালায়ে কুন্ নাশনিদা গোশ।
দরকেশান বেসিয়ার আফরাশতা,
সেরে নিজহা জাবর বগোজাস্তা।

* He (Dakiki) is said to have been a Zoroostrian by some scholars, who base their statement on one of his lyrics which gives the poets view of the worlds four choicest blessings as ruby lips, the music of the harp, Zoroostris teachings and red wine The conjunction of Zoroostrianism with the couven-tional hedonism may, however, be merely a touch of antiquary appearing in the poet. In any case there is a little or no foundation but this verse for the assumption that the poet was anything but a muslim, which, to judge from other fact, he probably was.—Vide Persian literature by Prof. R. Levy M A. (Oxford Univarsity Press) P. 21.

চোরাস্তা দরখক্ত আজ্বরে বুহসার।
চু বিশা নিস্তান বওয়াক্তে বাহার।
জে তারিকী জেরদ ও বাজে সেপাহ,
কাসে রোজ রওশন, নমিদিদা ওয়ার।
বকরদান্দ তির বারাণ নখস্ত,
বসা তগরগে বাহার আঁ দোরস্ত
বপুশিদা শোদা চশমায়ে আকতাব,
জে পায়কানহায়ে দরখাশান চুন্ আব।
তু গুফতী হাওয়া আবর আরদ হামী,
ও আজ আঁ আবর-অল-মাস বারদ হামী।
হাওয়া জিঁ জাহান বুদ শবগুণ শোদা।
জমিন সের বসের পাকেদর খুন শোদা।
দরুউ দশ্ তাহা শোদ হামা লালা গুন,
বং দশ্ ত ও বিয়াবান হামিরেখক্ত খুন।
চুনান শোদ যে বস কোশ্ তা রজমগাহ,
কে বরদী না তা নস্ত রফতান নেগাহ।

[অশ্বের হ্রেষা ধ্বনি ও সৈন্যদলের সোরগোল নিবন্ধন ঢোলের শব্দও শ্রুত হইতেছিল না।

অসংখ্য পতাকা ঊর্দ্ধে উত্তোলিত হইয়াছিল, এবং বর্ষা ফলক সমূহ আকাশ ভেদিয়া উঠিয়াছিল। পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর যে সমস্ত বৃক্ষ জন্মিয়াছে এবং ঘন পত্রময় বংশঝাড় সমূহ যেন সৈন্যদলের গমন জনিত ধূলায় ও শব্দে সমাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, ইহার জন্যই যেন দিনের আলোও নিভিয়া গিয়াছে এবং পথও দেখা যাইতেছে না!

সৈন্যদল প্রথমে তীর নিক্ষেপ করিল, যেন গ্রীষ্মকালে শিলা-বৃষ্টি! সূর্য্যের আলোও যেন মলিন হইয়া আসিল, দীপ্ত বর্ষা ফলকের উজ্জলতায়। তোমার মনে হইবে যেন সমস্ত আকাশ মেঘে আঁধার করিয়া আছে, এবং সে মেঘ হইতে মুক্তা বিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে।

চতুর্দ্দিক ধূলায় অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, পৃথিবীর বুক যেন রক্তে রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছে। সমস্ত জিনিষই লাল লালা ফুলের মত লাল হইয়া গিয়াছে,—মাঠ ও কর্ষিত ভূমিতে যেন রক্ত নদী প্রবাহিত হইতেছে। এত অসংখ্য লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। এবং স্তূপাকার হইয়া গিয়াছিল যে বেশী দূর লোকের দৃষ্টিপথ চলিতে পারিতেছিল না।

Bibliography

(1) A Literary History of Persia, Vol I. by Professor E. G. Browne
(T. Fisher Union & Co, London)

অধ্যাপক ব্রাউনের বইখানি পারশ্য সাহিত্য সম্বন্ধে অমূল্যখনি। যাঁহারা পারস্য সাহিত্য ও সভ্যতা সম্বন্ধে জানিতে চাহেন তাঁহাদের পক্ষে ইহার চেয়ে সুন্দর ও তথ্যপূর্ণ বহি খুব কমই মিলিবে।

(২) শিয়র-উল-আজম (১ম খণ্ড), অধ্যাপক শিব্লী নো'মানী প্রণীত। দারুল-মুসান্নফিন, আজমগড় হইতে প্রকাশিত।

অধ্যাপক নোমানীর বহিখানিও পারস্য কবিগণ সম্বন্ধে মূল্যবান ও তথ্যপূর্ণ। উর্দ্দূ সাহিত্যের ইহা এক খানি মুকুটমণি গ্রন্থ।

(৩) সোখন-দান-ই-ফারেস—অধ্যাপক হাসান মুহম্মদ আজাদ। আজাদ বুক ডিপো, দিল্লী হইতে প্রকাশিত।

অধ্যাপক আজাদের বহিখানিতেও অনেক খবর পাওয়া যায়। প্রাচীন আলোচনা রীতি অনুসারে ইহা উর্দ্দূতে লিখিত।

(৪) (ক) Dakiki—Encyclopœdea Britanica
,,—Encyclopœdia of Islam.

(৫) Parsian Literature
by Prof. R. Levy, M. A.
(Oxford Univarsity Press).

পারস্য সাহিত্য সম্বন্ধে ইহা একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক হইলেও অল্প কথায় অনেক সংবাদ ইহার মধ্যে পাওয়া যাইবে। এই পুস্তকখানি পারস্য সাহিত্য সম্বন্ধে ভূমিকা বলা যাইতে পারে!

মীনকেতন

ন্যুট হামসুন

অনুবাদক—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ছাব্বিশ

সারা সন্ধ্যা ধরেই ভাবছিলাম পার্টিতে না এলেই ভালো ছিল। আমি যে এসেছি, কেউ একবার চেয়েও দেখল না,—এত ব্যস্ত সবাই ; এড্‌ভার্ডা একটু অভিনন্দন দিলে না পর্য্যন্ত। খুব ক'রে মদ খেতে লেগে গেলাম ; আমাকে কেউ চায় না এরা,—তবু চলে' গেলাম না।

ম্যাক বেশ অমায়িক, খুব হাসছে,—সুন্দর সেজেছে। একবার এঘরে আরেকবার ওঘরে এমনি ছুটোছুটি করছে, অভ্যাগতদের সঙ্গে ফষ্টি-ইয়ার্কি করছে, মাঝে মাঝে একটু নাচছেও। ওর দুই চোখের তলায় যেন কি একটা লুকানো ইসারা।

সমস্ত ঘরটার মধ্যে গান ও বাজনার জোয়ার চলেছে। বড় নাচঘরটা ছাড়া আরো পাঁচটা ঘর এই সব নিমন্ত্রিতদের দিয়ে একেবারে ঠাসা। আমি যখন এসে পৌছুলাম, খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। পরিচারিকারা মদের গ্লাস, আর চুরুট নিয়ে ছুটোছুটি করছে,—কিছুরই অভাব নেই। বাতিদানে নতুন বাতি জলছে।

এভা রান্নাঘরে থেকে সাহায্য করছিল বুঝি,—একবার ওকে দেখলাম। এভা পর্য্যন্ত এখানে!

ব্যারণের ওপরেই সবাইর চোখ,—যদিও আজ ও বেশ নম্র,—বেশি চালবাজি করছে না। এড্‌ভার্ডার সঙ্গে খুব বকছে, চোখে চোখে রাখছে,—মদও খেল দু'জনে। ওর প্রতি তেমনি বিতৃষ্ণা অনুভব করছি, কঠিন ও কটু দৃষ্টি নির্ম্মল না করে' ওর দিকে তাকাতে পারছি না।

সে সন্ধ্যার একটা কথা আজো মনে আছে। একটি মেয়ের সঙ্গে কথা কইছিলাম,—কোনো গল্পই বলছিলাম হয় ত',—শুনে ও হাসছিল। হাসবার মতো বিশেষ কিছুই নয়,—তবু ব্যাপারটাকে এমন ভাবে বলেছিলাম যে ও হেসে উঠেছিল,—মনে নেই সে কথা। যাই হোক, চোখ ফিরিয়ে দেখি পেছনে এড্‌ভার্ডা। ও যেন আমাকে চিনতে পেরেছে,—এতক্ষণে।

তারপরে দেখলাম ও সেই মেয়েটিকে টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করছে,—আমি ওকে কি বলেছি! সমস্ত সন্ধ্যা অস্থির হয়ে এঘর থেকে ওঘর করে' এখন এড্‌ভার্ডার এই ভীতু চাহনিটে পেয়ে যে কত সুখী হলাম কেমন করে' বলব? মন খুব ভালো লাগল, কত জনের সঙ্গে কত কথা কইলাম!

বাইরে সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে ছিলাম। এভা কি নিয়ে যেন ও ঘরে যাচ্ছিল। আমাকে দেখেই ও এগিয়ে এসে তাড়াতাড়ি আমার হাতটা ছুঁয়ে হেসে চলে' গেল। একটিও কথা হ'ল না। যেই ওর পেছনে যাচ্ছিলাম— বারান্দায় এড্‌ভার্ডা,—আমাকে দেখছে। ওও কিছু বল্লে না। ঘরের মধ্যে গেলাম।

হঠাৎ এড্‌ভার্ডা জোরে বলে' উঠল,—"লেফটেনেণ্ট গ্লাহন সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে চাকর-বাকরদের সঙ্গে রসিকতা করে!" কেউ কেউ শুনল। যেন ঠাট্টা করে' বলছে, তাই ও হাসল একটু, কিন্তু বিবর্ণ ওর মুখ।

এর কিছু প্রতিবাদ করলাম না, শুধু আবছা গলায় বল্লাম—"হঠাৎ দেখা হয়ে গেল,—ও আসছিল, বারান্দায় হঠাৎ ..."

কিছুক্ষণ কাটল, এক ঘণ্টা হয় ত'। একটি মহিলা তাঁর পোষাকের ওপর একটা মদের গ্লাশ উল্টে ফেলে

দিলেন। যেমনি দেখা, এড্‌ভার্ডা চেঁচিয়ে উঠ্‌ল,—"কি হল? গ্লাহন নিশ্চয়ই ফেলে দিয়েছে।"

মোটেই নয়,—গ্লাহ্‌ন তখন ঘরের আর এক কোণে বসে' গল্প করছে।

ব্যারণ মেয়েদের নিয়ে খুব মেতেছে,—ওর জিনিস পত্র সব প্যাক্‌ করা হয়ে গেছে, তাই সেগুলো দেখাতে পারা গেল না দেখে ওর আপ্‌শোষের অন্ত নেই,—শ্বেত সাগরের আগাছা, কোবহলমার্ণ-এর মাটি,—সমুদ্রের তলা থেকে কত রকম পাথর। মেয়েরা কৌতূহলী হয়ে ওর জামার বোতাম দেখছে,—পাঁচ মুখ-ওয়ালা রাজমুকুট,—ও ব্যারণই বটে। ডাক্তার কিন্তু চুপচাপ বসে' আছে,—খালি মাঝে মাঝে এড্‌ভার্ডার ভাষার ভুল ধরছে।

এড্‌ভার্ডা বল্লে—"যদ্দিন না আমি মরণের দেশে পেরিয়ে যাই।"

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলে—"কি পেরিয়ে?"

"মরণের দেশ!—তাই কি বলে না?

"আমি ত' শুনেছি মরণের নদী,—বৈতরণী! তুমি কি তাই বল্‌তে চাও?

দরজার পাশে চুপ করে' দাঁড়িয়ে থাকি। এক শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে ভাব করে' আলাপ সুরু করি,—যুদ্ধের কথা, ক্রিমিয়ার অবস্থা, ফ্রান্সের ঘটনা, সম্রাট হিসাবে নেপোলিয়ঁ,—মহিলাটি সব খবর রাখে,—আমাকে বহু খবর জানালে। একটা সোফায় বসে' দু'জনে গল্প করি।

এড্‌ভার্ডা আসে, আমাদের সমুখে দাঁড়ায়। হঠাৎ ও বলে,—"তুমি আমাকে মাপ কর লেফ্‌টেনেণ্ট্‌। আমি ও রকম কাজ আর করব না।"

একটু হাস্‌ল, আমার দিকে যদিও চাইল না।

বল্লাম, -"জোমফ্রু, এড্‌ভার্ডা, চুপ কর।"

আবার ওর চোখ কুটিল হয়ে উঠেছে। বল্লে,—"রান্না ঘরে যাচ্ছ না যে? এভা সেখানে আছে,—তোমার সেখানে যাওয়া উচিত।"

ওর চোখে কী ঘৃণা!

"তোমার কি একটুও ভয় হচ্ছে না যে তোমার কথার মানে লোকে অন্য ভাবে নেবে, ভুল বুঝবে?"

"কি ক'রে?—হয় ত, কিন্তু কি করে' আর অন্য অর্থ হবে তার?"

"না বুঝে শুঝে কি সব বাজে বক্‌ছ তুমি! যেন তুমি আমাকে সত্যি সত্যিই রান্না ঘরে যেতে বল্‌ছ, লোকে হয় ত তাই ভাববে কিন্তু তা ত' নয়,—তুমি ত' এত অবুঝ নও।"

চলে গেল,—আবার এসে বল্লে,—"কিছুই ভুল বোঝবার নেই লেফটেনেণ্ট,—ঠিকই শুনেছ তুমি, আমি তোমাকে সত্যি সত্যিই রান্নাঘরে যেতে বল্‌ছি।"

"এ কি এড্‌ভার্ডা!" শিক্ষয়িত্রী চেঁচিয়ে উঠেছে।

আবার আমরা যুদ্ধ ও ক্রিমিয়ার অবস্থা নিয়ে গল্প সুরু কর্‌লাম। সব কেমন যেন গুলিয়ে গেছে,—যেন মাটিতে কোথাও অবলম্বন নেই। সোফা ছেড়ে উঠে চলে যাচ্ছিলাম, ডাক্তার এসে বাধা দিল।

বল্লে,—"এতক্ষণ তোমার প্রশংসা শুনছিলাম।"

"প্রশংসা? কার কাছ থেকে?"

"এড্‌ভার্ডা প্রশংসা করছিল। ঐ কোণে দাঁড়িয়ে ও তোমাকে দীপ্ত মুগ্ধ চোখে দেখছে। সেই চোখ আমি ভুলব না,—প্রেমে পরিপূর্ণ দুটি চোখ! জোরে বলছিল পর্য্যন্ত যে, ও তোমাকে ভালবাসে।"

"বেশ, বেশ!" হেসে বল্লাম।

ব্যারণের কাছে গিয়ে নীচু হয়ে ওর কানে কানে কিছু বলতে চাইলাম,—আর যেই ওর কানের কাছে মুখ এনেছি, এক গাদা থুতু ছিটিয়ে দিলাম। ও লাফিয়ে উঠে, আমার দিকে বোকার মতো তাকিয়ে রইল। পরে দেখলাম এই কথা আবার এড্‌ভার্ডাকে বল্‌ছে,—এড্‌ভার্ডার মুখ ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয়ে গেছে! ওর হয়ত' তখন মনে পড়ছিল, সেই ওর জুতো জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম, সেই গ্লাসবাটিগুলি ভেঙ্গে ফেলেছিলাম,—নিশ্চয়ই ভাবছিল সে সব! ভারি লজ্জিত বোধ করছিলাম,—যেদিকে ফিরি সেই দিকেই বিরক্ত ও বিস্মিত চোখ,—আমার দিকে চেয়ে আছে। বিদায় বা ধন্যবাদ কিছুই না জানিয়ে চুপে চুপে সিরিলাণ্ড থেকে পিট্টান দিলাম।

সাতাশ

ব্যারণ চলে যাচ্ছে,—বেশ, ভালো কথা। আমি আমার বন্দুক নিয়ে পাহাড়ে গিয়ে এড্‌ভার্ডার আর ওর সম্মানে একটা গুলি ছুঁড়ব। একটা পাহাড়ের গায়ে ফুটো করে' পাহাড়টাকে উড়িয়ে দেব—ওর আর এড্‌ভার্ডার সম্মানে। যেই ওর জাহাজ পাল তুলে চল্‌তে সুরু করবে অমনি একটা পাহাড়ের ঢিপি গড়িয়ে এসে সমুদ্রে আছড়ে পড়ে ভীষণ শব্দ করে' উঠবে। আমি জানি, যেখান থেকে পাহাড়ের ঢিপি সোজা সমুদ্রের মধ্যে গড়িয়ে আসে,—দিব্যি রাস্তা হয়ে গেছে।

কামারকে বলি,—"আরো ছুটো পাহাড় বিঁধ্‌বার সুচ্‌ চাই।"

কামার তৈরি করতে বসে যায়।

এভা ম্যাক-এর একটা ঘোড়া নিয়ে কারখানা থেকে জাহাজঘাটের মধ্যে খালি ছুটোছুটি করছে। ওকে মুটে মজুরের কাজ দেওয়া হয়েছে,—ময়দার বস্তা নিয়ে বেড়ানো। ওর সঙ্গে দেখা,—তাজা মুখের কি মিষ্টি চাহনি। কি সুস্নিগ্ধ ওর হাসি! রোজ সন্ধ্যায়ই ওর সঙ্গে দেখা হয়।

"তোমাকে দেখে মনে হয় এভা, তোমার মনে কোনো কষ্ট নেই। তুমি আমার প্রিয়া।"

"তোমার প্রিয়া! আমি অশিক্ষিত মেয়ে,—তা হলেও আমি তোমার বাধ্য থাক্‌ব চিরকাল। ম্যাক্‌ দিন-কে-দিন ভারি কড়া হচ্ছে, কিন্তু আমি তা কেয়ার করি না। মাঝে মাঝে দারুণ খাপ্পা হয়ে ওঠে, কিন্তু আমি কোনো কথারই জবাব দিই না। একদিন আমার হাত ধরে শাসিয়েছিল। শুধু একটা চিন্তাই আমাকে পীড়া দেয়।"

"কি?"

"ম্যাক্‌ তোমাকে ভয় দেখায়। আমাকে বলে,—তোমার মাথায় কেবল লেফটেনেন্ট ঘুরে বেড়াচ্ছে।' বলি, —হাঁ, আমি তার।' তখন সে বলে,—'আচ্ছা, দাঁড়াও,—শিগগিরই ওকে তাড়াচ্ছি।' কালই এ কথা বলেছিল।"

"বলুক গে,—দেখাক্‌ ভয়...। এভা, তোমার পা ছু'টি আরেকবার দেখতে দেবে?—সেই ছোট্ট ছু'খানি পা। চোখ বুজে যাক্‌, আমি দেখি।"

চোখ বুজে ও আমার ঘাড়ের ওপর মুখ রাখে। কাঁপে। ওকে বনে নিয়ে যাই। ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমোয়।

আটাশ

পাহাড়ে বসে' পাহাড় খুঁড়ি। স্বচ্ছ শরৎ আমাকে বেষ্টন করে' হাস্‌ছে। আমার পাহাড় ভাঙ্‌বার শব্দ বেজে চলেছে। ঈশপ্‌ আশ্চর্য্য হয়ে আমার মুখের দিকে তাকায়। হৃদয় সান্ত্বনায় ভরা,—কেউ জানে না যে এই নির্জ্জন পাহাড়ের ওপর একা বসে' আছি।

পাখীরা বিদায় নিয়েছে;—সুখে উড়ে এসেছিল, আবার তোমাদের অভ্যর্থনা করছি। সব মধুরতর লাগ্‌ছে—একটা ঈগল ছুই ডানা বিস্তৃত করে' পাহাড়ের ওপর উড়ে চলেছে।

সন্ধ্যা। হাতুড়িটা ফেলে রেখে একটু জিরোই। আবছায়া,—উত্তরে চাঁদ ওঠে, প্রকাণ্ড ছায়া ফেলে পাহাড়গুলি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।—পূর্ণিমা, যেন একটা উজ্জ্বল দ্বীপ,—অবাক্‌ হয়ে চেয়ে থাকি। ঈশপ্‌ও চঞ্চল হয়ে ওঠে।

"কি ঈশপ্‌? আমি না হয় বেদনায় শ্রান্ত,—আমি তা ভুলে যাব একদিন, নিশ্চয়ই। চুপ করে, শুয়ে থাক, ঈশপ। আমিও চুপ করে' থাক্‌ব। এভা আমাকে শুধোয়, 'তুমি আমার কথা মাঝে মাঝে ভাব?' বলি,—'সব সময়।' এভা আবার বলে,—'আমাকে ভাব্‌তে তোমার ভালো লাগে? বলি,—'সব সময়েই সুখ হয়।' এভা বলে—'তোমার চুলে পাক ধরেছে।' বলি, 'হাঁ, পাক ধরতে সুরু করেছে।' এভা বলে,—'নিশ্চয়ই তোমার মাথায় কিসের চিন্তা,—তাই।' বলি—'হ'তে পারে।' তারপর এভা বলে—'তা হ'লে তুমি আমার কথাই খালি ভাব না...' ঈশপ, চুপ করে' থাক,—তোমাকে আরেকটা গল্প বল্‌ছি..."

হঠাৎ ঈশপ্‌ দাঁড়িয়ে উঠে জোরে নিশ্বাস ফেলে,

আমার জামা ধরে' টানে, টেনে নিয়ে চলে। উঠে পড়ি। বনের মধ্যে আকাশে রক্তের আভা দেখে শিউরে উঠি। জোরে পা ফেলে চলি,—সমুখে দেখি,—প্রকাণ্ড আগুন। স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে থাকি... আরো একটু এগোই,—আমার কুঁড়ে ঘরে আগুন লেগেছে।

উনত্রিশ

এই আগুন লাগানো নিশ্চয়ই ম্যাক্-এর কাজ,—গোড়া থেকেই বুঝ্‌তে পেরেছিলাম। সব পুড়ে গেল -আমার পাখীর বাসা, পাখীর পালক, হরিণের চামড়া,—সব। কি আর করব এখন? খোলা আকাশের তলে শুয়ে দুই রাত্রি কাটাই,—আশ্রয় খুঁজ্‌তে কোথাও যাই না, সিরিলাণ্ড-এও নয়। শেষে একটা পড়ো জেলে-বাড়ী ভাড়া করলাম। বস্তার ওপর শুয়ে ঘুমাই। আর কি,—আমার অভাব মিটে গেছে।

এড্‌ভার্ডা একদিন সংবাদ পাঠাল যে, আমার বিপদের কথা শুনে ও দুঃখিত হয়েছে,—ওর বাবার হয়ে সিরিলাণ্ড-এ আমাকে একখানা ঘর ছেড়ে দিচ্ছে। এড্‌ভার্ডার মনে লেগেছে! দয়ালু এড্‌ভার্ডা! কোনো জবাব দিলাম না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমি আর আশ্রয়হীন নই,—এড্‌ভার্ডাকে চিঠি দিলাম না ভেবে খুব গর্ব্ব অনুভব করছি। রাস্তায় ওকে হঠাৎ দেখ্‌লাম, ওর সঙ্গে ব্যারণ,—বাহুতে বাহু বেঁধে বেড়াচ্ছে দু'জন। ওদের দু'জনের মুখের দিকে চেয়ে নমস্কার করলাম।

এড্‌ভার্ডা জিজ্ঞাসা করলে—"তা হ'লে আমাদের সঙ্গে তুমি থাক্‌বে না?"

"নতুন জায়গা পেয়েছি, সেখেনেই আছি বেশ।" বল্লাম।

ও আমার মুখের দিকে তাকাল, ওর বুক দুলছে।—"আমাদের কাছে এলে তোমার কিছু ক্ষতি হ'ত না।"

ধন্যবাদ তোমাকে এড্‌ভার্ডা। কিন্তু কথা বলতে পারছিলাম না।

ব্যারণ আস্তে আস্তে হাঁটছে।

এড্‌ভার্ডা বল্লে,—"তুমি হয় ত আমার সঙ্গে আর দেখা করতে চাও না।"

"আমার ঘর পুড়ে' গেছে শুনে তুমি আমাকে আশ্রয় দিতে চেয়েছ, তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ এড্‌ভার্ডা! তোমার বাবা বিমুখ হ'লেও তোমার এই করুণা অতুলনীয়।" টুপি তুলে ওকে ধন্যবাদ জানালাম।

হঠাৎ ও বল্লে,—"তুমি কি আমার মুখ আর দেখবে না গ্লাহন?"

ব্যারন্ ওকে ডাক্‌ছে।

বল্লাম,—"ব্যারন্ তোমাকে ডাক্‌ছে, যাও।" আবার সসম্ভ্রমে টুপি তুল্‌লাম।

আবার পাহাড়ে চলে এসেছি, আবার গর্ত্ত করছি। কিছুতেই আর আত্মসংযম হারাচ্ছি না। এভার সঙ্গে দেখা হ'ল।' চেঁচিয়ে উঠ্‌লাম,—"কি বলেছিলাম তখন? ম্যাক্ আমার কি করতে পারে? আমার ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে আবার ঘর পেয়েছি ..." এভা একটা আল্‌কাতরার গামলা নিয়ে যাচ্ছিল। "কি খবর এভা?"

ম্যাক্ তার নৌকায় আল্‌কাত্‌রা লাগাতে ওকে হুকুম করেছে। ওর ওপর লোকটা ভারি চোখা চোখ রাখ্‌ছে,—ওর সমস্ত কথা শুনতেই ও বাধ্য।

"কিন্তু ঐ নৌকাঘরের মধ্যে কেন? জাহাজঘাটে হ'লেই ত পারত।" বল্লাম।

"ম্যাক তাই যে বলেছে, নৌকাঘরে ..."

"এভা, এভা, তোমাকে ওরা দাসী বানিয়েছে, তুমি একটুও অভিযোগ কর না। তুমি হাস্‌ছ, তোমার হাসিতে কি অপূর্ব্ব মাদকতা,—কিন্তু তবু, তবু তুমি ওদের দাসী।"

খুঁড়্‌ছি,—হঠাৎ কি দেখে তাক্ লেগে যায়। কে যেন এখানে এসেছিল;—পায়ের চিহ্নগুলি পরীক্ষা করি,—এ যে ম্যাক্-এর লম্বা মুখো জুতোর দাগ। ও এখানে কেন এসেছিল? চারদিকে তাকালাম,—কেউ নেই।

আবার হাতুড়ি পিটিয়ে শাবল দিয়ে গর্ত্ত করতে লাগ্‌লাম। স্বপ্নেও ভাবি নি—

ত্রিশ

ডাকের জাহাজ এসে গেছে। আমার ইউনিফর্মটা

এনেছে নিশ্চয়ই। এই জাহাজে চ'ড়েই ব্যারন্ তার মাল-পত্র নিয়েই পাড়ি দেবে। এখন বস্তাতে বোঝাই হচ্ছে, বিকেলেই নোঙর তুল্‌বে।

বন্দুক নিই,—প্রত্যেকটা পিপেয় বারুদ বোঝাই করি। ঠিক হয়েছে, মাথা নাড়ি। পাহাড়ে গিয়ে গর্ত্তগুলিও বারুদ দিয়ে ভর্ত্তি করি। সব তৈরী। চুপ করে' প্রতীক্ষা করি।

অনেকগুলি ঘণ্টা কেটে যায়। জাহাজের চাকা ঘুরছে দেখ্‌তে পাই। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।—জাহাজের বাঁশি বেজে ওঠে, এই ছাড়্‌ল বুঝি। আরো কয়েকটা মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করতে হবে,—চাঁদ এখনো ওঠে নি, সন্ধ্যার অন্ধকারের দিকে পাগলের মতো আর্ত্ত চোখ মেলে চেয়ে থাকি।

দেশ্‌লাই জ্বালি। এক মিনিট কাটে। হঠাৎ প্রচণ্ড একটা গর্জ্জন শোনা যায়,—পাথরগুলি টুকরো টুকরো হয়ে চারিদিকে বিকীর্ণ হ'তে থাকে,—সমস্ত পৃথিবী যেন কেঁপে উঠেছে,—যেন সমস্তটা পাহাড় রসাতলে চলেছে। চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনি ওঠে। বন্দুকটা কুড়িয়ে নিয়ে বারুদ ভরা পিপে লক্ষ্য করে আবার ছুঁড়ি। আবার ছুঁড়ি,—দ্বিতীয় বার,—সেই আর্ত্তনাদ যেন দিকে দিকে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। যে জাহাজটা চলে' যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে সমস্ত পাহাড়গুলি যেন চীৎকার করে উঠেছে। আরো সময় যায়,—বাতাস স্তব্ধ হয়ে আসে, প্রতিধ্বনি আর জাগে না, পৃথিবী যেন ঘুমুচ্ছে,—এমনি মনে হয়। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে জাহাজ অদৃশ্য হয়ে যায়।

উত্তেজনায় এখনো কাঁপছি। তাড়াতাড়ি বন্দুক আর শাবল নিয়ে পাহাড় থেকে নেমে যাই,—হাঁটু দুটো কাঁপে। সোজা পথ ধরি! ঈশপ শুধু মাথা নাড়ছে আর বারুদের গন্ধে হাঁচ্‌ছে।

নীচে নৌকাঘরের কাছে এসে একেবারে থ' হয়ে যাই,—চীৎকার করতে পারি না। একটা নৌকা ভাঙা পাথরের চাপে গুঁড়িয়ে গেছে, —এভা, একপাশে এভা পড়ে' আছে,—একেবারে পিষে গেছে, চেনা যাচ্ছে না। এভা মরে' গেছে—

একত্রিশ

আর কি লিখব? বহুদিন আর গুলি ছুড়িনি। খাওয়া নেই—শুধু চুপ করে বসে থাকি আর ভাবি। এভার মৃতদেহটা ম্যাকের শাদা রং-করা নৌকো করে গির্জ্জায় নিয়ে গেল, —গির্জ্জায় গেলাম।

এভা মরে গেছে। তার ছোট মাথাটি তোমাদের মনে আছে,—সেই কোঁকড়ানো কোমল চুলে ভরা? এত আস্তে আস্তে ও আসত, মাথাটি হেলিয়ে একপাশে মৃদু হাসত। মনে আছে সেই হাসিতে কি মাদকতা ভরা। চুপ কর, ঈশপ। বহু দিনের পুরোনো এক আষাঢ়ে গল্প মনে পড়ে, ইসোলীনের সময়কার গল্প—ষ্টমার তখন পুরুত।

রাজপ্রাসাদে বন্দী একটি মেয়ে এক রাজপুত্রকে ও ভালবাসত। কেন? বাতাসকে শুধোও, তারাকে, জীবন-দেবতাকে,—এরা ছাড়া আর কে জানে কাকে বলে ভালবাসা? রাজপুত্র ছিল তার বন্ধু, তার প্রিয়তম,—সময় যায়,—একদিন আর একজনকে দেখে রাজপুত্র ভাবলে তাকেই সে ভালবাসে।

সে প্রেমে কি অপূর্ব্ব মদিরতা ছিল। মেয়েটি ছিল ওর জীবনের আশীর্ব্বাদ—ওর মনের বিহঙ্গম,...মেয়েটির আলিঙ্গন কি মধুর উত্তাপে ভরা। রাজপুত্র বলত,... "তোমার হৃদয় আমাকে দাও।" মেয়েটি দিত। রাজপুত্র বলত,..."আরো কিছু চাইব?" অসহ সুখে মেয়েটি বলত,—'হাঁ'। তাকে মেয়েটি সব দিত,...সব;...কিন্তু তবু রাজপুত্র ওকে ধন্যবাদ দিত না, কৃতজ্ঞতা জানাত না।

কিন্তু আরেকজনকে সে ভালবাসত বন্দী ভৃত্যের মত পাগলের মতো ভিক্ষুকের মতো। কেন? পথের ধূলোকে শুধোও, যে পাতা ঝড়ে তাকে, জীবনদেবতাকে, এ ছাড়া আর কে বলবে কাকে বলে ভালবাসা। মেয়েটি ওকে কিছু দিত না, কিছুই না,...তবু মেয়েটিকে সে কত সুস্নিগ্ধ অভিবাদন কত ধন্যবাদ জানিয়েছে। মেয়েটি বলত,... "আমাকে তোমার বুদ্ধি দাও বন্ধুত্ব দাও। রাজপুত্র দুঃখিত হত কেন ও তার জীবন চাইছে না?

মেয়েটি থাকত রাজপ্রাসাদে......

"ওখানে ব'সে কি কর তুমি? শুধু বসে থাক আর হাস?"

"দশ বছর আগেকার পুরানো কথা ভাবি। তখন তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।"

"তাকে তোমার এখনও মনে আছে?"

"এখনও।"

সময় যায়।

"তুমি ওখানে ব'সে কি কর? কেন ব'সে থাক, কেন হাস?"

"একটা কাপড়ে স্থতো দিয়ে তার নাম লিখ্‌ছি।"

"কা'র নাম?—যে তোমাকে এখানে বন্দী করে রেখেছে?"

"হাঁ, যাকে আমি কুড়ি বছর আগে দেখেছিলাম।"

"তাকে তোমার এখনো মনে আছে?"

"এখনো।"

আরো সময় যায়।

"ওখানে ব'সে কি কর বন্দিনী?"

"দিনে দিনে বুড়িয়ে যাচ্ছি,—আর সেলাই করবার চোখ নেই। দেয়াল থেকে চুণ্‌ বালি খসাই; তাই দিয়ে একটা বাটি তৈরী করছি. তাকে উপহার দেব।"

"কা'র কথা বল্‌ছ?"

"আমার সে প্রিয়তম যে আমাকে এখানে বন্দী ক'রে রেখেছে!"

"তাই কি তুমি হাস,—সে তোমাকে বন্দী ক'রে রেখেছে বলে'?'

"সে এখন কি বলবে তাই খালি ভাবছি। সে হয়ত বলবে,—'দেখ দেখ, আমার প্রিয়া আমাকে একটি বাটী উপহার দিয়েছে,—এই ত্রিশ বছরেও সে আমাকে ভোলেনি।"

আরো সময় কাটে।

"বন্দিনী, এখনো চুপ করে বসে আছ, আর হাসছ?

"বুড়িয়ে গেছি, চোখে আর দেখতে পাচ্ছি না। শুধু ভাবছি।"

"যাকে চল্লিশ বছর আগে দেখেছিলে?"

"যাকে প্রথম যৌবনে দেখেছিলাম। হয়ত চল্লিশ বছর আগেই।"

"সে যে এতদিনে মরে' গেছে—তা কি তুমি জান না? তুমি মলিন, তুমি কথার উত্তর দিচ্ছ না, তোমার ঠোঁট দুটো শাদা হয়ে গেছে,—তুমি আর নিশ্বাস ফেলছ না, :......"

তাই। বন্দিনী মেয়ের গল্প। দাঁড়াও, ঈশপ,—একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। একদিন মেয়েটি তার প্রিয়তমের গলার স্বর শুনতে পেয়েছিল, সে হঠাৎ নতজানু হয়ে লজ্জায় পুলকিত হয়ে উঠেছিল। তখন তার বয়স চল্লিশ।

তোমাকে কবর দিচ্ছি এভা,—তোমার কবরের উপর বালিতে বেদনায় চুম্বন দিচ্ছি। যখনই তোমার কথা ভাবি—সমস্ত স্বপ্নে স্মৃতি রঞ্জিত হয়ে ওঠে। তোমার হাসির কথা যখন ভাবি যেন আনন্দে স্নান করে উঠি। তুমি আমাকে সব দিয়েছিলে,—বিনামূল্যে।—তুমি সৃষ্টির প্রাণবন্ত শিশু ছিলে। কিন্তু যারা আমাকে তাদের একটি দৃষ্টিও উপহার দেয় না তাদের কথাই আমার মন জুড়ে থাকবে? কেন? শুধোও বৎসরের প্রতিটি দিবস ও রাত্রিকে, সমুদ্রের জাহাজগুলিকে, জীবনদেবতাকে ——

—ক্রমশ

আদিম

শ্রীজীবনানন্দ দাশ

প্রথম মানুষ কবে
এসেছিল এই সবুজ মাঠের ফসলের উৎসবে !
দেহ তাহাদের এই শস্যের মত উঠেছিল ফ'লে,
এই পৃথিবীর ক্ষেতের কিণারে,— সব্‌জীর কোলে কোলে
এসেছিল তারা ভোরের বেলায় রৌদ্র পোহাবে ব'লে,—
এসেছিল তারা পথ ধরে' এই জলের গানের রবে !
এই পৃথিবীর ভাষা
ভালোবেসেছিল, ভালো লেগেছিল এ মাটির ভালোবাসা !
ভালো লেগেছিল এ বুকের ক্ষুধা,—শস্যের মত সাধ !
এই আলো আর ধূলোর পিপাসা, এই শিশিরের স্বাদ
ভালো লেগেছিল,—বুকে তাহাদের জেগেছিল আহ্লাদ !
প্রথম মানুষ,—চোখে তাহাদের প্রথম ভোরের আশা !
এসেছিল সন্তান,—
দেহে তাহাদের নীল সাগরের ঢেউয়ের জোয়ার ঘ্রাণ !
শঙ্খের মত কানে তাহাদের সিন্ধু উঠিত গেয়ে' !
শস্যের মত তারা ঐ নীল আকাশের পানে চেয়ে'
গেয়ে গেছে গান !—ধানের গন্ধে পৃথিবীর ক্ষেত ছেয়ে
আলোয় ছায়ায় ফসলের মত করিয়া গিয়াছে স্নান !
সে কোন্ প্রথম ভোরে
প্রথম মানুষ আসিল প্রথম মানুষীর হাত ধ'রে !
ভালো লেগেছিল এ দেহের ক্ষুধা, শস্যের মত সাধ !
এই আলো আর ধূলোর পিপাসা,—এই শিশিরের স্বাদ
ভালো লেগেছিল,—বুকে তাহাদের জেগেছিল আহ্লাদ !
নীল আকাশের প্রথম রৌদ্র ক্ষেতে প'ড়েছিল ঝ'রে !

দীপক

শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

১৭

দীপক একদিন সন্ধ্যার সময় তাহাদের বাড়ী হইতে কিছু দূরে এক দরিদ্র পল্লীর দিকে চলিয়াছে, পথের মাঝখানে ধীরুকে একা বসিয়া থাকিতে দেখিয়া দাঁড়াইল।

একটা অশোকের শাখা মাটীর পানে ঝুকিয়া পড়িয়াছে, ধীরু গাছটায় ঠেস্ দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

দীপক কাছে যাইয়া বলিল, কি ধীরুদা, এমন করে বসে' আছ ?

ধীরু ক্লান্তস্বরে উত্তর করিল, ভাবছিলাম ঈশ্বরের কি ধৈর্য্য! আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে চোখের জল ফেল্‌তে দেখছেন তবু একটু তাঁর মধ্যে ব্যাকুলতা নেই।

দীপক কিছুটা চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, ধীরুদা, তোমাকে প্রায়ই দেখতে পাই তুমি যেন কেমন শ্রান্ত ক্লান্ত, উদাস হয়ে পড়। কোথায় তোমার বেদনা ব্যথা তা' আমি জানি না। কিন্তু একটা যে কোনও জিনিষ তোমার মত লোককেও অভিভূত করে' ফেলে মাঝে মাঝে তা' টের পাই। দুঃখ তোমার বড় একটা কিছু আছে, তা' বুঝি, কিন্তু সে দুঃখ তুমি কেন এতদিনে চিনে নিতে পারনি তা' বুঝতে পারি না।

ধীরেন উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, চল আমিও তোমার সঙ্গে যাই।

দীপক্ বলিল, যাবে চল, কিন্তু তারা তোমাকে বিশ্বাস করবে না।

ধীরেন বলিল, আমি তাদের কাছে যেতে চাই। মনে হয়, পৃথিবীর এই যে এক সুবৃহৎ অভিশপ্ত মানববংশ এদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় না থাকলে, মানুষকে আমাদের জানাই হোল না। মানুষকে ওরা ঘৃণা করে, আবার সেই মানুষেরই কাছে ওরা অন্ন চায়, বস্ত্র চায়, দয়া চায়, ভিক্ষা চায়। ওরা যে নিজের প্রতি কতখানি নিষ্ঠুর তা' তোমার কাছ থেকে শুনে অবধি, আমার মনে মনে তাদের কাছে যাওয়ার একটা মস্ত বড় সাধ ছিল। চল আজ যাই।

দীপক বলিল, তা' চল। কিন্তু তুমি যে আগে কি বল্‌তে চাইছিলে তা ত বললে না ?

ধীরেন কাতরস্বরে বলিল, আমি জানি সে কথা শুন্‌লে তোমার প্রাণে আঘাত লাগবে।

দীপক একটু মৃদু হাসিয়া বলিল, আমার প্রাণে আঘাত লাগে তাতে ক্ষতি নাই। আঘাতগুলিকে আমি খুব আদর করে বুকে তুলে নিই, তাই তারা আমার একান্ত আপন হয়ে যায়।—এখন তোমার কথা কি বলতে চাও বলতে পার।

ধীরেন চলিতে চলিতে একটু ভাবিয়া লইয়া বলিল, আমাদের আশা—ভারি অদ্ভুত !

দীপক বলিল, অপরের কাছে অদ্ভুত লাগতে পারে কিন্তু নিজের কাছেও কি নিজের আশাগুলি অদ্ভুত বলে মনে হয় ?

ধীরু বলিল, কি জানি, অন্ততঃ আমার কাছে ত আমার আজকের আশা বড় অদ্ভুত বলে' ঠেক্‌ছে।

দীপক না বুঝিয়া বলিল, নিজেকে আশার জিনিষের যোগ্য বলে না জান্‌তে পার্‌লে অনেক সময় এমনি মনে হয় বটে।

ধীরু উৎফুল্ল হইয়া বলিল, দীপক, পদে পদে তোমার কাছে যত জিনিষ শিখি তবু তোমাকে ছোট বলেই ভাবি। সত্যি কথা—নিজেকে অযোগ্য বলে মনে করেই আশাগুলি অদ্ভুত বলে মনে হয়।

ধীরু হঠাৎ থামিয়া গেল দেখিয়া দীপক বলিল, বল, আরও কি বলতে চাইছিলে?

ধীরু বলিল, কথাটা একটু অকরুণ।—আমি পুষ্পকে ভালবাসি। সে আমাকে বাসে কিনা জানি না। কিন্তু আমার আশা, সেও আমাকে আমারই মত করে ভালবাসুক।

দীপক বলিল, এ ত স্বাভাবিক ধীরুদা, তাঁর সঙ্গে তুমি যতটা মিশতে সুযোগ পেয়েছ আমি ততটা পাই নি। তিনি চমৎকার মেয়ে, তাঁকে ভাল লাগবে এতে আর আশ্চর্য্য কি? তোমার আশা, তিনিও তোমাকে তোমারই মত করে ভালবাসুন,—কিন্তু শুধু তাই কি? তুমি কি চাও না তুমি তাঁকে বিয়ে কর?

ধীরু যেন একটু লজ্জা পাইল। বলিল, কথাটায় তোমার মনে বোধ হয় একটু আঘাত লাগল কিন্তু আমি নিরুপায় হয়েই বলেছি।

দীপক আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, এ কথায় আমার মনে আঘাত লাগবে কেন? তুমি উপযুক্ত লোক, মাথার খেয়ালে এতকাল ভবঘুরের মত কাটিয়েছ। আজ যদি কোথাও তোমার মন বসে থাকে তাহলে ত সুখেরই কথা।—কিন্তু তোমার মনের কথা কি তাঁকে বা তাঁর বাপ মা কারুকে বলেছ?

ধীরু বলিল, না, সাহস করিনি। আমার মত দুর্দ্দান্ত লোক আজ যে কি দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে তা দেখে আমি নিজেই আশ্চর্য্য হচ্ছি।

দীপক সহানুভূতির স্বরে বলিল, ওটা দুর্ব্বলতা নয়। পাছে—বলে' সকল আশা হারিয়ে ফেল সেই ভয়ে বল নি। ভালবেসে সে কথা কেউ তাই বলতে পারে না।

ধীরু অবাক হইয়া কিছুক্ষণ দীপকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

দীপক বলিল, কি দেখছ!

ধীরু বলিল, দেখছি, তুমি কি নিষ্করুণ—নিজের প্রতি কি উদাসীন!

দীপক হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন এ কথা মনে হোল বল দেখি? আমি নিজের প্রতি উদাসীন এ কথা শুনলে আমার মনে দুঃখই লাগে। মানুষ যদি সত্যিই নিজের সম্বন্ধে উদাসীন হতে পারত!

ধীরু একটু কাছে আসিয়া বলিল, আমি পুষ্পকে ভালবাসি এ কথা শোনার পরও তুমি আমার সঙ্গে এমন ভাবে কথা বলছ দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়েছি।

দীপক জিজ্ঞাসা করিল, কেন বল ত? পুষ্পর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি?

ধীরু স্পষ্টস্বরে বলিল, পুষ্প তোমাকে ভালবাসে—আর সে ভালবাসা শ্রদ্ধায় ভরা।

দীপক হাত দুইটি জোড় করিয়া মাথায় ঠেকাইয়া উদ্দেশে কাহাকে নমস্কার করিল, তার পর বলিল, আমাকে উনি ভালবাসেন এ কথা যদি সত্যি হয় আমি তাঁকে নমস্কার করি। কিন্তু আমার মনে হয়, তুমি তাঁকে পেলে খুব সুখী হবে।

ধীরু বলিল, আমার ত তাই মনে হয়, কিন্তু তাঁর তাতে সুখ হবে না তা ত বুঝতে পারছ?

দীপক শান্তভাবে বলিল, সুখ হবে না এ কথা বলতে পার না। তিনি তোমাকেও ভালবাসতে পারবেন! মেয়েরা নাকি তা' পারে। তা নইলে নাকি এ সংসারটা একদিনও চলত না।

ধীরু বিস্ফারিত চোখে দীপকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, এ তুমি কি বলছ দীপক! এ ত তোমার কথা নয়, এ তোমার মুখ দিয়ে কোন্ প্রেতমূর্ত্তি কথা বলছে!

দীপক হাসিয়া বলিল, কথাটা কি খুব কঠিন আর অসঙ্গত হয়েছে?

ধীরু বলিল, না, তা নয়। তবে সকলকে জড়িয়ে কোনও কথা বলতে গেলে একটু ভাবতে হয়।

দীপক তেমনি উদাস ভাবে বলিল, না, একটুও না। সকলকে জড়িয়ে কথা বলা যখন সম্ভব হয় তখনই লোকে বলে, তার ভেতর থেকে যদি কারুর বাদ পড়ে?

কথা থাকে ত' তিনি নিজ গুণেই বাদ পড়েন।

ধীরু হতাশভাবে বলিল, পুরুষের সম্বন্ধেও ত নারী এই কথা বলে।

দীপক বলিল, বলে কিন্তু বিশ্বাস করে না! তারা জানে, পুরুষ যখন ভালবাসে তখন ফুলের চাইতে কোমল, বন-মৃগের চাইতেও সরল, নিজের হাতের চাইতেও বিশ্বাসী হয়। তাই পুরুষ ভালবেসে মরে, নারী ভালবেসে বাঁচে!

ধীরু বলিল, পুষ্পর সামনে তুমি এ সব কথা এমন ভাবে বলতে পার?

দীপক বলিল, দরকার হলে' পারি। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে কোনই দরকার নেই।

ধীরু বলিল, না, তা হলে সে তোমার মনের ভাব জান্‌তে পারত।

দীপক প্রশ্ন করিল, কোন্ ভাব?

ধীরু বলিল, মেয়েদের সম্বন্ধে তোমার এই মনোভাব।

দীপক বলিল,—এটা আমার মনের ভাব তা' তোমাকে কে বল্‌ল? আমার পুরুষের মন বলেও ত একটা মন আছে? সে কি নারীকে ভাল না বেসে পারে?

ধীরু বলিল, তবে তুমি আবার এ কি বলছ?

দীপক বলিল, খুব কঠিন কি? বুঝ্‌তে পারলে না ধীরু দা! ভিখারী যে একটা দামী অলঙ্কার কোথাও কুড়িয়ে পেলে ভয়ে ত্রাসে সেটাকে দূরে ফেলে ছুটে পালায় তার মধ্যে কি তার অলঙ্কারের প্রতি বিতৃষ্ণা প্রকাশ পায়! ঐ সুন্দর বহুমূল্য জিনিষটি কি তার পেতে ইচ্ছা করে না?

ধীরু চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে মাথা তুলিয়া বলিল, দীপক, আজ পুষ্প যদি তোমার সঙ্গিনী হোত, তা হলে তোমরা দুজনে সত্যই খুব সুখী হতে আমার মনে হয়।

দীপক অন্যমনে বলিল, হুঁ। তারপর বলিল, কেন, তিনি ত এখনও আমার সঙ্গিনী আছেন। সব কাজের মধ্যে তাঁর সাড়া যেমন করে পাই, আর কারো কাছে ত তেমন পাই না।

ধীরু হাসিয়া বলিল, কিন্তু এ ত শুধু আকের চাষ!

দীপকও তেমনি হাসিয়া উত্তর করিল, যারা চাষ করে তারা রস খায় না।

এমন সময় কিছু দূরে সম্মুখেই নারীকণ্ঠের হাসির ধ্বনি শোনা গেল, এবং সে হাসি চেনা।

দীপক বলিল, শোভনারাও বোধ হয় ওদিকে গিয়েছিল। ওদের ত আচ্ছা সাহস বেড়ে গেছে!

ধীরু বলিল, সত্যিই ত। এত বাড়াবাড়িটা ভাল নয়। কি জানি কে কোথায় আছে?

দীপক সেই অন্ধকারে তার উজ্জ্বল চোখ দুইটা দিয়া ধীরেনের দিকে চাহিয়া বলিল, মানুষ? থাক্‌না, ওদের মানুষে কিছু করতে পারবে না।

মেয়েরা কাছে আসিতেই দীপক বলিল, কে, দাঁড়াও।

প্রসাদ আগাইয়া আসিয়া বলিল, এই যে দাদাবাবু! দিদিমণিদের সব বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলাম।

দীপক গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, কিন্তু এই অন্ধকারে এতক্ষণ বাইরে থাকা ভাল হয় নি।

শোভনা একটু ভয় পাইয়া গিয়াছিল। সে তাই তাড়াতাড়ি বলিল, না দীপক, আমরা এর আগেই বাড়ী ফিরতাম, কেবল ঐ পাড়াটা দেখবার বড় ইচ্ছে হোল, তাই দেরী হয়ে গেল।

ধীরেন জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা একলা গিয়েছিলেন সেখানে?

পুষ্প হাসিয়া বলিল, একলা দেখলেন কোথায়? আমরা এতগুলি মেয়ে, তার ওপর প্রসাদ আমাদের সঙ্গে।

দীপক বলিল, তা হলেও ভাল হয় নি।

শোভনা বলিল, তোমরা কোথায় চলেছ?

ধীরেন উত্তর করিল, আমরা ওখানেই যাচ্ছিলাম।

শোভনা বলিল, আজ আর গিয়ে কাজ নেই। আমাদের সঙ্গে ফিরে চলুন।

ফিরিবার পথে চলিতে চলিতে পুষ্প দীপকের পাশে আসিয়া পড়িল।

দীপক খুব আস্তে আস্তে বলিল, তোমার বিয়ের একটা সম্বন্ধ ঠিক করেছি।

পুষ্প বলিল, সুখের কথা। বাবা-মায়ের অনেকখানি কষ্ট লাঘব হোল।

দীপক বলিল, কিন্তু তোমাকে যে বিয়ে করতে হবে। রাজী আছ ত!

পুষ্প বলিল, নিশ্চয়, আমার বিয়ে আমি করব না ত কে করবে!

দীপক ধীরে ধীরে বলিল, না লক্ষীটি, তুমি আমার কথা শুন্‌বে। ঠাট্টা করছি না। এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই। এবং কথা আমি খুব স্পষ্ট করেই বল্‌ব।

পুষ্পও ধীরে ধীরে উত্তর করিল, উত্তরও আমি খুব স্পষ্ট করেই দেব। তবে এ বিষয়টি ছাড়া আমি আপনার সব কথাই শুন্‌তে রাজী আছি।

কেন শুনবে না?

শোনবার মত নয় বলে।

কেন শোনবার মত নয় আমাকে বল্‌বে না?

না।

আমাকেও না?

না, আপনাকেও নয়। আপনি যে কথার অর্থ বুঝ্‌বেন না সে কথা আপনাকে বল্‌ব কেন? আপনি যদি নিজে বিয়ে করে অন্য কারুর বিয়ের কথা বল্‌তেন তা হলে আপনাকে হয় ত বললেও বল্‌তে পারতাম।

দীপক বলিল, কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ না। এ বিয়েতে তোমরা দুজনেই সুখী হবে।

পুষ্প বলিল, আমি যদি সে সুখ না চাই!

দীপক বলিল, তোমাকে না পেলে যদি আরেকজনের জীবন বৃথা হয়ে যায় তবু তুমি তাকে বিয়ে করবে না?

পুষ্প কাতরভাবে বলিল, কেন আপনি আমাকে এ সব কথা বলছেন? আমি এত কি অপরাধ করেছি?

দীপক সস্নেহে বলিল, না পুষ্প অপরাধ কর নি। তোমাকে কেউ ভালবাসে এ কথা শুনলে আমার কতখানি ভাল লাগবার কথা তা কি তুমি বোঝ?

পুষ্প বলিল, না, বুঝি না, বুঝতে চাই না। আপনি অন্য কথা বলুন।

দীপক কোমলস্বরে বলিল, কষ্ট পেলে আমার কথায়? কিন্তু আমি যদি আর কারুর কষ্ট দেখে তোমাকে এ কথা বলে থাকি তা হলেও কি খুব অন্যায় করেছি?

পুষ্প যেন অসহায় বোধ করিতেছিল এমনি ভাবে বলিল, কি করব বলুন? কেউ যদি সত্যি কষ্ট পাচ্ছেন হয়, আপনি বল্‌লে আমি নিজে গিয়ে তাঁকে বুঝিয়ে বল্‌ব। বলুন, তাতে হবে?

দীপক বলিল, জানি না তাতে হবে কি না। কখনও হয় নি এই ত জানি।

পুষ্প চুপ করিয়া পথ চলিতে লাগিল। এ দিকে ধীরেন শোভনা ও বিমলাদের সঙ্গে খুব গল্প জুড়িয়া দিয়াছে।

শোভনারা বাড়ী পর্য্যন্ত পৌছিলে পুষ্প দীপককে বলিল, আপনি আমাকে একটু বাড়ী পর্য্যন্ত পৌছে দেবেন আসুন।

পথ চলিতে চলিতে আর কোনও কথা হইল না। বাড়ী পৌছিয়া পুষ্প দীপককে ভিতরে আসিতে অনেক অনুরোধ করিল, কিন্তু দীপক গেল না।

ফিরিয়া আসিবার সময় হঠাৎ পুষ্প দীপকের পায়ের উপর পড়িয়া প্রণাম করিল। দীপক একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। কথা আর জুয়াইল না। একবার পুষ্পর দিকে চাহিয়া সে সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

পুষ্প কিছুক্ষণ ঐ খানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

বাড়ীতে ঢুকিবে এমন সময় দেখিল ধীরেন আসিয়াছে।

ধীরেন কৈফিয়তের ভাবে বলিল, আজকের রাতটা বড় সুন্দর। ওঁদের পৌছে দিয়েই মনে হোল দীপককে এখান থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে একটু বেড়াতে যাব।

পুষ্প বলিল, কিন্তু উনি যে বাড়ী ফিরে গেলেন।

ধীরু আর কি বলিবে ভাবিতেছে এমন সময় পুষ্প ভদ্রতা করিয়া বলিল, বন্ধুকে ত আর পেলেন না। এখন আমাদের বাড়ীতেই না হয় এসে একটু বসুন। তারপর একটু হাসিয়া বলিল, অবশ্য তাতে এমন সুন্দর রাতে বাইরে বেড়াবার মত আনন্দ পাবেন না নিশ্চয়।

ধীরু সুবিধা পাইল। বলিল, ঘরে কোথাও কিছু নেই বলেই ত বাইরে আনন্দের সন্ধানে যেতে হয়।—চলুন, আপনাদের সঙ্গে বসে গল্প করা যাবে।

পুষ্পর সঙ্গে সঙ্গে ধীরেন তাহাদের বাড়ীর ভিতরে গেল। যাইয়া দেখে পুষ্পর বাবা ও মা উভয়েই যেন একটু চিন্তান্বিত হইয়া বসিয়া আছেন।

ঘরে ঢুকিতেই বিহারী বাবু বলিলেন, এত রাত পর্য্যন্ত কোথায় ছিলে?

পুষ্প ধীরেনকে বসিতে বলিয়া উত্তর দিল, আমরা আজ একটু খালধারে বেড়াতে গিয়েছিলাম।

বিহারীবাবু নীরস কণ্ঠেই বলিলেন, যেখানেই যাও, এত রাত পর্য্যন্ত এ রকম একলা একলা বেড়ান ভাল নয়।

পুষ্পর বুঝিতে দেরী হইল না বাবা কাহাকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিতেছেন। বলিল, একলা ত ছিলাম না বাবা—শোভনারা সবাই ছিল—আর দীপকবাবু ও উনি দুজনেই আমাদের সঙ্গে ছিলেন।

বিহারী মেজাজটা ঠিক রাখিতে পারিলেন না। বলিয়া বসিলেন, যিনিই সঙ্গে থাকুন, অভিভাবক ভিন্ন রাত্রে বাইরে বেড়ান কোন মেয়েরই উচিত নয়।

পুষ্প কি একটা বলিতে যাইতেছিল কিন্তু তাহা চাপা দিয়া প্রকাশ্যে বলিল, এঁদেরও ত আমি অভিভাবক বলেই মনে করি। এঁদের সঙ্গে থাক্‌লে আমার কোনও ভয় বা চিন্তাই থাকে না।

বিহারী বেশ জোর দিয়া বলিলেন, হাঁ, সেইটেই অন্যায়।

পুষ্প বুঝিল আর কিছু না বলাই ভাল তাই চুপ করিয়া গেল।

বিহারী উঠিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন।

পুষ্পর মাও একটা কাজের অছিলায় সে ঘর হইতে চলিয়া গেলেন।

ধীরেনের মাথা হেঁট হইয়া গেল। ইহারা উঠিয়া যাইতেই ধীরেনও উঠিয়া পড়িয়া বলিল, আমিও তাহলে যাই।

পুষ্প বলিল, খুব খারাপ লাগল নিশ্চয়। কিন্তু বয়স্কা মেয়ের জন্য বাপ-মায়ের কত ভাবনা দেখুন।—আপনি যেন কিছু মনে করবেন না।

ধীরেন বলিল, আপনি এতক্ষণ বাইরে আছেন, একটু ভাবেন বই কি ওঁরা।

পুষ্প বলিল, আজ ত আমি নূতন এমনি বাইরে থাকি নি। বাবা একটা ভুল ধারণা নিয়ে এতখানি চঞ্চল হয়ে উঠেছেন তা' আমি বুঝতে পেরেছি।

ধীরেন অপরাধীর মত বলিল, বোধ হয় ওঁরা ভেবেছেন, আমার সঙ্গে একলা আপনি বেড়িয়ে বাড়ী ফিরছেন।

পুষ্প মাথা নত করিয়া উত্তর করিল, খুব সম্ভব তাই।

একটু ভাবিয়া ধীরেন বলিল, দীপক সঙ্গে করে দিয়ে গেছে একথা জানলে বোধ হয় ওঁরা আর এত রাগ করতেন না।

পুষ্প তেমনি মাথা নীচু করিয়াই আবার বলিল, খুব সম্ভব তাই।

ধীরেন একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আবার বসিয়া পড়িল।

পুষ্প এবার একটু সুযোগ পাইয়া অতি কষ্টে বলিল, আমার বড় কষ্ট হচ্ছে বিনা কারণে আপনার মনে হয় ত আঘাত দিলাম। কিন্তু সংসারে এ রকম পক্ষপাত আরও দেখেছি। যাকে যাদের ভাল লাগে, তার সম্বন্ধে আর কোনও বিচার-ভেদ থাকে না। তাই না ধীরেন বাবু?

ধীরেন দুঃখিত হইবার চাইতে বিরক্ত হইয়াছিল বেশী। আর পক্ষপাতিত্বের কথাটাই তাহারও মনে প্রথম আসিয়াছিল। তাই সে বিশেষ কোনও কথা না বলিয়া শুধু বলিল, এটা ভাগ্যগুণে হয়। এক একজনের সৌভাগ্য এমন যে, সকলেই তাকে চায়, ভালবাসে।

পুষ্প একবার চোখ তুলিয়া ধীরেনের দিকে চাহিল। সে চাহনিতে মিনতির নম্রতা।

ধীরেন আবার বলিল, আপনি নিজেও হয় ত দীপককে আমার চাইতে বেশী বিশ্বাস করেন—সেটাও তার সৌভাগ্য নয় কি?

পুষ্প এবার কথা বলিল। বলিল, হয় ত তাই। কিন্তু এক জনকে বিশ্বাস করতে পারার মধ্যে যে বিশ্বাস করে তার সৌভাগ্য থাকতে পারে, কিন্তু যাকে বিশ্বাস করা

হয় তার তাতে এমন কি সৌভাগ্যের কথা! আমার ত মনে হয় আমি বিশ্বাস করি বা না করি তাতে দীপক বাবুর বিশেষ কিছু আসে যায় না!

ধীরেন বলিল, সে হয় ত চেষ্টা করে এ বিষয়ে উদাসীন থাকে। কিন্তু এতে যে তারও মনে একটা পরম তৃপ্তি ও আনন্দ আছে এটা কি আপনি বিশ্বাস করেন না?

পুষ্প বলিল, কথাগুলি তাঁরই সম্বন্ধে আমরা বেশী বলে ফেলছি ধীরেন বাবু—প্রথম কিন্তু আপনার নিজের কথা নিয়ে কথাটা ওঠে।

ধীরেন একটু কঠোর হাস্য হাসিয়া বলিল, এও তার সৌভাগ্য। কথা বলতে বলতে তারই কথা বেশী এসে পড়ে।

পুষ্প বলিল, এমনও হতে পারে উনি নিজে তা চান্ না। উনি হয় ত ভাবতেই পারেন না ওঁর সম্বন্ধে কোথাও কোনও কথা হয়।

ধীরেন যেন অকূলে পড়িল। অতি কষ্টে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, কিন্তু আপনি কি আমাকেও তেমনি বিশ্বাস করতে পারেন না?

পুষ্প লজ্জিত হইয়া বলিল, এখন এ সব বিষয়ে আলোচনা করা বোধ হয় আমাদের ঠিক্ হচ্ছে না। তবু বলি, বিশ্বাস যে কাকে করা যায় তা' মনই বলে' দেয়। মানুষের কোনও বিচারশক্তির তাতে হাত নেই। আমরা অনেক সময় একজন মুটেকে হয় ত যতটা বিশ্বাস করি, একজন ভদ্রলোকের ছেলেকে ততটা করি না। তর্ক করলে হয় ত হার মান্‌তে হয়, কিন্তু মন তর্ককে অগ্রাহ্য করে ঐ মুটেকেই বিশ্বাস করে বসে।

ধীরেন যেন শেষবার বলিতে চেষ্টা করিল, দেখুন, আমি ছেলেবেলা থেকে ভবঘুরে, বেপরোয়া এবং দুঃসাহসী। এতকাল তাই ছিলাম। আজ মনে হচ্ছে আমি মোটেই তা নই। আর এ কথা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে একটা আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে উঠেছে: আমিও যে কতখানি ভালবাস্‌তে পারি তা একজনও কেউ অন্ততঃ জানুক। তার সমস্ত সুখ দুঃখের বোঝা নিয়ে আমার জীবনে এমন একটা মন্দির তৈরী করি—যার ভিতরে শুধু শান্ত ও সুন্দর দেবতা নিরুদ্বেগে বাস করতে পারেন। সংসার, গৃহ, পরিজন—এ সবই যেন আজ আমি অত্যন্ত সত্য করেই চাই।

ধীরেন একটু থামিতেই পুষ্প বলিল, ধীরেন বাবু, আজ একটু রাত হয়েছে। বাবা-মা'রা হয় ত খেতে যাবেন। আজ আমরা উঠি—কেমন?

ধীরেন দ্বিরুক্তি না করিয়া একেবারে উঠিয়া পড়িল এবং একটি নমস্কার করিয়া বিদায় হইয়া গেল।

ধীরেন চলিয়া যাইতেই পুষ্প তাহার নিজের ঘরে গিয়া বিছানায় লুটাইয়া পড়িল। এত বড় শক্ত মেয়ে কিন্তু তাহার চোখে যেন অশ্রুর বান্ ডাকিল। অনেকক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া মুখ চোখ ধুইয়া মা'র কাছে গিয়া দাঁড়াইল:

মা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, বাবা যদি ছুটো কথা বলেই থাকেন তাতে কি এমন করতে আছে? ছিঃ! বাপ-মায়ের মনে যে কত ভাবনা তা ত বুঝতে পার না।—চল, খাবে চল। বাবাকে ডেকে নিয়ে এস।

খাইতে বসিয়াও হঠাৎ কেমন করিয়া টস্ টস্ করিয়া চোখের জল পড়িয়া যায়, পুষ্প তাহা কিছুতেই থামাইতে পারে না।

কোনও রকমে খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া সে ঘরে গেল।

বিহারী আসিয়া পুষ্পর মাথাটি নিজের বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিতে লাগিলেন, তুই বুঝিস্ না। তুই যে আমার ছেলে, মেয়ে, বন্ধু—সব। তোকে আমি খুব ভাল করেই জানি। কিন্তু লোকের মুখে যে বড় বিষ—তাই বড় ভয় হয়। বুড়ো বাপের কথায় কি এত রাগ করতে আছে মা? দীপককে আমি বেশ বিশ্বাস করতে পারি কিন্তু কেন জানি না অন্যকে একেবারেই পারি না। তাই ওকথা বলেছিলাম।

পুষ্প কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, তুমি ভুল করেছ। দীপকবাবুই আমাকে বাড়ী পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন, ধীরেনবাবু পরে এসেছিলেন। কিন্তু তা যদি না-ই হোত, ধীরেনবাবুও ত ভদ্র এবং খুব ভাল লোক!

বিহারী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, ভাল লোক না হলে কি তার সঙ্গে আমার মেয়ে মেশে? তা আমি জানি মা। তবু যেন কেন এমন হয়!

পুষ্প পিতার কণ্ঠলগ্ন হইয়া বলিল, আমারও তাই হয় বাবা। কিন্তু এ আমাদের একজনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব—এ আমাদের খুব অন্যায়। কেন আমরা ধীরেন বাবুকেও তেমনি করে' বিশ্বাস করতে পারব না! কেন পারব না বাবা!

বিহারী সস্নেহে বলিলেন, আজ পারি না, হয় ত কাল পারব। তার জন্ম অত ভেবে কি হবে?

পুষ্প জোর করিয়া বলিল, না বাবা, তারই জন্য বেশী করে ভাবতে হবে। দুজন লোক, দুজনই আমাদের অনাত্মীয়। দুজনই ভাল অন্ততঃ আমাদের সঙ্গে ব্যবহারে। তার মধ্যে একজনকে আমরা কেন কম বিশ্বাস করব—কম ভাল বাস্‌ব!

বিহারী বলিলেন, বেশ ত, পারলে ত ভালই।

পুষ্প বলিল, না বাবা, তা না পারলে আমাদের ভালবাসা মিথ্যা—আমাদের আচরণ অভিনয় মাত্র।

বিহারী নিরুপায় হইয়া কন্যার নিকট হইতে বিদায় লইলেন।

১৮

কাজে কর্ম্মে দিন-মাসগুলি যেন চোখের পলকে চলিয়া যায়। দীপক ধীরেনের সে কথার আর কোনও কিনারাই করিতে পারে নাই। ধীরেন কিন্তু আশা করিয়া আছে, দীপক তাহার হইয়া একটুও অন্ততঃ চেষ্টা করিবে!

একদিন রাত্রে পোড়া-বস্তীতে বিষম আগুন ধরিল। খালধার সে আগুনের শিখায় লালে লাল হইয়া গেল। খালের জলে আগুনের ছায়া পড়িয়া লাফালাফি করিতে লাগিল। কোথা হইতে সঙ্গে সঙ্গে তেমনি বাতাসের জোর।

দেখিতে পাইয়াই দীপক, ধীরেন আর প্রসাদ লম্বা লম্বা লাঠিতে ভর দিয়া লাফাইতে লাফাইতে কয়েক মিনিটের মধ্যেই পোড়া-বস্তীতে গিয়া পৌছিল।

কি সে আগুনের তেজ! সব পাতা, খড় আর বাঁশের প্রাসাদ! যেন আগুনের বুকে লাফাইয়া পড়িয়া পুড়িয়া মরিতে চায়!

কবে কাহার ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিতে এই বস্তিগুলির সৃষ্ট হইয়াছিল তাহা লোকে প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছে। এখন যাহারা থাকে তাহারাই যার যার আবশ্যক ও সাধ্য মত জোড়াতালি দিয়া ঐ ঘরগুলিতে বাস করে। ঝড়ে জলে ভিজিয়া আর রোদে শুকাইয়া বাঁশ খড়গুলি এক অপূর্ব্ব বস্তু হইয়া রহিয়াছে। অগ্নি-শিশুরা যেন এতবড় খোলা ময়দান পাইয়া নৃত্য-পাগল হইয়া উঠিল। চালের পর চাল লাফাইয়া আগুন ছুটিয়াছে—তার সঙ্গে নিঃসহায় আতুর অক্ষমের মর্ম্মভেদী চীৎকার। আকাশের বাতাস যেন এক একবার লজ্জায় ক্ষোভে এই অশান্তির ধ্বনিকে ঈশ্বরের শ্রুতি সীমা হইতে চাপিয়া রাখিতে চায়। বিপুল বেগে বাতাস আসিয়া মাঝে মাঝে এই শুষ্ক শীর্ণ কণ্ঠের মিলিত চীৎকারগুলি কোন্ শূন্যে উড়াইয়া লইয়া যায়—ঈশ্বরের কানে তাহা পৌছাইতে পারে না। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রকৃতির এই সিপাই শান্ত্রীরও এত আয়োজন। ঈশ্বরের কানে-যেন কিছু না পৌছায়!

ঈশ্বর মঙ্গলময়। সমস্ত পৃথিবী ধনধান্যে সৌভাগ্য-শালিনী; শান্তি, প্রেম পুণ্যে কল্যাণময়ী,—কোথাও একটু বিক্ষোভ নাই।

দীপক পাগল। তাই বলিল, এ বিধাতার দোষ। উন্মত্ত বাতাস সে কথাও চাপা দিল।

যখন এক মাইলেরও উপর এই ভিখারী পল্লী পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে তখন একটা ভস্ম মাখা অন্ধকার যেন ছুটাছুটি করিয়া সেই ধ্বংসক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইল। করুণ, ম্লান, অতি ক্ষীণ শোকাচ্ছন্নের ক্রন্দন—আকাশের একটা তারাও তাহাতে কাঁপে না। মৃতকল্প কে কোথায় পোড়া কাঠের মত পড়িয়া আছে—এমন করিয়া সব পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল! কিন্তু এই ভিখারী, পঙ্গু, কুলগোত্রহীন অভিজাত বংশের পোড়া কপালটি পুড়িয়াও ছাই হইল না। যাহারা বাঁচিয়া রহিল, তাহাদের পোড়া কপাল, তাহাদের কপাল পুড়িয়াও যেমন তেমনি রহিল।

হাত-পা ঝলসাইয়া, মাথা গা কাটিয়া রক্ত ও কালিমাখা চেহারা লইয়া যখন দীপক একটা পোড়া গাছতলায় আসিয়া দাঁড়াইল তখন বিপুল কণ্ঠে একবার শুধু 'দাদাবাবু' বলিয়া একটা মিলিত চীৎকার আকাশের চাঁদের মুখে গিয়া যেন ঠেকিয়া গেল।

কাহারও ছিল একটি বাসন, কাহারও বা একটা কম্বল—এমনি সব সঞ্চিত তৈজসপত্র হারাইয়া এই লক্ষ্মী-ছাড়ার দল গৃহস্থদের মত কাঁদিয়া আকুল। এত বড় বেহায়া ওরা!

সবাই যখন এক এক করিয়া শতে শতে আসিয়া দীপকের চারিধারে ভীড় করিয়া দাঁড়াইল, তখন দীপক শুধু দুই হাত উর্দ্ধে আকাশের দিকে তুলিয়া বলিল, জয়, জয়লক্ষ্মীর জয়!

আবার দিগন্ত কাঁপাইয়া ঐ সহস্র কণ্ঠের মিলিত জয়-ধ্বনি কাঁপিতে কাঁপিতে প্রান্তরের সীমান্তে গিয়া আঘাত করিল। দেখিতে দেখিতে শুষ্ক দগ্ধ প্রান্তরের বক্ষ ভেদ করিয়া তরুণ উষার রক্ত সূর্য্য জাগিয়া উঠিল। প্রথম রক্তিম আলোকে পোড়া-বস্তীর সে অপরূপ কদর্য্যতা প্রভাতের আলোকেও যেন ম্লান করিয়া তুলিয়াছিল।

সকলকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া দীপক, ধীরেন ও প্রসাদকে লইয়া বাড়ীর দিকে ফিরিয়া চলিল।

চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই এরূপ জন-বাদ থাকিলেও দীপকের বহু চেষ্টাতেও বিশেষ কিছু সংগ্রহ হইল না। পুণ্যকামী পুরুষ ও নারী যেন দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষ দান দিল কয়েকজন বিদেশী:—কয়েক বস্তা চাউল, ডাল, নুন, কাপড়, তাঁহাদের নিকট হইতে যোগাড় হইল।

দীপকরা যখন পোড়া বস্তীতে ফিরিয়া গেল—তখন সূর্য্য অস্তে চলিয়াছে।

আবার মানুষের বাঁচিবার আয়োজন সুরু হইল। ইহারই মধ্যে রাত্রে বাস করিবার মত দুই চার দশখানা কুটীরও উঠিয়াছে। ধন্য মানুষের বাঁচিবার আশা!

এই ছোট সাম্রাজ্যখানিতে তাহারা আবার কুটীর বাঁধিবে, কুটীর হইতে ভিক্ষায় বাহির হইবে—ভিক্ষান্নে বাঁচিয়া থাকিবে—রোগ, পঙ্গুতা, দারিদ্র্য সব মরিয়া মরিয়া ভোগ করিবে, তবু মরিবে না! এমনি ইহাদের আশা! তবে আর মরিতে চাহিবে কে?

মাস দুই তিনের মধ্যেই আবার পোড়া বস্তী নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিল। এবার কিন্তু যাহারা বাস করে তাহাদের নিজেদের চেষ্টায়, জমীদার শুধু জমীর ভাড়া লইয়াই খালাস।

—ক্রমশ

নবমিলন—এই পত্রিকাখানির কার্ত্তিক সংখ্যা আমরা পাইয়াছি। পত্রিকাখানির ২য় বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। তিনজন সম্পাদক ইহার কার্য্যভার সম্পাদন করিতেছেন; শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বার্ষিক মূল্য একটাকা আট আনা; সংখ্যা দুই আনা। কার্য্যালয়—৫ নং কানাইলাল মুখার্জ্জি লেন, হরিতকী বাগান, কলিকাতা।

সম্পাদকত্রয়ের প্রতি বিশেষ নিবেদন, তাঁহারা যেন তাঁহাদের বক্তব্যসম্বন্ধে আরও একটু অবহিত হন। কে কি বলিতেছে তাহার জন্য যথেষ্ট উত্যক্ত হইবার কারণ থাকিলেও নিজের ভাষা ও ভাবকে ম্লান করিবার কোনও কারণ নাই। তরুণদের এই পত্রিকাকে আমরা সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি এবং আশা করি সমস্ত আবর্জ্জনাকে উপেক্ষা করিয়া এই পত্রিকাখানি যেন যথার্থ নবমিলনের ক্ষেত্র হয়।

মাসিক মোহাম্মদী—সচিত্র মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক মোহাম্মদ আকরম খাঁ। বার্ষিক মূল্য তিনটাকা, প্রতি সংখ্যা চারি আনা। কার্ত্তিক মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ। ২৯ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। এ-খানি নূতন কাগজ। ইহার পূর্ব্বে 'সওগাত' 'নওরোজ' নামে আরও দুইখানি সুবৃহৎ মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে। মাসিক মোহম্মদী' মুসলমান সম্প্রদায়ের সভ্যতা ও ধর্ম্ম লইয়াই বিশেষ ভাবে আলোচনা করেন। আমরা এই মাসিক পত্রিকাখানিকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইতেছি।

ভালবাসার নেশা—'হিন্দু' পত্রিকা সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিত একখানি উপন্যাস। মূল্য একটাকা আট আনা। উপন্যাসখানির একস্থলে লিখা আছে, "নিরুপমার মুখ ফুটিয়াছে! সে বলিল 'বা—উনি এতদিন এমনি করে ছেড়ে থাকতে পারলেন। কি করেছেন না করেছেন এতদিন তাতে তাঁর কোনও দোষ হোল না—আর আমি যে কিছু করিনি, শুধু মন প্রাণ দিয়ে তাঁকেই ডেকেছি—দোষ হোল বুঝি সবই আমার!" তারপরেই আছে স্বামী গৃহমুখী হইয়াছেন, স্ত্রীর নিকট ক্ষমা চাহিতেছেন, স্ত্রী 'স্বামীর ভালবাসা-ভরা বক্ষের উপর এলাইয়া পড়িল।' মোটামুটি এই কথাগুলি হইতেই সমগ্র উপন্যাসখানির গল্পভাগ সংগ্রহ করিয়া লওয়া যায়। অবশ্য গল্পের ভিতর নানাবিধ অবস্থান্তরের বর্ণনা ও পরিচয় আছে।

স

নীহারিকা—কবিতার বই, লেখক শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগ্চী। মূল্য এক টাকা।

চেষ্টা করিয়াও কবিত্ব হয় না এমন নয়, কিন্তু নটীকে যদি নাচিতে গিয়া হাঁফাইতে দেখি তাহা হইলে নাচের রস উপলব্ধিতে আমাদের যে একটু ব্যাঘাত হয় এটুকুও

অস্বীকার করিতে পারি না। ঘর্ম্মাক্ত সৌন্দর্য্য সৃষ্টিকে অবহেলা আমরা করিতে পারি না, কিন্তু মনে আমাদের একটু খুঁত থাকিয়া যায়! সৃষ্টি যেখানে সার্থক সেখানে পরিশ্রমটুকু সৌন্দর্য্যের ছন্দে পরিপূর্ণ ভাবে মিলিয়া যায়। ঘর্ম্মবিন্দুরূপে সৃষ্টির ললাটে প্রকাশ পায় না।

যতীন্দ্রবাবুর কবিতার প্রধান গুণ তাঁর লেখায় কোথাও ঘর্ম্মবিন্দুর চিহ্ন নাই। কোন রকম আয়াস ছাড়া সত্যকার কোন সৃষ্টি সম্ভব কি না আমরা বলিতে পারি না। পাখীর গান স্বতঃস্ফূর্ত্ত আয়াসবিহীন হইতে পারে কিন্তু মানুষের কবিতা পাখীর গান নয়। পাগলের প্রলাপই অনায়াসে আসে বলিয়া আমরা জানি। শ্রেষ্ঠ কবিতায় আয়াস অবশ্য থাকে কিন্তু থাকে গোপনে উপলব্ধির গভীরতায়। যতীন্দ্রবাবুর কবিতার মূলে হয় ত কেন নিশ্চয়ই কাব্য-সাধনার বিপুল প্রয়াস আছে কিন্তু সেখানে ফুল হইয়া তাহা ফুটিয়াছে সেখানে মূলের কোন প্রয়াসের পরিচয় নাই।

রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে সে দিন যে কয়টি কবি প্রতিভা বিকশিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে যতীন্দ্রমোহন শুধু অন্যতম নয়, অনন্যসাধারণ।

সন্ধ্যায়—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য পাঁচ সিকা।

ভূমিকায় লেখক বলিয়াছেন, যে সমস্ত ভাব অন্তরে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে তাহারই কতকগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এই সমস্ত চিন্তার কেন্দ্র হইল—Alone to the Alone—তিনি আর আমি।

ছোট ছোট ৩৬টি রচনা। সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে লিখিত না হইলেও লেখায় শক্তি ও মাধুর্য্য আছে। আধ্যাত্মিক চিন্তাহিসাবে লেখাগুলিতে গভীরতা ও আন্তরিকতা পূর্ণভাবে রহিয়াছে।

নব্য গুরুকুল—ক্ষুদ্র নাটিকা—লেখক শ্রীফণীন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মূল্য ৶১০।

লেখকের উদ্দেশ্য ছাত্রদের মধ্যে শক্তি ও স্বাস্থ্যের প্রতি অনুরাগ বর্দ্ধিত করা। উদ্দেশ্য সাধু কিন্তু এ জন্য এই শ্রেণীর নাটিকা রচনা করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। প্রবন্ধ লেখাই উচিত ছিল। শক্তির অভাবে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে।

স্বামী গীতা—শ্রীপূর্ণানন্দ স্বামী বিবৃত শ্রীশিবকৃষ্ণ দত্ত বি-এ কর্ত্তৃক সংগৃহীত। মূল্য দশ আনা।

শ্রীপূর্ণানন্দ স্বামীর আধ্যাত্মিক উপদেশগুলি লেখক পুস্তকাকারে সংগ্রহ করিয়াছেন। সমাধি, ব্রহ্মবিদ্যা, শব্দ ব্রহ্ম, ত্যাগ ও বৈরাগ্য ইত্যাদি দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা আছে। ভাষা সহজ না হইলেও আড়ষ্ট নয়। বক্তব্য বিষয়গুলি সুপরিস্ফুট হইয়াছে।

কস্‌মোপলিট্যান্—ইংরাজী মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক, শ্রীযুক্ত জে, এন্, ব্যানার্জ্জি। ১৯২৮ জানুয়ারী হইতে প্রথম বর্ষ আরম্ভ। বার্ষিক মূল্য ভারতবর্ষে সাত টাকা এবং প্রতি সংখ্যা দশ আনা। প্রথম সংখ্যায় বহু প্রসিদ্ধ লেখক লেখিকার রচনা আছে। এরূপ একখানা পত্রিকার আমাদের দেশে বিশেষ প্রয়োজন ছিল। দেখিয়া সুখী হইলাম, এই পত্রিকায় দেশীয় নাটক বা নট সম্বন্ধেও আলোচনাদি সন্নিবেশিত রহিয়াছে। ইহার সঙ্গে দেশীয় স্থাপত্য শিল্প চিত্রশিল্প, ইতিহাস, কাহিনী, সঙ্গীত, ও ভাস্কর শিল্পের প্রতিও দৃষ্টি থাকিলে সুখী হইব।

এই পত্রিকা যদি সত্য সত্যই নির্ভিক, নিঃসঙ্কোচ ও ধীরভাবে দেশীয় বা বিদেশীয় সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করেন তাহা হইলেই এই পত্রিকা বাঙালীকে তাহার দীন সলজ্জ অবস্থা হইতে মুক্তি দিতে সক্ষম হইবে এরূপ আশা হয়।

এই পত্রিকাখানি দীর্ঘায়ু ও লোকপ্রিয় হউক ইহাই কামনা করি।

অস্ফুট—ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ ছাত্রাবাসের মুখপত্র—বার্ষিকী। সম্পাদক, শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য ও ও আব্‌দুল ওয়াহাব মাহ্‌মুদ। ২য় বর্ষের অস্ফুট একখণ্ড আমরা পাইয়াছি। ইহাতে সবশুদ্ধ পনেরটি বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে। কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রদের লেখায় ও যত্নে এই বার্ষিকীখানি দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। গল্প, কবিতা ও শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধও ইহাতে আছে। ছাত্র

ও অধ্যাপকের মিলন ক্ষেত্র রূপে এই পত্রিকাখানি ক্রমে আরও সৌষ্ঠবসম্পন্ন হইবে ইহাই কামনা করি।

কেতকী—মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক, শ্রীনির্ম্মল মুখোপাধ্যায়। ১৩৩৪এর ৫ম ও ৬ষ্ঠ যুগ্মসংখ্যা আমরা পাইয়াছি। সম্পাদকের নিবেদনে দেখিলাম, "আজকাল মাসিকপত্রিকার অভাব নাই। কিন্তু আমাদের ধারণা যে একটি আদর্শে অনুপ্রাণিত পত্রিকার আজও অভাব আছে। সে অভাব 'কেতকী' মিটাইতে পারিবে কি না বলা যায় না; কিন্তু চেষ্টা করিতে ক্ষতি কি?—"

এই পত্রিকার সম্পাদক ও পরিচালকবর্গের আশা সফল হউক ইহাই বাঞ্ছনীয়।

পত্রিকার কার্য্যালয়—২নং কাঁটাপুকুর লেন, কলিকাতা।

সান্ত্বনা

শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

দুঃখ আমার নাইকো প্রিয়া মোটেই আমার দুঃখ নাহি,
একটা জীবন যদি বা যায় তোমার তরে পথটি চাহি!
পাওয়া সে কি মুখের কথা, অমনি কি গো মেলে রতন?
প্রাণটি দিয়ে দুঃখ সয়ে সাধ্‌তে যে হয় করে যতন।
তেমন আমি কি-ই করেছি যাতে তোমায় করবো দাবী,
তোমার আশা সব দুরাশা যতই কেন মরি ভাবি।
তবু মনে প্রবোধ আছে, জনমটা মোর বৃথাই নয়,
তোমার করের কোমল পরশ বিশ্ব-ভুবন ব্যেপে যে রয়!
নিতল দীঘির জলে তোমার কালো চোখের ছায়া নাচে,
চৈতী হাওয়া উদাস হয়ে দোল দিয়ে যায় গাছে গাছে!
বুলবুলেরি কণ্ঠ হ'তে তোমার সুরের আভাস আসে,
আধ-ফুটন্ত চাঁপার কুঁড়ি তোমার মতই মুচকি হাসে!
অসীম আকাশ, বিশাল সাগর, ফাল্গুনেরি শিহরণ,
সাঁঝ সকালের মন্দ মধু মাতাল-করা সমীরণ,
সবার মাঝে পাই যে তোমায় মনে জাগে বিপুল হরষ,
দুঃখ কি তায় নাই যদি দাও সোহাগ-ভরা কোমল-পরশ!

বয়সের বহ্বাড়ম্বর

কল্লোল সম্পাদক সমীপেষু,

সবিনয় নিবেদন—পরে জানিবেন যে, আমি আপনার কাগজের একজন নিয়মিত পাঠক। আপনাদের কাগজ পড়িয়া যে, সব সময়ে আনন্দিত হইতে পারিয়াছি—তাহা নয়। অনেক সময় আপনাদের অনেক লেখা পড়িয়া আমার মত লোকের—যে জীবনে কোনও দিন সাহিত্যের বাজারে একটীও অক্ষরকে কালিতে বিভূষিত করিয়া পাঠায় নাই—তাহারও লিখিবার সাধ গিয়াছিল। আপনি যদি আমার এই ধৃষ্টতা মাফ করেন তবে পরে একদিন সে বিষয়ে লিখিবার বড়ই বাসনা রহিল। আজ কিন্তু অন্য কথা।

আমার বয়স সম্বন্ধে আপনাকে আগে কিছু জানান প্রয়োজন; তাহার কারণ, আজকাল বাংলা সাহিত্য-সমালোচনায় বিজ্ঞ সমালোচকগণ বয়সকে একটা বিশিষ্ট স্থান দিতেছেন এবং আমাদের মত প্রবীণ ব্যক্তিরা যাঁহারা আসরের বাইরে চিরকাল পায়তাড়া ভাজিয়াই আসিয়াছেন—আজ বয়সের জোরে তাঁহারা আসরে অনায়াসে ভীম সাজিয়া নামিয়া যাইতে পারেন। বয়সের সিংহ-চর্ম্মে আজ অনায়াসে আমাদের রাসভ-কণ্ঠ পশু-রাজের সিংহনাদ বলিয়া চলিয়া যাইবে। কৃতদাস ঈশপ যাহাই বলুন না কেন!

প্রথম যৌবনে যখন গ্রহণ ও প্রতিদানের অদম্য বাসনায় একটী মুহূর্ত্তকে শতবর্ষের রূপকের মত পাইয়াছিলাম—তখন বয়স জিনিষটাকে বুঝিতে পারি নাই। আজ বয়সের শেষে আসিয়া, মনে বিশ্বাস লয় যে, বুঝি তাহার স্বরূপকে বুঝিয়াছি। যৌবনের সেই প্রথম বয়স—সে যেন ফুলের বিকাশের মুহূর্ত্তটুকু। ঠিক ততটুকু যতটুকু সময় লাগে পাপড়ির দ্বার খুলিয়া যাইতে। সেই সামান্যতম মুহূর্ত্তটুকুই ফুলের সমস্ত জীবনের বয়স। এই মুহূর্ত্তটুকুর মধ্যে এত বড় ভগবানের দান নিহিত আছে—তখন কি তাহা জানিতাম! তাহার পরে ফুলের জীবনে—যাহা থাকে তাহা শুধু সেই মুহূর্ত্তটুকুর হৃদস্পন্দন। দুদিনের ফোটা-ফুল তো এক রাত্রির একটা মুহূর্ত্তের সেই ফুঠে-উঠার কঙ্কাল মাত্র। ইহার বাহিরে যাহা ঘটে—তাহা ব্যতিক্রম; এবং স্বভাবের মত ব্যতিক্রমেরও স্থান যে পৃথিবীতে নাই--সে কথা আপনাকে বলিতেছি না।

আমি যে কি বলিতে চাহিতেছি—তাহা হয় ত আপনি ঠিক বুঝিতে পারিতেছেন না। কিন্তু আজ বয়সের ব্যর্থতা আমার ছিন্নদল জীবনের চারিদিকে এক অপরূপ মূর্ত্তি ধরিয়া উঠিয়াছে। তাই আপনাকে বয়সের কথা বলিতেছি। বুড়া বয়সে বয়সের রহস্যের কথা ভাবিতে ভাবিতে অনেক সময় মস্তিষ্ক উষ্ণ হইয়া উঠে। আপনিও যেদিন বুড়া হইবেন তখন বয়সকে আমারই মত শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখিতে শিখিবেন। বয়স না হইলে বয়সকে বোঝা যায় না। এই ঘোর অন্ধকার কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশীর নিশীথ অন্ধকার-ভরা আকাশকে সাক্ষ্য রাখিয়া (আকাশ নাকি বয়সের জন্মভূমি) শপথ করিয়া বলিতেছি—অন্তরের গহন বনে আজ কে এক সাবিত্রী-সমা নারী মৃতসত্যবানকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য তপস্যা-সুন্দর চক্ষে নীল-মূর্ত্তি আকাশের দিকে নিত্য প্রার্থনা করিতেছে,—ফিরাইয়া দাও, ফিরাইয়া দাও সত্যবানকে—ফিরাইয়া দাও জীবনের জাগরণের বয়সকে।

কিন্তু পুরাণে যাহা ঘটিয়াছিল, মানব-জীবনে আজও তাহা ঘটিয়া উঠিল না।

উদ্ভিদ্-বিদ্যায় বলে যে, উদ্ভিদ্ যে ঠিক কখন মরিয়া যায়, তাহা তাহার উপরের দিক অথবা উদ্ভিদের বয়স দেখিয়া বলা যায় না। কখন গোপনে তাহার ফোটার মুহূর্ত্তগুলি নিঃশেষ হইয়া যায়—মাটীর নিচে হইতে সহস্র জিহ্বা কখন আর রস আকর্ষণ করিতে পারে না—

বাহিরে তাহা অধিকাংশ সময় ধরা যায় না। উদ্ভিদের মৃত্যু-ক্ষণ আমরা জানি না, তাই অনেক উদ্ভিদ্ বাহিরের একটা সাজান ফাঁকি দিয়া অনেক সময়ে অনেক মালির জল-সিঞ্চন আদায় করে। মালি জানে না যে, সে প্রেত পূজা করিতেছে। যখন বাহিরের দিক হইতে ডাল-পালা খসিয়া পচিয়া পড়ে, তখনই মালি জানে, যে গাছটী মরিয়া গেল। কিন্তু তাহার জানার বহুপূর্ব্বেই গাছটী মরিয়া গিয়াছিল।

জীবনের বিরাট তপোবনে আমিও এক জীবিত বৃক্ষের প্রেতমূর্ত্তি। আপনাকে সাবধান করিবার জন্য বলিতেছি যে, চারিদিকে আজ আমারই সহোদর সব। বয়সের ডালপালা খাড়া করিয়া রাখিয়া আজ তাহারা সম্মানের বারি-সিঞ্চন আদায় করিয়া লইতেছে; কিন্তু আমি জানি, সেই সিঞ্চিত বারিতেই তাহাদের ডালপালা পচিয়া উঠিবে, তাহারা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

আমাদের সমাজ ও সাহিত্যের অধিকাংশ জায়গা জুড়িয়া এই মৃত লোকেরা শুধু চলিয়া ফিরিয়া জীবনের দাবী আদায় করিয়া লইতেছে। কেহ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে চায় না, কারণ তাহারও ত মরণের সম্ভাবনার ভয় আছে। এই সব 'মৃত' মানুষদের চারি-দিকে যে নূতন জীবনের শিশুরা জাগিয়া উঠে—তাহা-দের দিকে চাহিয়া ইহারা আতঙ্কিত হইয়া উঠে—তাহাদের অবজ্ঞা করিয়া আপনাদের ভয় ও অন্তঃসার-শূন্যতাকে লুকাইতে চায়। ভীত ও দুর্ব্বল লোকদের মনের এই অবস্থার কথা প্রত্যেক মনস্তত্ত্বের ছাত্রই জানেন। তাই তারা বলে,—এই বালকের দল সাহিত্য, আর্ট লইয়া ছেলেখেলা করিতেছে,... ভয় হয় কখন বা ইহারা না-জানিয়া, না-বুঝিয়া পরের মাথায় অথবা নিজের পায়েই কুড়ুল মারিয়া বসে!

এই সচকিত অবজ্ঞার অন্তরালে কতখানি সত্য ভয়ের আভাস আছে—তাহা বৃদ্ধ আমি—বুঝিতে পারি। নিজের পায়ে মারে হয় ত কখনও কখনও—কিন্তু পরের মাথায় যে তাহারা কুড়ুল মারে সে বিষয়ে এক বিন্দুও সন্দেহ নাই। এই সব মৃত-জীবিতেরা নিজেদের অন্তঃসারশূন্যতার কথা মনে মনে জানে বলিয়াই অজ্ঞাতে 'পরের' ও 'নিজের' এই প্রভেদ গড়িয়া তোলে।

ইন্ধনের জন্য আগুন জ্বালাইতে হইলে কাষ্ঠের প্রয়োজনে কুড়ুল মারিতেই হয়। সমাজ-বিজ্ঞান বলে, কুড়ুলের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই মানব-সভ্যতা বাড়িয়া চলিয়াছে। এই কুড়ুল-মারার শব্দই সৃষ্টির নব-জীবন লাভের শাশ্বত মঙ্গলাচরণ। কুড়ুল-মারার প্রয়োজনের আগেই, ইতিহাস সাক্ষী, ঠিক এই রকম লোকেরা আপনাদের অবজ্ঞা আর অহমিকাকে সাজাইয়া গুজাইয়া ভয়কে ঢাকিবার জন্য আর্ত্তস্বরে চীৎকার করে। ভয় বলে,—হে মৃত, প্রেতলোকে চল। পৃথিবীর জাগর-লোক জীবনের শিশুরই খেলা-ঘর।

অভ্যাসের অহমিকা বলে,—বয়স আছে এখনও—দাঁড়াও না যদি ধমকাইয়া শিশুদের চুপ করাইতে পারি।

এমনই সময়ে ধমকানি ছাড়াইয়া কুড়ুলের শব্দ জাগে—নিষ্ঠুর ও অমোঘ! এ আঘাত কিন্তু রক্তপাতশূন্য—কেন না, যাহাদের উপর এ আঘাত পড়ে তাহাদের রক্ত বহুদিন আগেই যে শুকাইয়া গিয়াছিল।

চিঠি আর চিঠির মাপের মধ্যে থাকিতেছে না। বারান্তরে অন্যান্য বিষয়ে আপনাকে জানাইব। আপনাদের সম্বন্ধেও অনেক কথা আমার মনের মধ্যে রহিয়াছে। জানি না, আপনি শুনিবেন কি না। তবে আমার কথা এই যে, আপনাদের এই সমস্ত মৃত-জীবিত সাহিত্যিকদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করা কর্ত্তব্য। আপনাদের সাহিত্য আমার বড় ভাল লাগে—কারণ, সেখানে যদিও কুড়ুল-মারার শব্দ এখনও শুনি নাই, তবে কুড়ুল তৈয়ারী করিবার শব্দ শুনিতে পাইয়াছি! কুড়ুল হয় ত আমারও উপরে পড়িবে; কিন্তু আমি বৃদ্ধ হইলেও সম্মানে মরিতে জানি।

আপনি আমার প্রীতি-নমস্কার জানিবেন। আপনার নিকট হইতে ভরসা পাইলে পত্রান্তরে সব কথা জানাইব। ইতি—

'মৃত-জীবিত' কশ্চিৎ বৃদ্ধঃ